সেরা রম্যরচনা ।। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

সেরা রম্যরচনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদনা

আবদুশ শাকুর

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৪৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

তৃতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ নভেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0246-5

A collection of belles-lettres by Narayan Gangopadhaya
Edited by Abdush Shakoor
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14 Kazi Nazrul Islam Avenue Dhaka 1000 Bangladesh
Cover Designed by Dhruvo Esh, 3rd Edition : 2012, Price : Tk. 180.00 only

www.pathagar.com

সূচি

ভোজনার্থে ১৯
২১ হরণ বনাম আহরণ
২৪ ভূতের গল্প
২৬ বারোটি উপন্যাস
২৯ 'দাদু' প্রসঙ্গ
৩১ উইলিঅম শেক্‌স্‌পীআর
৩৩ একজন ভাবী ভারতীয়
৩৬ বিশ্ববিদ্যালয় ও আধুনিক সাহিত্য
৩৯ আংরেজি হটাও
৪১ প্রেস্‌টিজ বনাম মাইনে
৪৩ রাজকীয়
৪৫ জীবনকে আর একটু রমণীয় করতে
৪৭ হাউলার
৪৯ মহাযাত্রার কথা
৫২ 'ফোর এন'
৫৪ পটভূমিকা
৫৬ একটি অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী
৫৮ সে চায় না পিবে
৬১ হ্যাম্বো-র‍্যাম্বো-ঘ্যাম্বো
৬৩ সন্দেশায়ন
৬৫ লেখক-নামা
৬৮ নির্জনতার আনন্দে
৭০ মিখাইল শলোখভ
৭২ শেষ 'গল্প'-লেখক
৭৫ একটি যান্ত্রিক যন্ত্রণা
৭৭ চাঁদ
৭৯ ইন্দ্রলোক-ফেরত
৮২ কাজী নজরুল ইসলাম
৮৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞাতার্থে
৮৬ রসিকতার দুর্ভাগ্য
৮৯ রিক্‌শা এবং আমরা
ডলফিনের ভবিষ্যৎ ৯১
গব্য-জিজ্ঞাসা ৯৩
তত্ত্ব এবং সত্য ৯৫
চিরকালীন ৯৮
নতুন অচলায়তন ১০০
ফ্যাশান ১০২
জনৈক বাঙালী প্রসঙ্গে ১০৫
মাতৃভাষা ১০৭
একজন মহত্তর ম্যালকম এক্স ১০৯
বিরাটের মুখোমুখি ১১১
স্বদেশ ১১৪
আত্মপরিচয় ১১৬
বাংলার এম. এ. ও টিপসহিগণ ১১৮
পাঁচ মাথার অশ্বারোহী ১২০
আমার রাশিফল ১২৩
যুগকণ্ঠ নজরুল ১২৫
বেশি লেখা ১২৮
বেকেট প্রসঙ্গে আত্মচিন্তা ১৩০
অযাচিত উপদেশ ১৩২
ফচক্রস্ক জস্কক্রফ ১৩৫
আমার বয়স—১৯৭০ সালে ১৩৭
খাজুর গুড় কত কইর‍্যা? ১৪০
বার্ট্রান্ড রাসেল ১৪২
ভ্রম-সংশোধন ১৪৪
চিঠিলেখা এবং আমি ১৪৭
কেকা এবং অন্যান্য ১৪৯
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫১
অসুস্থ শরীরের ভাবনা ১৫৪
আমি খ্যাতির রাস্তায় ১৫৬
পারিবারিক ক্রিকেট ১৫৮

www.pathagar.com

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮–১৯৭০)

www.pathagar.com

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত রম্যরচনাগুলি নির্বাচিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০) জনপ্রিয়তম রচনারূপে উদ্‌যাপিত 'সুনন্দর জার্নাল' থেকে। এই শিরোনামে কলকাতার 'দেশ' পত্রিকার একটি পাতায় ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত রচনাগুলিকে সমসাময়িক বাঙালির ব্যক্তিক এবং সামাজিক জীবনের দর্পণ বলা চলে। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে লেখক অসুস্থ বোধ করেন। ৭ নভেম্বরে প্রকাশিত জার্নালের শিরোনাম ছিল 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা'। শেষ জার্নাল প্রকাশিত হয় পরের মাসের ১৪ তারিখে, তাঁর মৃত্যুর ছয়দিন পরে। জার্নালের শেষ লেখাটির সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকায় প্রয়াত লেখকের প্রতি যে-শ্রদ্ধাঞ্জলিটি প্রকাশিত হয় সেটি থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'গত শুক্রবার রাত্রে আকস্মিক অসুস্থতার পর তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গত রবিবার (৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আমাদের সুনন্দ—বাংলাদেশের অতিখ্যাত, সর্বজনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—পরলোকগমন করেছেন। ...গত তিরিশ বছর যিনি সাহিত্য রচনার দ্বারা বাঙালি পাঠকের প্রিয় লেখক হয়ে বিরাজ করেছেন তাঁর সাহিত্য বাঙালি সমাজের অবশ্যই অন্তরের সামগ্রী ছিল। ...১৯৬৩ সাল থেকে দেশ পত্রিকার পাঠক যে-'সুনন্দ'র সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন, আগামী সংখ্যা থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না—এ দুঃখ সকলেরই। পরলোকগত শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।'

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি মারফতই 'সুনন্দ'র প্রকৃত নাম প্রথম প্রকাশ পায়—অর্থাৎ লেখকের মরণের পরে।

পাঠকবন্দিত এই রোচিষ্ণু রচনাগুলির কিছু কিছু 'সুনন্দর জার্নাল' নামে দুই-তিনটি খণ্ডে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে বেরিয়েছিল। অবশেষে ইতিপূর্বে অগ্রন্থিত সমস্ত রচনা খুঁজে নিয়ে সম্পূর্ণ জার্নালটির অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করে বনেদি পাবলিশার মিত্র ও ঘোষ, ২০০২ সালে। অতএব এই গ্রন্থটিকেই প্রামাণ্য 'সুনন্দর জার্নাল' জ্ঞান করা যায়। 'পঞ্চতান্ত্রিক সৈয়দ মুজতবা আলীর করকমলে' উৎসর্গ করা, গ্রন্থরূপে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভূমিকাও লিখেছিলেন সুনন্দ-নামেই। ভূমিকাটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি :

www.pathagar.com

"সাময়িক পত্রিকার পাতায় এই খেয়ালী লেখাগুলো বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েছে অনেক, কখনো কখনো কারো কারো ক্ষোভের কারণও ঘটিয়েছে হয়তো। যাঁরা প্রীতি জানিয়েছেন, এবং যাঁরা অনুযোগ করেছেন তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—কারণ লেখাগুলোকে তাঁরা আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলেন।...

একটি নিবেদন। জার্নাল শব্দটিকে আশা করি আভিধানিক অর্থে কেউ গ্রহণ করবেন না।"

'দেশ' পত্রিকার ১৯৮৩ সালের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় সুজিতকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন:

'১৯৬৩-র চব্বিশে আগস্ট সংখ্যা থেকে অবিস্মরণীয় ধারাবাহিক 'সুনন্দর জার্নাল' শুরু হয়ে রুচিবান বাঙালি পাঠককে মাতিয়ে দেয়। সুনন্দ (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) অর্জন করলেন দুর্দান্ত খ্যাতি। ১৯৭০ খৃস্টাব্দে তাঁর অকালমৃত্যুর দিন পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে চিত্রশিল্পী চণ্ডী লাহিড়ীর অনুপম কার্টুনের সঙ্গে দেশ-এর এক পাতায় সুনন্দর জার্নাল বার হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর শোকবিহ্বল পাঠকরা 'দেশ' সম্পাদকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ঐসব চিঠির প্রত্যেকটিতে প্রিয় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিরোধানে অন্তরের শোক ব্যক্ত করার সঙ্গে তীব্র হাহাকারও ধ্বনিত হয়েছিল যে—সুনন্দর জার্নাল আর পড়া হবে না।...

'...সুনন্দ নামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন কে—জানতে শুরু থেকেই পাঠকেরা অত্যন্ত আগ্রহী হন, নানাভাবে খোঁজখবর নেন। কিন্তু বাইরের পাঠক তো দূরের কথা 'দেশ' দফতরের কোনো কর্মীও তা জানতেন না। শুধু জানতেন সম্পাদক মহাশয় এবং জানতেন স্বয়ং লেখক এবং তাঁর পরিচিত কোনো এক ব্যক্তি। পাণ্ডুলিপিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যাতে তাঁর হাতের লেখায় ধরা না পড়েন তার জন্য মূল লেখা থেকে ঐ ব্যক্তি নিজের হাতে অন্য কাগজে কপি করে সেই কপি 'দেশ' দফতরে পাঠাতেন। 'দেশ' সম্পাদক এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে এক অলিখিত অথচ দৃঢ় দৃষ্টি হয়েছিল যে, সুনন্দর আসল নাম কাউকে জানানো হবে না।...সুনন্দর জার্নাল বাবদ নারায়ণবাবু নিয়মিত যে দক্ষিণা পান তার জন্য ওঁর নামে ব্যাংকে চেক কাটা হয় না। টাকা প্রতি মাসে নগদে পাঠিয়ে দেয়া হয় নারায়ণবাবুর পরিচিত দূরের এক ঠিকানায়। উনি সেই দূর ঠিকানা থেকে টাকা সংগ্রহ করে নেন। লেখকের ঠিকানা জানার উপায় নেই। সুনন্দর জার্নাল-এর লেখক কে—তা নিয়ে দারুণ জল্পনা কল্পনা পাঠকমহলে, আনন্দবাজার অফিসে, 'দেশ' দফতরে।...

...(এদিকে) জার্নালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা চতুর্দিকে শুনে শুনে সুনন্দ বেচারি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সর্বত্র সুনন্দর তারিফ, সেই তারিফের মোহ কাটানো, প্রভৃত যশ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা, রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে অতি কঠিন।...অবশেষে এক দুর্বল মুহূর্তে জার্নালের একটি কিস্তিতে, তিনি ক্ষীণভাবে আত্মপরিচয় দিয়েই ফেললেন—সুনন্দর ঠিকানা বৈঠকখানা এলাকায়।

www.pathagar.com

'আর যায় কোথায়। হুঁশিয়ার পাঠকের হাতে তদ্দণ্ডেই ধরা পড়তে হল।...নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে সপরিবারে বৈঠকখানা অঞ্চলে থাকেন তা অনেকেরই জানা।...'

৯০/১ হোল্ডিং নম্বরের বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন দেশভাগের পরে। সে-বাড়িতে বসেই উপস্থিত রম্যরচনাগুলির বেশির ভাগ লিখেছিলেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়। এ-বাড়িটি বিক্রি করে তাঁর নিজের তৈরি-করা পঞ্চাননতলা বা গুপ্তপাড়ার বাড়িতে তিনি জীবনের সামান্য সময়ই শুধু অবশিষ্ট পেয়েছিলেন। সেখানে 'সুনন্দ' একেবারে শেষের কয়েকটা জার্নালই শুধু রচনা করেছিলেন।

কিন্তু এতো উচ্চমানের রচনাগুলির লেখকের নাম নিয়ে এতো গোপনীয়তার হেতু কী? রম্যরচনা লেখা একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক অথবা কথাসাহিত্যিককে মানায় না বলে? সেটা অন্তত, 'নতুন সাহিত্য ভবন' থেকে ১৯৫৯ সালের প্রকাশিত, 'সরস গল্প' সম্পাদক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেলায় ভাবা যায় না। কেননা ৪৪৮ পৃষ্ঠার সংকলনটির ২১ পৃষ্ঠা দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি বাংলাসাহিত্যের কৌতুকরসপুষ্ট রচনার ঐতিহাসিক পরিক্রমা সাঙ্গ করে দেখান যে এক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্য কেমন সমৃদ্ধ ছিল এবং বর্তমান কেমন ম্রিয়মাণ। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় নৈরাশ্যের সঙ্গে আরও আবিষ্কার করেন :

"অধিকাংশ সাম্প্রতিক লেখকই বড়ো বেশি গম্ভীর—হাসিটাকে যেন তাঁরা লঘুচেতাসুলভ চাপল্যের মতো দূরে সরিয়ে রেখেছেন। গম্ভীর কঠিনতা, তিক্ত নির্লিপ্ততা আর দার্শনিক প্রৌঢ়তা ধীরে ধীরে বাংলাসাহিত্যের হাসির উৎসটাকে শুকিয়ে আনছে। কিন্তু এ-কথা বলতেই হবে ভবিষ্যতের পক্ষে এ লক্ষণ শুভ নয়।

কৌতুক সৃষ্টিতে আধুনিককালের এই কুণ্ঠা কেন? এমনকি ব্যঙ্গ রচনাতেও কেন সাম্প্রতিক লেখকেরা উৎসাহ পান না? তাঁরা কি হেসে ওঠবার মতো কোনোকিছুই জীবনে দেখতে পাচ্ছেন না আর?

ব্যঙ্গ-রঙ্গ-কৌতুক অনেকটাই প্রেরণা পায় কোনো যুগ-সংঘাতের ভেতর—কোনো ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে। নব্য কলকাতার বাবুয়ানির উদ্দামতা, ইংরেজি শিক্ষার প্রথমদিকের আতিশয্য অথবা ব্রাহ্মধর্মের বিস্তার—এগুলি সেই ভাব-দ্বন্দ্বের উপকরণ জুগিয়েছে। কোনো নতুন সামাজিক, রাজনীতিক কিংবা সাহিত্যিক আন্দোলনও ব্যঙ্গ-রঙ্গের উৎসকে মুক্ত করে। কিন্তু আমাদের বর্তমান বাংলা দেশ কি সেই সংঘাত থেকে মুক্ত? আমাদের মধ্যে কি কোনো দ্বন্দ্ব নেই—কোনো অসঙ্গতিবোধের বিমূঢ়তা নেই?

এ-কথা স্বীকার করা শক্ত। আমরা নিশ্চয়ই আজ কোনো স্থির সত্যের মধ্যে পৌঁছে স্থিতচিত্ত হয়ে যাইনি; বরং এই মুহূর্তের বাঙালী দেখছে—তার পুরনো সমাজ-জীবন ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ—শ্রেণী-সংঘাতের রূপ তীব্রতর হচ্ছে। এই কালে ব্যঙ্গরচনার সম্ভাবনা সীমাহীন। কিন্তু কিছু কিছু সাংবাদিক-ধর্মী রচনা ছাড়া স্থায়ী রস-সাহিত্য দৃষ্টিতে সাহিত্যিকদের বিশেষ উৎসাহ চোখে পড়ছে না।

www.pathagar.com

কিংবা এ-কালের বাঙালী লেখকেরা ভাবছেন—হাসিটা inferior art? ওতে তাঁদের মর্যাদা নষ্ট হবে? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তো সে-কথা ভাবেননি। পাঠক হিসেবে বাংলাসাহিত্যে নতুন রস-স্রষ্টার জন্যেই আমরা পথ চেয়ে রইলাম।"

আমি যোগ করব, সে-কথা ভাবেননি কোনো ভাষার কোনো কালে কোনো মহৎ লেখকই। ভাবেননি বাংলাগদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাকবি মধুসূদন দত্ত, ভারততাত্ত্বিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আধুনিক গদ্যের স্থপতি প্রমথ চৌধুরী, মনস্বী গদ্যশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়, মহাপণ্ডিত মুজতবা আলী। ভাবেননি এমনকি জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ সর্বান্তিক গদ্যগুণীগণও—যাঁদের অনেক হাস্যরসোজ্জ্বল রচনা বাংলাসাহিত্যের কোষাগারে সংরক্ষিত আছে চিরায়ত শ্রেণিতে।

রম্যরচনাগুলির লেখক সুনন্দর নাম নিয়ে অমন কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যে আসলে কোনো লজ্জা ঢাকার ব্যাপার ছিল না। বস্তুত কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনটা ছিল একান্তই আটপৌরে—অপ্রিয় সত্যটা নিঃসংকোচে বলার সুবিধার্থে বক্তাকে সম্পূর্ণ অচেনা রাখা। কারণ সুনন্দ তাঁর জার্নালে বাঙালির আর্থিক, সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল দিকেরই ভালোমন্দের খতিয়ান নিচ্ছিলেন এবং সমীচীন মন্তব্য করছিলেন নির্দ্বিধায়। 'আমি খ্যাতির রাস্তায়'-নামক শেষ লেখাটিতে তিনি নিজেই লিখেছেন, জার্নাল লিখে মধ্যে মধ্যে তিনি লোক চটিয়ে থাকেন। বাঙালির উন্নাসিকতা, প্রগল্‌ভতা, বাক্‌সর্বস্বতা, অতিচতুরতা—বিশেষত প্রধান দুই জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভোগলিপ্সুতা ও শ্রমবিমুখতার কথা লিখলে চটবে না-ই বা কেন বাংলার লোক। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তর্ভেদী বীক্ষণ থেকে বাদ পড়ছিল না বাঙালি-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান অব্যবস্থা, অসঙ্গতি এবং অনুকরণপ্রিয়তাসহ অন্যান্য সস্তা মানসিকতার কথাও ('বারোটি উপন্যাস', 'একজন ভাবী ভারতীয়', 'ফোর এন', 'লেখক-নামা', 'ফ্যাশান' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

সুনন্দ নিজের পরিচয় দেন 'কমনম্যান বাঙালী' বলে। তাই বাঙালি কমনম্যানের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উত্থান-পতন, আশা-নিরাশাই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। বাঙালি বলতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গের সকল বাংলাভাষী মানুষকেই বুঝিয়েছেন ("আমার কেবল অবিভক্ত বাংলাকেই মনে আসে", 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা')। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে তাঁর জার্নালের শেষ রচনাটি লেখা পর্যন্ত—অন্য কথায়, জীবনের শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা পর্যন্ত—বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল না। এই জার্নাল লেখায় লেখকের নিষ্ঠা কী রকম ছিল তা বোঝা যায় জার্নালটির শেষ দু-তিনটি লেখা পড়লে। যেমন মৃত্যুর একদিন আগে প্রকাশিত 'অসুস্থ শরীরের ভাবনা'-নামক লেখাটিতে ব্যক্ত বাঙালির অধঃপতনের আশঙ্কা শেষপর্যন্ত আর মশকরা থাকে না, অকৃত্রিম হৃদ্যতার রসায়নে লেখকের মনের

www.pathagar.com

গভীরে উপলব্ধ স্বস্তিহর কথাটিই হয়ে যায়। সেখানে বাঙালির সামাজিক 'আত্মহত্যা'কামী কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির উদাহরণ দিয়ে লেখক বলছেন, গোখেলকথিত ভারতের 'অগ্রগামী' বাঙালি আত্মধ্বংসের পথেও 'পায়োনীয়র' হয়েছে। লেখাটির অন্তিম পঙ্‌ক্তিগুলি এই রকম—'আমাদের গৃহের অদূরে (শ্যামাপূজার প্যান্ডেল থেকে) যে সঙ্গীতসুধা এবং বোমাধ্বনি উৎসারিত হচ্ছে, তা নাকি আরো তিন দিন চলবে (পূজার পরেও দিনতিনেক প্রতিমা প্যান্ডেলে রেখা দিয়ে)। সুতরাং অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় 'সুনন্দ'র পাতাটি যদি না থাকে, তাহলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালির অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই রম্যরচনাগুলির সর্বাঙ্গে হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে উজ্জ্বল কৌতুকরসের উচ্চমূল্য সংযোজিত হয়েছে। কোন ধরনের হাসির জ্যোতি 'সুনন্দর জার্নাল'কে মহিমা দান করেছে সেটা নির্ধারণ করার জন্য অতি সংক্ষেপে আমি তিন রকমের হাসি বিবেচনায় নেব। ক্ষুদ্র জীবনটি জুড়ে নিয়তিকে হাসির মাধ্যমে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা মানুষের বিশেষাধিকার—বলেছেন ষোড়শ শতাব্দীর মহামানব রাব্‌লে ("To laugh at fate through life's short span/ Is the prerogative of man.")। তিনি যে-হাসির কথা বলেছেন, সেটি হল বেপরোয়া হাসি; অট্টহাসি। সে-হাসির জন্য চাই জীবনের প্রতি মোহমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, সংসারের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্নতাবোধ না হলেও দূরাত্মীয়তাবোধ। সুখ-দুঃখ কিছুই সত্য নয়, সুতরাং দুর্ভাবনা অবান্তর। (অতুলপ্রসাদ সেন যেমন গেয়েছেন : যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হল রে উছল, রে ভোলা/তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌, রে ভোলা ॥...মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি;/ দু-দিনের কান্না-হাসি, সব ছল ছল ছল, রে ভোলা ॥)।

তবু দুর্ভাবনা আসতে চাইলেও, এমনকি দুর্বিপাক বিড়ম্বিত করতে চাইলেও—জীবনটাকে মনোহরই ভাবতে পারো, আন্তন চেখভের কথা শুনে। তিনি বলেছেন, মানুষের জীবন একটা অপ্রিয় ব্যাপারই বটে। তবু তাকে প্রিয় প্রতিপন্ন করাও মোটেই কঠিন নয়। ধরো, তোমার পকেটের ম্যাচবাক্সটা জ্বলে উঠল। তবু তুমি ভেবে খুশি হতে পারো যে পকেটটা তোমার বারুদের গুদাম নয়। ধরো তোমার বাগানবাড়িতে অবকাশযাপনকালে সেখানেও কিছু আত্মীয়স্বজন এসে পড়ল। তবু মুখ কালো না-করে তুমি ভেবে স্বস্তি পেতে পারো যে পুলিশ তো এসে পড়েনি তোমাকে তাড়া করে। তেমনি, নিষ্কণ্টক নিসিন্দা গাছের পিটুনি খেয়েও তুমি আনন্দে নেচে উঠতে পারো যে সকণ্টক বিছুটি গাছের পিটুনি তো খেতে হয়নি।

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি রাব্‌লের হাস্যতত্ত্বেরও। যা ঘটছে, তাকে সেভাবেই গ্রহণ করো। যতটুকু পেয়েছ, তাই বেশি; কারণ, তার চেয়ে কমও পেতে পারতে। আশাভঙ্গের কারণ থাকবে না, যদি লটারির টিকেট না-কেনো। এই প্রক্রিয়ায় মানসিক প্রশান্তিতে

www.pathagar.com

পৌঁছে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি আর ভয়-ভাবনাকে হেসে উড়িয়ে দাও। আমাদের এই নির্বিকার হাসির মন্ত্রই দিয়েছেন রসিকশ্রেষ্ঠ রাব্‌লে। এরই দার্শনিক নাম 'পাঁতাগ্রুয়েলিজম'। তবে রাব্‌লেপন্থী হাস্যের নমুনা বাংলাসাহিত্যে তেমন মেলে না। এর অল্পস্বল্প আভাস হয়তোবা আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গানে'। এ-হাসির একটুখানি ঝলকানি, আকস্মিক আলোর মতো হলেও, চোখে পড়ে বইকি সুকুমার রায়ের 'এই দুনিয়ার সকল ভালো'তে, যেখানে তিনি 'পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়ে' জগতের পরম ভালোটির সন্ধান পান।

কিন্তু দুঃখ-পরাজয়, অবিচার-অত্যাচারকে এভাবে হেসে উড়িয়ে দিতে অনেকেই অপারগ। অন্যায়-অনাচার দ্বারা সৃষ্ট ব্যথা-ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ মনের গভীরে পুঞ্জিত গ্লানি তাঁদের হাসিকে রূপান্তরিত করে ফেলে 'ব্যাক হিউমারে'—বাংলায় বলা যায় 'কৃষ্ণ হাস্যে'। সে-হাসি পাঠকের মনে নির্মম চাবুক হানে, মগজে জ্বালা ধরায়। এককথায় সাপের বিষকে হার মানায় সেই হাসি। সে-হাসি কিছুটা হেসেছেন 'এসে অব এলিয়া'র চার্লস ল্যাম্‌, 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র বঙ্কিমচন্দ্র। কৃষ্ণ হাস্যের সাহায্যে ল্যাম্‌ তাঁর ব্যক্তিজীবনের নৈরাশ্য এবং ব্যর্থতাবোধের জোরালো প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছেন হাসির আবরণের তলে লুকিয়ে রাখা তাঁর অশ্রুজলের মুক্তামালার আভা প্রকাশ করতে। তবে সে বিষের হাসির ভয়ঙ্করতম দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন জোনাথন সুইফ্‌ট—শোষক সমাজের প্রতি সীমাহীন ঘৃণায় এবং শোষিত আইরিশদের প্রতি অকৃত্রিম মমতায়।

কিন্তু বর্ণিত এই দুই হাসির স্পর্শ নয়—শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় পরশ লেগেছে তৃতীয় হাসিটির। সে-হাসিতে দর্শন একটা খুঁজে পাওয়া গেলেও, সেখানে নির্দিষ্ট কোনো দর্শনের বোঝা থাকে না। গর্ভে ধারণ করে না সে কোনো অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণা। বহন করে না কোনো অন্তর্জ্বালা—ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক কিংবা রাষ্ট্রিক। এ-হাসি নিত্য খেলা করে জলের ওপর রৌদ্রের মতো, চিকচিক করে হ্রদের বুকে জ্যোৎস্নার মতো। বঙ্কিমচন্দ্রের হীরকোজ্জ্বল কৌতুকরসের অমূল্য গুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই হাসিটিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য—যা সকল বিষয়কেই আলোকিত করে তুলতে পারে, যার পরশে রচনার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং রমণীয়তা বাড়ে। এই নির্মল হাস্যজনিত কৌতুকরসই এ-গ্রন্থে সঙ্কলিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুনন্দর জার্নাল'—নামক রম্যরচনাগুলিকে স্বর্ণোজ্জ্বল করেছে।

বাংলাসাহিত্যে এই বিমল হাস্যের বিবর্তন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই দেখিয়েছেন তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে (সরস গল্প)। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের ব্যক্তিকৌতুক এবং সমাজ-কৌতুক পার হয়ে রামমোহন রায়ের ঘাটে এসে পৌঁছুলেই নতুন কৌতুকের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে। উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে তাঁর "এক খ্রীষ্টিয়ান পাদ্‌রী ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য, ইঁহাদের পরস্পর

www.pathagar.com

কথোপকথন।" পাদ্‌রী খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পরেও তৃতীয় শিষ্যটি গুলিয়ে ফেলে বলে ওঠে ঈশ্বর নেই এবং কেন নেই সেটা ব্যাখ্যাও করে। প্রাসঙ্গিকবোধে সংশ্লিষ্ট কথোপকথনটুকু এখানে তুলে আনছি :

"তৃতীয় শিষ্য ॥ এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেন যে, দেখ, এই এক বস্তু বর্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে, এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক্।

পাদ্‌রী ॥ এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এস্থলে সঙ্গত হইতে পারে।

তৃতীয় শিষ্য ॥ ...পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ঈশ্বর ছিলেন না, এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ইহা ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?

পাদ্‌রী ॥ ...তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার করিলে না। অতএব তোমাদের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য ॥ এ অতি আশ্চর্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না এমত ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে, যেহেতু বুঝিতে পারিলে না'।"

সূক্ষ্ম এবং লক্ষ্যভেদী এ-কৌতুক মার্জিত রুচির। বিদগ্ধ মনের তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি একে নিয়ে গিয়েছে উচ্চতর স্তরে। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় একে বলেছেন ব্রাহ্মসমাজের হাসি। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমের হাসিও বস্তুত এই ব্রাহ্মহাসিই। এ-হাসিকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে সুরুচি, স্বচ্ছতা, প্রাখর্য এবং সুশিক্ষিত ও পরিশীলিত মনন। এ-কারণেই হাসির সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বঙ্কিমেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই বনেদি ঘরানার হাসিটির কথা মনে রেখেই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—সাহিত্যের হাসি, মনেরও হাসি।

এ-হাসি উঁকি দিয়ে পুলক লাগায়, জীবনের ছন্দে একটু পতন ঘটলেই; উছলে উঠে হর্ষ জাগায়, সঙ্গতিবোধে চোট লাগলেই। জীবনের যাপনে অজস্র অভাব থাকলেও এ-হাসির উপকরণের অভাব থাকে না একটুও। বাতিকগ্রস্তকে চটিয়ে দিয়েও উৎসারিত হয় এ-হাসি, চরিতার্থ হয় লেখক-পাঠকের সহজাত কৌতুকবোধ—যেমন 'পারিবারিক ক্রিকেট'—শীর্ষক সুনন্দর জার্নালটি। এই হাসি মনুষ্যের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, প্রতি প্রশ্বাসে অক্সিজেন সেবনের মতো। শুধু তা-ই নয়, দিনগত পাপক্ষয়ের ফাঁকে ফাঁকে পুণ্যও আমদানি করে যথেষ্টই। তা না হলে ক্লান্তিকর জীবনটা যাপনীয়ই হত না। দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও এ-হাসি মানুষকে মনে করিয়ে দেয়—সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে যায়নি তার সংসারে। 'এখনো অনেক রয়েছে বাকি'। রহিম-করিম-জসিম, রাম-শ্যাম-যদু, টম-ডিক-হ্যারি নিরন্তন সৃষ্টি করে চলে এই হাসি—বেখেয়ালে হোক, কি খেয়ালে। যেমন নিম্নে উদ্ধৃত হাসিটি হ্যারি সৃষ্টি করেছে বেখেয়ালেই :

www.pathagar.com

"ক্লাসে নবাগত ছাত্রটিকে ক্লাস-টিচার প্রশ্ন করেন :

'তোমার নাম কী?'

ছাত্রটি বলে :

'হ্যারি রবিন্‌সন।'

উত্তর শুনে অসন্তুষ্ট শিক্ষক তাঁর নতুন ছাত্রটিকে তদ্দণ্ডেই প্রথম শিক্ষাটি দিয়ে দেন:

'শিক্ষককে কিছু বলতে স্যার যোগ করতে হয়। এবার ঠিক করে বলো তোমার নাম কী?'

ছেলেটি বলে :

'স্যার হ্যারি রবিন্‌সন।"

এ-জাতীয় হাসি উপস্থিত সংকলনে পরিবেশিত নানা রচনাতেই আছে নানাভাবে—যেমন 'হাউলার'-নামক রম্যরচনায় একটা বিদেশী হাউলার :

"স্কুল ইন্সপেক্টার বাচ্চাদের ক্লাসে ঢুকে শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করলেন, ছোটদের নানা ধরনের শব্দ চিনতে শেখানো হয়েছে কিনা? শিক্ষিকা জানালেন, হয়েছে।"

তখন ইন্সপেক্টার বাচ্চাদের চোখ বন্ধ করতে বলে, চাপা শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ করলেন একটা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন :

'বলো তো, এটা কিসের শব্দ?'

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। তারপর একটি ক্ষুদ্রকায় শিশু দাঁড়িয়ে উঠে নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে জানাল :

'Please, Sir, you kissed the teacher!'

একই রচনা লেখক একের পর এক হাউলারের অর্থাৎ অট্টহাস্যকর ভুলের দৃষ্টান্তজনিত হাসির বন্যা বইয়েছেন এবং একই সূত্রে পাঠককে ওজনদার জীবনদর্শনের পাঠও দিয়েছেন। এর ফলে লেখাটিতে, এবং এমনি অনেক লেখাতেই, মূল্য সংযোজন হয়েছে বহুমুখী।

জনৈক শিক্ষামন্ত্রী সম্পর্কিত হাউলার :

"চোখের বালির মতো অমর উপন্যাস শরৎচন্দ্রের পক্ষেই লেখা সম্ভব"।

রাইটার্স বিল্ডিংস (কিংবা সচিবালয়) সম্পর্কিত হাউলার :

"পথের দাবী? পূর্ত দপ্তরে খোঁজ নিন। পথ-ঘাটের দেখা-শোনার দায়িত্ব তাঁদের।"

একটি রুশ হাউলার :

"মার খেয়ে ছেলেটা স্বীকার করেছে যে আনা কারেনিনা সে-ই লিখেছে। তবে ভবিষ্যতে আর লিখবে না।"

এবার পর পর দুটি হাউলার, একটি বাংলার; অপরটি বিলাতের।

বাঙালী স্কুল-ইন্সপেক্টার : হরধনু কে ভেঙেছিল?

বাঙালী গাঁয়ের ছাত্র : জানি না।

www.pathagar.com

গ্রামটির মাতব্বর : ওর কথা বিশ্বাস করবেন না স্যার, এ-গাঁয়ের লোক ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী।

বিলাতী স্কুল-ইন্সপেক্টার : Who wrote Hamlet?

বিলাতী গাঁয়ের ছাত্র : P-P-please Sir, it wasn't me.

গ্রামটির স্কয়ার বা তালুকদার : আমার মনে হয় আসলে লিখেছে ওই বাচ্চা শয়তানটাই।

বাঙালির দেশে ঘটনাটা নিয়ে গেল গেল রব উঠেছে। এহেন রব কিন্তু ইংরেজের দেশে ওঠেনি। ইংরেজরা বরং 'হাউ হাউ' করে হেসে উঠে এরকম ডাহা ভুলের নাম দিয়েছে howler বা হাউলার। এসব হাস্যকর ভুলের সূত্র ধরেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অতীত রমণীয় ভঙ্গিতে লিখেছেন :

"হরধনু-ভঙ্গের ব্যাপারকে অত গুরুতরভাবে না নিলেও চলে। শিক্ষার দৈন্য আমাদের কাছেই, সেইজন্যে কলার খোসায় কেউ পিছলে গেলেই আমরা জীবনে পতন অভ্যুদয়ের জটিল তত্ত্ব-চিন্তাকে টেনে আনি কেন?...

এই ভুল-ভ্রান্তি-অসঙ্গতি-অন্ধতাই তো জীবন, এর বিচিত্রতাই তো জীবন-লীলা। বাইবেল-কথিত আখ্যান যদি সত্যি হয়, তাহলে আদিম মাতাপিতৃকৃত নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাউলার—আজও সেই আনন্দেই আমরা নেচে চলেছি। সেই প্রথম কৌতুক-নাট্যের সবাই কুশীলব।

অত বড়ো কথাও থাক। ভুলই যদি না করব, সাহিত্য আসবে কোন পথ দিয়ে? বেঁচে থাকবার রস কোথায়, যদি সবই নীতিশাস্ত্রের নিয়ম মেনে জ্যামিতিক রেখায় নির্ভুল এগিয়ে চলে? ভুলো-মন স্বামী দু'পায়ে দু'রকমের জুতো পরে বেরুতে চেষ্টা না করলে সুগৃহিণীর মনে সুখ কোথায়? সব ছাত্রই যদি নির্ভুলভাবে পড়া করে আসে—যদি বেঞ্চিতে কাউকে দাঁড় করানো না যায়—বেত অনাবশ্যক হয়ে ওঠে—তাহলে মাস্টারির স্বাদই যে ফিকে হয়ে যায়!

তাই জীবনে আমরা নিয়ম ভাঙব, ভুল করব, মূর্খতার পরিচয় দেব। আমাকে দেখে অন্যে হাসবে, অন্যকে দেখে আমি হাসব—এই পারস্পরিক হাস্য বিনিময়ের মধ্য দিয়েই আমরা বেঁচে থাকব। এই হাসিকে সব সময় দন্ত-বিকাশ বলে চেনা যাবে না; কখনো চোখের জলে তা গলে পড়বে, কখনো হাহাকার বিদীর্ণ হবে, কখনো ধূসর নিঃশব্দ বিষাদে তা লীন হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে সবই 'হাউলার'—ভুল শোনা, ভুল বোঝা, ভুল বলা, ভুল করা আর ভুলের ফসলে জীবনের গোলা ভরে ভরে তোলা।'

বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভূত এসব রচনার বিপরীত মেরুর কিছু রচনার প্রতিও এখানেই আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং একটি বিশেষ মূল্যবোধ দিয়ে যাচাই করা সেসব রচনার উপজীব্য হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে দেশী ও বিদেশী লেখকের শতবার্ষিকী, খ্যাতনামা লেখক ও বিখ্যাত

www.pathagar.com

মানুষদের তিরোধানে জাতির বেদনা এবং জার্নাল-লেখকের নিজের বেদনা ইত্যাদি। যেমন 'উইলিঅম শেক্‌স্‌পীআর', 'মিখাইল শলোখভ', 'কাজী নজরুল ইসলাম', 'একজন মহত্তর ম্যালকম এক্স', 'বেকেট প্রসঙ্গে আত্মচিন্তা', 'বার্ট্রান্ড রাসেল' এবং 'শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়'। অতিশয় সমৃদ্ধ এই ছোট ছোট রচনাগুলি অনবহিত পাঠককে অবহিত করে এবং অনালোকিত পাঠককে করে আলোকিত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রম্যরচনায় থাকে অম্ল-মধুর লঘু-গুরু নানা স্বাদের আয়োজন, বিবিধ বিষয়ের ওপর বিচিত্র ফোড়ন। এই অসাধারণ রচনাসাহিত্যের সৃজন-গ্রন্থনে তাঁকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের অবতারণা ক্ষণে ক্ষণে করতে হলেও কক্ষনো তা পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তোলে না। এমনই তাঁর রম্যরচনার প্রসাদগুণ। বরং বিষয়-বৈচিত্র্য, তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, কাব্যময় ভাষা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি তাঁর রচনাকে একটা অমূল্য স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। গভীর ও জটিল সমস্যার প্রতি যেমন তাঁর আকর্ষণ, তেমনি অনুরাগ জীবনের উচ্ছল রসময়তার প্রতি। তাই আমার মনে হয়, হাস্যরসমণ্ডিত শিশু-কিশোরের জন্য মজার গল্পগাছা লেখা এবং কৌতুকরসমণ্ডিত চরিত্র 'টেনিদা'কে নিয়ে সরস গালগল্প ফাঁদাও শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের জার্নাল-নামের রম্যরচনাগুলিতে অনেক মূল্যই সংযোজন করেছে।

কি ছোটদের রসময়তার আসরে, কি বড়োদের রমণীয়তার আড্ডায়, চৌকশ কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মাজমা জমাতে পারতেন সমান স্বাচ্ছন্দ্যে। তাঁর এই পারঙ্গমতা এতোই স্বাভাবিক ছিল যে সময় সময় আলাদা করা মুশকিল হত তাঁর রম্যরচনাকে রসরচনা থেকে, ছোটগল্পকে সরসগল্প থেকে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সরস গল্পের কথা মনে পড়ছে—'ইদু মিঞার মোরগা'। গল্পটাকে আজও আমার একটি উত্তীর্ণ ছোটগল্প ভাবতে ইচ্ছে করে। কেন, সেটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার অবকাশ এখানে নেই। তবু চুম্বকটুকু বলা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'ইদু মিঞার মোরগা' শেক্সপিয়ারের পেরিক্লিস্-এর সুবিদিত সংলাপ দুটির ভাবসম্প্রসারণ :

"কর্তা, মাছ কীভাবে জলে বেঁচে থাকে ভেবে বিস্ময় জাগে।'

'কেন, যেভাবে মানুষ বেঁচে থাকে—বড়রা ছোটদের গিলে খায়।"

চিরন্তন এই সত্যটির গল্পরূপ অতি নিপুণ হাতে এঁকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যুৎসই ব্রাশের কৌতুককর রেখাচিত্রে। ইদু মিঞাকে মোরগা বানিয়েছে মাংসলোভী দফাদার, দফাদারকে দারোগা, দারোগাকে ইন্সপেক্টার। অথচ ইদু একটা আশ্চর্য করুণায় তার মোরগটার গলা-কাটার বিরুদ্ধে লড়ে চলেছিল ঘরের বেগমের এবং বাইরের খদ্দেরের বিরুদ্ধে। কারণ এই অসহায় প্রাণভিক্ষুকটিকে ইদু একদিন প্রাণভিক্ষা দিয়েছিল (এক দুপুরে বাড়িতে কুটুম এলে ওটার গলা কাটার জন্য সকলে

www.pathagar.com

মিলে চতুর্দিক থেকে তাড়া দিলে উপায়ান্তর না-দেখে প্রাণ বাঁচানোর শেষ আশ্রয় ভেবে মোরগটা উড়ে এসে তার কোলে বসেছিল এবং ইদু বাঁচিয়েও ছিল নিরপরাধ পাখিটার প্রাণ)। মোরগটার প্রাণরক্ষায় জেরবার ইদুর সময়-সময় আক্ষেপ হয় : 'সংসারে কি একরাশ লকলকে জিভ ছাড়া কিছুই নেই আর? মানুষ যা দেখে তাই কি খেতে ইচ্ছে করে তার? একটু স্নেহ নেই, একটু করুণা নেই—একবিন্দু সহানুভূতি নেই কোথাও?'

এসবের যে কিছুই নেই তার প্রমাণ :

"দারোগা আর একবার মোরগটার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে দেখলেন মোটা-মোটা পা-দুটোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা হাঁড়ি-কাবাবে পরিণত হয়ে গেল। রসুন, ঘি আর মসলা-জর্জরিত বাদামি রঙের হাঁড়ি-কাবাবটি যেন একেবারে দারোগার নাকের সামনেই দুলতে লাগল। আর ওই সঙ্গে যদি পোলাও হয়—এরপরে আর চক্ষুলজ্জার আবরণ রাখলেন না দারোগা।"

সামাজিক বিত্তে গরিব এবং মানবিক বৃত্তিতে ধনী ইদু মিঞার অবলা মোরগটার মাধ্যমে লেখক কেবল মনুষ্যসমাজের লোভ-লালসা-অনাচার-অবিচারের প্রতিকৃতিই আঁকেননি, জীবজগতের অন্তরের আর্তির প্রতিধ্বনিও শুনিয়েছেন। এবং সবই আশ্চর্য কার্যকরভাবে বলতে পেরেছেন—প্রাণিকুলের পারস্পরিক অবস্থিতির অন্তর্গত 'হাস্যকর'টি দক্ষ ব্যবহারের সাহায্যে। সুদক্ষ কারিগরের মতো গল্পকার নিপুণ হাতে গল্পটির প্লট নির্মাণ করেছেন। গল্পের ভেতরে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরাতেই বড়রা ছোটদের গিলে খেয়েছে—দীন মহম্মদ দারোগা দবিরুদ্দিন দফাদারকে এবং ইন্‌সপেক্টার ইমতিয়াজ চৌধুরী দারোগা দীন মহম্মদকে। তবে প্রণিধানযোগ্য যে সকলের ছোটকে কেউ গিলে খেতে পারেনি—মানে ইদু মিঞার মোরগাকে। সম্ভবত গল্পটিকে ইতিধর্মী রাখতে চেয়েছেন গল্পকার।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এই স্বচ্ছন্দবিহারী বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প-বিষয়ে গবেষণামূলক কাজের জন্য ডি.ফিল. উপাধি পান এবং প্রথমে সিটি কলেজে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকর্মে ব্রতী হন। তাঁর তিনখণ্ডের উপন্যাস 'উপনিবেশ', 'শিলালিপি', 'ছোটগল্পবিচিত্রা'; প্রবন্ধগন্থ 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', 'বাংলা গল্পবিচিত্রা', 'ছোটগল্পের সীমারেখা', নাটক 'ভাড়াটে চাই' ও 'আগন্তুক', কিশোরসাহিত্য 'টেনিদা'র গল্পসমগ্র সমকালে স্মরণযোগ্য আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সর্বকালেই স্মরণযোগ্য বিচিত্রবিহারী কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর কালজয়ী রম্যরচনা।

আবদুশ শাকুর

পঁচিশে জানুয়ারি ২০০৬ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

www.pathagar.com

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

ভোজনার্থে

সেদিন শ্রীমন্নারায়ণ বলেছেন, ঘুষ আর বখশিস এক জিনিস নয়। ও দুটোকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলা অবৈধ। পৃথিবীর সব দেশেই বখশিসের রেওয়াজ আছে, অতএব—

অতএব বখশিস কিংবা টিপ্‌স্ সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। ঘুষের সঙ্গে টিপ্‌সের তফাত কী? টাকার অঙ্কে? বলা শক্ত—কারণ, এই সুনন্দকে একদা দিনকয়েকের জন্যে পারী শহরে অবস্থান করতে হয়েছিল। বিখ্যাত লেখক হেমিংওয়ের ফরাসী টিপ্‌স্ সম্পর্কে একটা ভয়াবহ লেখা আগেই তার পড়া ছিল, কিন্তু তবু সাবধান হতে পারেনি। প্রথম দিনেই জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল তার। ট্যাক্সিওয়ালাকে পনেরো পার্সেন্ট—'পুরবোয়ার' (পানার্থে), কাফের গার্সোঁকে বারো পার্সেন্ট, সিনেমার 'উভ্‌রো'র (অর্থাৎ দ্বাররক্ষী)-কে বারো পার্সেন্ট—আর দরকার নেই, মাথা ঘোরাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। এগুলো সবই শুধু দেয় নয়, রীতিমতো আইনসঙ্গত। সেবার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য। কিন্তু কৃতজ্ঞতার এই ঋণ শোধ করতে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হয়েছিল পারী ছেড়ে। ট্রেনে উঠে শেষ 'পুরবোয়ার' দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল—পারীকে 'ওরেভোয়ার' বলতেও সাহসে কুলোয়নি আর।

সুতরাং, ঘুষের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক নেই। কাজ না করে কিছু আদায় করা, অথবা কাজ করে দেবার আগে কিছু বাগানো—তাকেই ঘুষ বলে। কাজ হয়ে গেলে খুশিমনে কেউ কিছু দিলে—পাঁচ আনা থেকে পাঁচ হাজার—অঙ্কটা যা-ই হোক, তাকে ঘুষ আখ্যা দেওয়া যায় না। তার নাম বখশিস—টিপ্‌স্—পুরবোয়ার। আর যাঁরা পানীয়রসিক নন, তাঁদের জন্যে ফরাসী করেই বলা যায় 'পুরমাঁজে', অর্থাৎ ভোজনার্থে।

আমরা, যারা খাঁটি বঙ্গীয় তাদের কাছে এই ভোজনটাকেই অতিশয় প্রশস্ত বলে মনে হয়। শ্রীমন্নারায়ণ যাই বলুন, নিতান্ত গরু চুরির মামলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে যদি দারোগা হাত পেতে দশটা টাকা বখশিস নেন এবং যদি ওপরওয়ালার সেটা শ্রুতিগোচর হয় তা হলে কোনো ফরাসী নজিরেই আর কুলোবে না; দারোগার চাকরি তো যাবেই, জেল হওয়াও অসম্ভব নয়। আমার মনে হয়, ইউরোপীয় টিপ্‌সের কথা স্মরণ রেখে 'ইলিগ্যাল গ্র্যাটিফিকেশন' কথাটা সংশোধন করে নেওয়ার সময় হয়েছে।

আর যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ ভোজনানন্দ ছাড়া আর কী-ই বা আছে! বাম হস্তের ব্যাপারে যদি অসুবিধা থাকে, তা হলে দক্ষিণ হস্তের স্মরণ নেওয়াটাই ভালো।

ইত্যাকার চিন্তার ভিতরে এক সহপাঠী বন্ধুর কথা মনে পড়ল। আপাতত সে ওপরতলার সরকারি কর্মচারী। অর্থাৎ তার কেরানী আছে, বেয়ারা আছে, আর্দালী আছে এবং অফিস আছে। তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে 'সাহেব'কে কার্ড পাঠাতে হয়।

www.pathagar.com

প্রথমে ঢুকেছিল সার্কেল অফিসার হয়ে। অর্থাৎ মাঠ ঘাট বন বাদাড় ঠেঙিয়ে বেড়াত। বৈশাখ মাসের রোদে পনেরো মাইল সাইকেল দাবড়ে গ্রামে ঢুকেও একটা ডাব খেতে সাহস পেত না—পাছে 'ইলিগ্যাল গ্র্যাটিফিকেশন'-এর আওতায় পড়ে।

আর এখন?

'পরস্মৈপদী খেয়েই বেঁচে আছি ভাই, নইলে যা দিনকাল! ডেপুটিগিরি করে সাড়ে ছ'টাকা কিলোর মাছ কিনে খাব? তুমি ক্ষেপেছ সুনন্দ!'

'বাড়িতে ভেট দিয়ে যায় বুঝি? মাছ—মুরগী—পাঁঠা?'

'আরে না, না। ওসব পাপ কাজের মধ্যে আমরা নেই। বড়জোর কথা কইতে এসে পার্টি একটা নতুন সিগারেটের টিন ভুল করে টেবিলে ফেলে যায়, ওই পর্যন্ত। আসল ব্যাপারটা হল : ডিনার। তবে পদমর্যাদা বুঝে। কারো বা ক্যালকাটা ক্লাব বা গ্র্যান্ডে, কারো বা আমজাদিয়া কিংবা দেলখোশে।'

'খেতে খারাপ লাগে না?'

'খেতে খারাপ লাগবে! যেসব রাজভোগ নিজের পয়সায় কেনা তো দূরের কথা, কখনো চোখেও দেখতে পাব না তা খেতে খারাপ লাগবে! কী যা-তা বলছ?'

'মানে এ-ও তো ঘুষ।'

'থামো হে নীতিবাগীশ, বাজে বকবক কোরো না। ঘুষ নয় হে—এই হল আজকের রেওয়াজ, বলতে পার শিষ্টাচার—অতিথিপরায়ণ বাঙালীর প্রীতি নিবেদন। দেশের যাঁরা সবচেয়ে মাননীয়, যাঁরা ভি.আই.পি. তাঁদের এক দল যে আমাদের সামনে স্বর্ণ-দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়েছেন। ধরো, গোবর-গণেশপুরের একটা পাঠাগার উদ্বোধন করতে হবে—একজন মহামান্য কেউ সেখানে পদক্ষেপ করলেন। তারপর? পুকুরে জাল পড়ল, পাঁঠা-মুরগীদের মধ্যে হাহাকার উঠল, সাত রকম সন্দেশের জোগাড় হল। অতিথি পরিতুষ্ট হলেন, আমরা যারা পৃষ্ঠরক্ষী হয়ে গেলুম, আমরাও বাদ পড়লুম না। এর মধ্যে যদি কোনো ওস্তাদ শিকারী নিজগুণে কিঞ্চিৎ লক্ষ্যভেদ করে থাকে—সে আমাদের দ্রষ্টব্য নয়।'

'হুঁ।'

'হুঁ কী হে? তাঁদের প্রেরণাতেই তো এই বেপরোয়া ভোজনানন্দ আমরাও চালু করে নিয়েছি। আমাদের দুর্ভেদ্য পিঠের চামড়া সম্পর্কে যত গুজব শুনতে পাও সে শক্তি আমরা কোত্থেকে পাই? সেই বাংলা প্রবাদটি স্মরণ করো। পেটে খেলে—'

'আহ্, থামো।'

'থামব কেন? তুমি তো জানো না বন্ধু, একটি পল্লীভ্রমণ, একটা ডিনারের জন্যে কীভাবে মুখিয়ে থাকি আমরা। নেমন্তন্ন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের শিরাস্নায়ুতে বিদ্যুৎতরঙ্গ বইতে থাকে। ছেলেবেলায় শুনেছিলুম : "বাঁচার জন্য খাইয়ো, খাওয়ার জন্য বাঁচিও না।" কিন্তু খাওয়ার জন্যে বাঁচার যে কী অপরূপ পুলক, সে আমি তোমায় কেমন করে বোঝাব হে?'

www.pathagar.com

'আমার বুঝে দরকার নেই। কিন্তু তোমার এই খাওয়ার আনন্দের মতো একটা ক্রুড ব্যাপারকে কিছুতেই মানতে পারছি না ভাই। ঘুষ বরং এর চাইতে ভালো, যে লোকটা টাকা নেয় সে শুধু নিজের জন্যেই নেয় না, অন্তত তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে তার একটা অংশ পায়। এ শুধু জঘন্য স্বার্থপরতা। শুধু নিজের পেটের জন্যে—।'

'ভুল করলে। সংসারে কে কার হে? চিরদিন শুনে আসছি, "একা এসেছি—একা যেতে হবে।" অতএব আনন্দটাও একারই। একেই বোধ হয় বলে, সোহং। আচ্ছা চলি তাহলে, আমার আবার ডিনার আছে একটা।'

সত্যিই তো, সংসারে কে কার। আর ক্রুড বলে কাকেই বা ধিক্কার দেব। সূক্ষ্ম—সুন্দর—সুকুমার—এগুলো এখন অতীত যুগের কনভেনশন। সেইজন্যেই তো এক রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে আমার বন্ধুর মতো এক সরকারি কর্মচারীকে—পদাধিকারবলে যিনি সভাপতি—বলতে শুনেছিলাম : ট্যাগোর—মানে ঠাকুর লাভ্‌লি পোয়েট্রি লিখতেন। তাঁর ক'টি লাইন আই স্টিল রিমেম্বর—'আজিকে তোমার মধুর মূরতি—হেরিনু—হেরিনু—মানে ওয়ানডারফুল!'

এই পর্যন্ত বলেই বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় তাঁর ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল।

'পুরমাঁজে'—খাঁটি কথা! আমরা ওটা মর্মে মর্মেই বুঝে ফেলেছি।

৭/৯/১৯৬৩

হরণ বনাম আহরণ

রবিবারের সকালে অধ্যাপক এসে আড্ডা দিচ্ছিল। আমাদের পাড়াটা কলকাতার বাইরে, বেশ নিরিবিলি। ট্রামের লাইন নেই, বাসের আওয়াজ কানে আসে না। জানালা দিয়ে শরতের অনেকখানি নীল আর পানাভরা পুকুরের একমুঠো ঘন সবুজ চোখে পড়ে। খানিক দূরে চটকল আছে, কুলিদের উপনিবেশও রয়েছে; কিন্তু রবিবারের এই সকালে অলস বিশ্রামে ঘুমিয়ে আছে সব। আমি জানালা দিয়ে চুপ করে চেয়ে আছি আর অধ্যাপক একখানা মাসিক পত্রিকা খুলে নিয়ে কী একটা লেখায় ধ্যানমগ্ন। তারও তাড়া নেই, এবেলা আমার এখানে তার খাওয়ার নেমন্তন্ন।

বেশ লাগছিল। শরতের লাল রোদ নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল মনে। কিন্তু বেসুরো হয়ে গেল। পত্রিকাটা ফেলে দিয়ে অধ্যাপক প্রায় চেঁচিয়ে উঠল 'চুরি!'

'কী চুরি হে?'

'এই গল্পটা। ইংরেজি থেকে নির্ভেজালভাবে লোপাট করা। বাঙালী লেখকদের এ কী দুর্গতি হে! শেষকালে সমারসেট মম থেকেও চুরি করতে হয়? ওসব গল্প যে স্কুলের ছেলেরাও পড়ে আজকাল। ছি—ছি।'

অগত্যা আমাকে ইজি-চেয়ারের ভিতর সোজা হয়ে উঠে বসতে হল।

www.pathagar.com

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। পৈতৃক সম্পত্তি তার সন্তানে বর্তায়। মানো কি না?'

'নিশ্চয়ই মানি। কিন্তু এর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে, বলছি। বাপের মোটরে ছেলে যখন চেপে বেড়ায়, তখন তুমি কী বলবে, মোটরটা সে চুরি করেছে?'

'বাপের মোটর হলে চুরি নিশ্চয়ই বলব না। কিন্তু অন্য লোকের গাড়ি তাকে না জানিয়ে গ্যারেজ থেকে বের করে আনলে আমাকে আর কিছুই বলতে হবে না, যা বলবার পুলিশই বলবে।'

'বন্ধু, তিষ্ঠ ক্ষণকাল।' অধ্যাপকের কেস থেকে একটা চুরুট টেনে নিয়ে বললুম, সাহিত্যের জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, ওখানে তোমার পুলিশী আইন খাটবে না। জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা মাত্রেই কনিষ্ঠের উত্তরাধিকার। ওখানে হরণ নেই, আহরণ আছে। আর সেটা পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত।'

'ইয়ার্কি দিচ্ছ।' অধ্যাপক ভ্রূকুটি করল : 'কপিরাইট অ্যাক্টকে বোঝাতে পারবে?'

'তোমাদের অনেক আইনের মতো ওটা সম্পূর্ণ বে-আইনি ব্যাপার। আমার থিয়োরী শোনো। তুমি একটি গল্প, একটি কাব্য কিংবা একখানা উপন্যাস লিখলে। বলা বাহুল্য, তোমার লেখায়—যাকে বলে পার্ফেকশন—সেটা এল না, কোনোদিন আসেও না। সুতরাং আর একজন তোমাকে মডিফাই করে আরো ভালো জিনিস দাঁড় করাল; তৃতীয়জন তাকে আরো নিখুঁত করে তুলল। তোমার লেখায় যেটা ছিল সম্ভাবনা সেটা ফুল-ফলে পরিপূর্ণতা পেল। তুমি হয়তো তখন বেঁচে থাকবে না; তোমার আত্মা—যদি মানো, সে তখন স্বর্গে কিংবা নরকে আনন্দে চার পা তুলে নৃত্য করতে থাকবে। বলবে, "ধন্য হল আমার প্রয়াস, এতদিনে চরিতার্থ হল আমার সাধনা"।'

'বড্ড বাড়িয়ে তুলছ সুনন্দ।' অধ্যাপক চটে উঠল, 'ইয়ার্কিরও একটা লিমিট্ আছে।'

'ভুল হল। লিমিট থাকলেই আর ইয়ার্কি হয় না, তাকে বলে রসিকতা। সেটা পোশাকী আর মার্জিত। কিন্তু ইয়ার্কি বেপরোয়া, সে আন্‌লিমিটেড। সে থাক্। আমি কিন্তু খুব সীরিয়াস্‌লিই কথাটা বলছিলুম তোমাকে।'

'জ্বালিয়ো না।'

'আমি জ্বালাবার কে ভাই? একদা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মহামান্য শেকস্‌পীয়র পড়তুম, তখন প্রোফেসারেরা কম জ্বালিয়েছেন আমাদের? হলিনশেড্ দিয়ে শুরু, তারপর বোক্কাচ্চো, ব্রান্দেলো। কার ভাণ্ডারে যে সে ভদ্রলোক সিঁধ দেননি, তার হিসেব রাখাই শক্ত। সে-সব তথ্য তুমি নিজেও আমার চেয়ে ঢের বেশি জানো। জার্মান মহাকবি "ফাউস্ট" লিখবার আগে আর ক'টা ফাউস্ট লেখা হয়েছিল হে? বেশ মনে আছে, অনেককাল আগে এক বিদেশী পণ্ডিত কতকগুলো পুরনো উপন্যাসের পৃষ্ঠাসুদ্ধ ব্লক করে দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে আলেক্‌জান্দার দ্যুমা কী নির্বিচারে পরস্ব হরণ করেছেন। কিন্তু তামাম দুনিয়ার রোমান্সের যিনি সম্রাট তাঁর খ্যাতি

www.pathagar.com

এতটুকু ম্লান হয়েছে কি? ন্যাথানিয়াল হর্থনও একবার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু দ্যুমার রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে লেগে তাঁর আওয়াজ গুলতির গুলির মতোই ছিটকে চলে গেছে। অতএব মিথ্যে দুশ্চিন্তা কোরো না—এই হরণ, না-না আহরণ-বৃত্তিই হল সাহিত্যের ট্রাডিশন, বলতে পারো কুলপ্রথা।'

অধ্যাপক হতাশ হয়ে বললে, 'কথার জন্যেই কথা বাড়াচ্ছ খালি। যে-সব উদাহরণ তুমি দিলে, তা থেকে এটা মানতে রাজি আছি যে ওগুলো হল সত্যিকারের মডিফিকেশন। সক্ষম লেখকেরা অক্ষমকে বরং গৌরবই দিয়েছেন। আর ও-যুগ চলেও গেছে, এখন—'

'চলে গেছে? কতদিন হল চলে গেছে ভাই? আর সক্ষম অক্ষমের প্রশ্নই যদি তোলো, তা হলেও অনেক কথা এসে যায়। কবি আলান পো—সবচেয়ে বেশি খ্যাতি তাঁর "দাঁড়কাক" কবিতার জন্যে, অথচ সেদিন এক মার্কিন অধ্যাপক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, ওর আইডিয়া ডিকেন্সের "বারনাবি রাজ" থেকে নেওয়া। চার্লস্ আর এডগার—এঁদের ভিতর সক্ষম কাকে বলবে তুমি?"

'ওটাকে প্রভাব বলতে পারো। ঋণ নয়।'

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, 'বেশ, আরো কাছাকাছি এসো। জেকব্‌সের বিখ্যাত "বাঁদরের থাবা"র পরিচয় অনাবশ্যক, দুর্ধর্ষ গল্প, দুরন্ত নাটক। কিন্তু বালজাকের উপন্যাস "পো দ্য শাগ্র্যা"র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো একবার। জেকব্‌স আর বালজাকের মধ্যে কে সক্ষম, কে অক্ষম? এমনকি, যে সমারসেট মমের কপিরাইট্ নিয়ে তুমি ওকালতি করছিলে, তাঁর উৎস-সন্ধানে ছেলেবেলায় পড়া মোপাসাঁর পাতা উল্টে দেখো একটু, একেবারে নিরাশ হবে না। এমনকি ওঁর সবচেয়ে নামকরা গল্প "বৃষ্টি", যা থেকে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন ভদ্রলোক, তার সঙ্গে আনাতোল ফ্রাঁসের "ত্যে" উপন্যাসটির কোনো সম্পর্ক পাও কি না তাও ভেবে দেখো।'

'অনেক সময় কো-ইনসিডেন্স—'

'ওটা খুন করে পাগল সাজার মতো সাফাই গাওয়া। সাহিত্যবিচারে ও-সব টেকে না। তবু দ্যাখো, শুচিবাই রোগটা তোমাদেরই বেশি; বিদেশে এ-সব নিয়ে ওরা এখনো বিশেষ মাথা ঘামায় না। বড়োজোর, তোমাদের মতো পণ্ডিতেরা মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখে আত্মতৃপ্ত হন, কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে ওটা উত্তরাধিকারের দাবি এবং স্বতঃসিদ্ধ। আর চিরকালই এ-সব ওরা দেখে আসছে। যদি পুরনো সাহিত্যে ফিরে যাও—দেশে দেশে একই বিষয় নিয়ে যে-সব গল্প-নাটক-মহাকাব্য লেখা হয়েছে, সেগুলো আলোচনা করো—'

অধৈর্য হয়ে টেবিলে কিল মারল অধ্যাপক। বললে, 'থামো! আমি প্রোফেসার, কিন্তু বকুনিতে তুমি আমারও মাথা ধরিয়ে দিলে। বাজে তর্ক রাখো। মোদ্দা কথা, এইসব বাঙালী সাহিত্যিকচোরকে যদি তুমি সমর্থন করো, তাহলে সত্যি বলছি সুনন্দ, তোমার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

হাতাহাতির আর দরকার হল না। তার আগেই দ্বারপ্রান্তে কঙ্কণ-ঝংকার এবং আমার গৃহিণীর প্রবেশ। তীক্ষ্ণ হাসি হেসে মধুর কণ্ঠে আদেশ জানালেন, 'মারামারিটা একটু পরেই করবেন দুই বন্ধুতে। এখন শীগ্‌গির চান করতে যান, আমার রান্না তৈরি!'

সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

৫/১০/১৯৬৩

ভূতের গল্প

আশা করি, সেই আশ্চর্য ভূতের গল্পটি আপনারা সকলেই জানেন। গল্পটির মহিমা হচ্ছে তার বাক্‌-সংক্ষিপ্তিতে; এমন অল্পকথায় এহেন 'রসোত্তীর্ণ' (বাংলা সমালোচনার ভাষায়) ভৌতিক কাহিনী আর দ্বিতীয় রচিত হয়নি।

ভালো গল্প দু-বার শুনলেও ক্লান্তি আসে না। সুতরাং পুনরাবৃত্তি অমার্জনীয় হবে না ভরসা করছি।

"অন্ধকার রাত্রি। কোনো দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেন, তারই একটি কামরায় মুখোমুখি দু'জন যাত্রী। একজন নিবিষ্ট চিত্তে একটি পত্রিকা পড়ছেন, অপর জন নীরবে বসে আছেন।

যিনি পত্রিকা পাঠ করছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে চোখ তুললেন। সহযাত্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, এতে একটা হানাবাড়ির বিবরণ আছে। স্রেফ গাঁজা। ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করি না।

দ্বিতীয় যাত্রী বললেন, ওঃ, করেন না নাকি? আর বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।" প্রথম যাত্রীটির কী হল গল্পে তা বলা নেই। বলবার প্রয়োজনও নেই আশা করি।

বস্তুত, এই গল্পটি পড়বার পর থেকেই আমি যাবতীয় ভৌতিক এবং অলৌকিক কাহিনীর অনুরাগী হয়ে উঠেছি। বিদেশী সাহিত্যে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলুম ভৌতিক বিশ্বাস এবং উৎকট গল্প লেখায় ওরা আমাদের চাইতে ঢের বেশি অগ্রসর; মন্ত্রতন্ত্রে অগাধ বিশ্বাস, ডাকিনী সংস্কারে নিবিড় অনুরাগী। ওয়াল পার্জিস নাইটের উৎসব দেখবার জন্যে হার্জ পাহাড়ে হানা দেয় কিনা জানি না, কিন্তু গোপনে কেউ কেউ এখনো শয়তান-পুজোর চক্র বসায় এবং সুবিধে পেলে নরবলিও পর্যন্ত দিয়ে থাকে।

সবেগে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম বিশ্বমানবের মিলনকেন্দ্রটি কোনখানে! ধনবাদ নয়, নির্ধনবাদ নয়, ঈশ্বরবাদ নয়, নিরীশ্বরবাদও নয়। ধর্মের নামে তো ইতিহাসের পাতা রক্তাক্ত। শুধু একমাত্র ভৌতিক বিশ্বাসেই সমস্ত হৃদয় একসূত্রে বাঁধা। দেশ-কাল-জাতির ঊর্ধ্বে মহামানবের মিলনক্ষেত্র "হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক"—ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু কয়েকজন কেঠো নাস্তিককে বাদ দেওয়া যেতে পারে, আর ওই ব্যতিক্রমেরা আছে বলেই তো নিয়ম প্রমাণিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

একসময় মনে হয়েছিল, ভূতের ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বড় বড় শ্মশান, অন্ধকার বটগাছ, অন্ধকার পোড়োবাড়ি, হাট থেকে ফিরবার পথে ঘন কালো রাত্রির বাঁশবন। মাছ চাইবার পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত জায়গা। নতুন রাস্তাঘাট আর ইলেকট্রিক আলোর উৎপাতে এরা প্রায় লুপ্ত হতে চলল। এখন দেখতে পাচ্ছি ভূত অমর অজর অক্ষয়। বিজ্ঞান যতই দুর্ধর্ষ বেগে এগিয়ে চলুক, ভূত তার সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। জীববিজ্ঞান বলে, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারলেই জীবনের অগ্রগতি অব্যাহত হয়ে থাকে, ভূত (জীব, না জীবাত্মা? না আর কিছু? পণ্ডিতেরাই বলতে পারবেন) তেমনিভাবেই অনাদি অনন্তকাল এগিয়ে চলবে, এমনকি অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশযাত্রীরা চন্দ্রলোকের পথেও অশরীরী স্পেসম্যানের ভৌতিক ভ্রূকুটি দেখতে পাবে!

ভূত আছে কি নেই, এ তর্ক নিতান্ত অনাবশ্যক বলে মনে হয় আমার। আসলে ভূত আমাদের প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন দিনে দিনে বেড়েই চলতে থাকবে। আমাদের জীবনে যা-কিছু থ্রিল ছিল, সবই তো প্রায় শেষ হয়ে এল। প্রেম এখন রোমান্স-বর্জিত, আফ্রিকার নরমাংসখাদকদের নিয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখলে আন্তর্জাতিক মৈত্রী আহত হবে; গোয়েন্দা গল্পে আগে খুনখারাপির প্রভূত শিহরণ ছিল, এখন অতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক হত্যাকাণ্ড এবং আরো সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ডিটেকশন। অ্যাটম বোমার আবির্ভাবের পর থেকে যুদ্ধ আর আমাদের কৌতূহল স্পন্দিত করে না। সমূহ সর্বনাশের অতটা থ্রিল অন্তত আর যারই কাম্য হোক, সুনন্দর মতো সাধারণ মানুষদের তা বরদাস্ত করা শক্ত।

একটি বর্ষণমুখরিত রাত, সাঁওতালপরগণার মাঠের ভিতর নির্জন একটি বাংলো, ঘরের আলোটি মিটমিটে, ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরুল, ঘরে তিনটি জড়োসড়ো প্রাণী; চতুর্থ ব্যক্তির চোখ পাণ্ডুর আলোয় যেন জ্বলজ্বল করছে এবং অদ্ভুত খসখসে গলায় তিনি বলে চলছেন, তিন বছর আগে এই বাংলোর এই ঘরটিতে, এমনি এক রাত্রে—

নিজেকে তিনটি শ্রোতার অন্যতমরূপে কল্পনা করুন। হাত-পা-ঠাণ্ডা, রক্ত জল, সচেতন-অচেতনের কেন্দ্রবিন্দুতে দুলছেন, অথচ গল্পের আকর্ষণে স্থির হয়ে আছেন। উঠে পাশের ঘরে পালাবার মতো শক্তি বা সাহস কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এই ভয়াবহ আনন্দের ব্রহ্মাস্বাদ ভূতের গল্প ছাড়া আর কোথায় পাবেন? শুনেছি, চণ্ডুর নেশা এমনি একটা তূরীয় লোকে পৌঁছে দেয়, কিন্তু এর সঙ্গে তার—

ভূতের থীসিস এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় গলা-খাঁকারি দিয়ে প্রতিবেশী নকড়িবাবু এলেন। আমি কাগজপত্র ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বললুম, আসুন।

নকড়িবাবু বললেন, বসব না। একটা সুখবর দিতে এলুম কেবল। আমার ছেলে পাঁচকড়ি খুব ভালো পাশ করেছে, ফার্স্ট ডিভিশনে।

আমি দারুণ চমকে গেলুম। পরীক্ষার আগে পাঁচকড়ি আমাকে কিছু ইংরেজি লেখা দেখাতে এসেছিল। তার একটি রচনাতেই বানান ব্যাকরণে সবসুদ্ধ আটচল্লিশটি

www.pathagar.com

বীভৎস ভুল নজরে পড়েছিল আমার। বলতে গেলুম—"বাঃ—বাঃ"—কিন্তু উচ্ছ্বাসটা টাকরাতেই ঠোকর খেয়ে থমকে গেল।

নকড়ি বুঝলেন। বললেন, অবাক হবেন, জানা কথাই। কিন্তু একটু ম্যানেজ করলুম আর কি!

—ম্যানেজ?

—ওই যা বলেন। নকড়ি চাপা গলায় বলতে লাগলেন, এই মহলে একটু চেনাশোনা ছিল কিনা। একজামিনার—হেড একজামিনার—এঁদের একটু ক্যাচ করেছিলুম।

আমি শুনে যেতে লাগলুম।

নকড়ি বলে চললেন, ব্যাপারটা এই রকম। ধরুন, পেঁচো পঁচিশ মতো লিখেছিল, চেনা একজামিনার চল্লিশ বসিয়ে দিলেন। হেড একজামিনারকে তো আগেই তদ্বির করা ছিল, তিনি খাতাটা দেখবার সুযোগে আরো পনেরো বাড়িয়ে দিলেন। ছ'জন একজামিনার আর ছ'জন হেড একজামিনার গড়পড়তা পঁচিশ নম্বর করে বাড়িয়ে দিলেও হিসেব করে দেখুন—

হিসেব আসছিল না, মাথা ঘুরছিল।

নকড়ি বললেন, আজ সন্ধ্যেয় একটু চায়ের ব্যবস্থা করেছি। আসবেন দয়া করে।

নকড়ি চলে যাওয়ার পর আমি একভাবেই বসে রইলুম। নড়াচড়া বন্ধ, হাত-পা কালিয়ে আসছে, বুকের রক্ত ঠাণ্ডা। একটা ভয়াবহ আনন্দের ব্রহ্মস্বাদে অনুভূতি প্রায় লুপ্ত। পাঁচকড়িও ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করল! এর চাইতে অলৌকিক ঘটনা পৃথিবীর কোন ভৌতিক লেখক লিখতে পেরেছেন?

এর পরও ভূত মানব না? বলেন কী মশাই!

১২/১০/১৯৬৩

বারোটি উপন্যাস

অধ্যাপকের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। টেলিফোন করে জানতে চাইলুম, 'খবর কী? জীবিত না মৃত?'

উত্তর এল—'মৃত?'

'হঠাৎ মারা গেলে কেন?'

'পুজো সংখ্যার জন্যে উপন্যাস লিখছি। এখন বিরক্ত কোরো না সুনন্দ।'

'কতদিন পরলোকে বাস করবে?'

'বলতে পারছি না। আপাতত আমার নায়িকা লছমনঝোলা পার হচ্ছে। দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়েছি তাকে নিয়ে।'

কুড়ুং—কড়—কড়—কড়! ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

লোকটার দুর্ব্যবহারে মনটা খারাপ হয়ে গেল। নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে পাষণ্ডটাও মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করুক, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে অন্তত এই ছুটির দিনটায় ঘণ্টাদুই আড্ডা দিয়ে যেতে পারত আমার সঙ্গে।

বিরক্ত হয়ে একটা পত্রিকার পাতা উল্টে যেতে লাগলুম। রাশি রাশি শারদীয়া সংখ্যার বিজ্ঞাপন। আর সকলের তারস্বরে ঘোষণা : পাঁচখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস, সাতটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, দশটি বিশাল উপন্যাস মাত্র সাড়ে তিন টাকায়।

অধ্যাপক বন্ধু কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করে থাকে। ভিড়ের ভিতর সে-ও ভিড়ে পড়েছে। উন্নতি হোক লোকটার। কিন্তু পাঁচখানা-সাতখানা-দশখানা উপন্যাস! আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

উপন্যাস কথাটার অর্থ কী। একবার সংস্কৃত অভিধানের পাতায় অনুসন্ধান করেছিলুম। দেখলুম, 'বাক্যের উপক্রম'। অর্থাৎ কারো সঙ্গে আলাপ জমাবার আগে প্রাথমিক সৌজন্য পর্ব : 'এই যে কেমন আছেন'—ইত্যাদি। তার সঙ্গে নভেলের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। ফিকশন বা নভেলের প্রতিশব্দ হিসেবে তার ব্যবহার একান্তই বঙ্গীয় প্রতিভার নিদর্শন এবং বঙ্গের ভাণ্ডার থেকে বিবিধ রতনের সঙ্গে হিন্দীও পরম অনুরাগে তাকে আহরণ করে নিয়েছে।

সুতরাং বঙ্গের গঙ্গোদকে অভিষিক্ত এই বিচিত্র নামের সঙ্গে বাঙালীর উপন্যাসও তার বিচিত্র সৃষ্টিকুশলতার উদাহরণ। বিশেষ করে, এই শারদীয় উপন্যাসমালা এক অপূর্ব সামগ্রী এবং শুনেছি—অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞাই হল প্রতিভার পরিচায়িকা। পৃথিবীর কোনো দেশে এর তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিকেরা মার্জনা করুন—তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ-ক্ষেপণ সুনন্দর অভিপ্রায় নয়। আমি আমার বিমূঢ়-বিস্ময় নিবেদন করছি মাত্র।

সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন, দস্তইভস্কির সবচাইতে বড়ো অখ্যাতিই হল তাঁর দ্রুত লিখন। জীবিকার তাড়নায় বইয়ের পর বই লিখতেন, তাঁর অমার্জিত অসংযত লেখার জন্যে এখনো সমালোচকের কাছে তিনি নিন্দিত; এর আর এক সীমান্তে আছেন লেভ তলস্তই—আয়তনে রোমাঞ্চ-জাগানো অতিকায় বইগুলোকে বারবার নতুন করে না লিখে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। উপন্যাস শুধুই লেখনীচর্চা নয়, তার মধ্যে দিয়ে জীবন-জগৎ-মানুষ সম্পর্কে লেখকের ইতিমূলক বা নেতিবাচক যে কোনো একটি বিপুল সত্যভাষণেই তার পরাকাষ্ঠা : আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের গুণক্রম নিরূপণে এই শর্তটিই প্রথমে গৃহীত হয়ে থাকে।

'উপন্যাস' শব্দটির আভিধানিক তাৎপর্য যা-ই হোক, সুপ্রাচীন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বাংলা উপন্যাসে এই 'হাই সিরিয়াসনেস'-ই আমরা অনুভব করেছিলুম। আমাদের ছাত্রজীবনেও দেখেছি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত বাঙালী লেখক তাঁর প্রায় প্রত্যেকখানা উপন্যাসে একটি নিবিড় গভীর বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন। সকলের সব লেখা সার্থক হয়নি, হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু চেষ্টায় তাঁদের ত্রুটি ছিল না। আর সেই সদিচ্ছা আর প্রয়াসের ফলেই আমরা বাংলাসাহিত্যকে সেদিন ভালোবাসতে শিখেছিলুম। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ

www.pathagar.com

থেকে কল্লোলের বিদ্রোহী নবীন বীরেরা—সব মিলে একটা অসীম সম্ভাবনার আকাশ খুলে দিয়েছিল চোখের সামনে। সেই ধারাটা যেন হঠাৎ থমকে গেছে। আর এই পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড স্রোত যেন হাজারটা ছোট ছোট খাঁড়িতে ভাগ হয়ে বয়ে চলেছে—না আছে শক্তি, না আছে প্রাণ। এরাই শারদীয়া উপন্যাস।

লেখকদের নিন্দা করে লাভ নেই, সম্পাদকের বকলমে এই নাকি পাঠকের দাবি। সে দাবি মেটাবার জন্যে তাঁরা উপন্যাস-রচনায় অকুতোভয়। তিন মাসে তিনখানা উপন্যাস। মস্তিষ্কের ভূমিকা গৌণ। আঙুলের পেশি শক্ত থাকলেই কয়েকটা সিচুয়েশন এবং কিছু চরিত্র জুড়ে দিয়ে পুজোসংখ্যার আশী পৃষ্ঠা আলোকিত করা চলে। সেই আলোকেই লোকে পুলকিত—বিনা পরিশ্রমের "মনোহর কহানিয়া" বিমলানন্দে পাঠ এবং বিমলতম আনন্দে বিস্মরণ! তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাঙন ধরেছে অন্যত্র। সেদিন পরিচিত একজন খ্যাতনামা লেখক দুঃখ করছিলেন, "এই রম্য উপন্যাসের কল্যাণেই বাংলা ছোটগল্প গেল।"

অথচ বাংলা গল্প আমাদের সবচাইতে গৌরবের জিনিস। লিরিক কবিতার মতো ছোটগল্পও বাঙালীর মননের সেরা ফসল। উপন্যাসে ফ্রান্স কিংবা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কাছে আমরা পৌঁছুতে পারিনি। তলস্তই এখনো আমাদের দূর গিরিচূড়া, ডক্টর ম্যান আজও আমাদের কাছে কল্পনাতীত; কিন্তু আশ্চর্য, কিছু ভালো কবিতা আমরা লিখেছি, আমাদের সর্বকনিষ্ঠ গল্পলেখকও দীপ্তিমান। এই দুটি ক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিক মর্যাদার শরিক।

জানি, কবিতা বিক্রি হয় না, জানি প্রথম মুদ্রণেই গল্পের বই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার তালিকায় গিয়ে পরমার্থ লাভ করে। তবু এই দুঃখের তপস্যাতেই সাহিত্যকে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলুম। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত লেখকও আর গল্প লিখতে চান না। কী হবে লিখে? পত্রিকার পাতায় সৌজন্য-রক্ষার নিয়মে ছাপা হয়, ভালো হলে সামান্য প্রশংসাও হয়তো মেলে। কিন্তু ততঃ কিম্? বই বিক্রি হয় না; 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'বাছাই গল্প' তৈরি করে কিঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করা চলে। তার চাইতে যে-কোনো উপায়ে একটা উপন্যাস দাঁড় করানো যাক। পঞ্চাশ টাকার বদলে পাঁচশো—সিনেমারঞ্জিত সাহিত্যপত্রিকা হলে এবং লেখকের কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়তা থাকলে দেড় দু-হাজার টাকার চেকও অলভ্য নয়। তাতে বাড়ি-গাড়ি সব হয়।

আপত্তি নেই। লেখকের বাড়ি-গাড়ি আমাদের জাতীয় মর্যাদার পরিচায়ক। কিন্তু কী ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে? পুজোসংখ্যার সাতখানা উপন্যাসের চাহিদা মিটিয়ে কার উদ্যম অবশিষ্ট থাকে সিরিয়াস বই লেখবার? উপন্যাসের ফট্‌কাবাজিতেই যদি বরাত ফেরে, কার মাথাব্যথা পড়েছে সমস্ত মন এবং শিল্পবোধকে সংহত করে একটি নিটোল মুক্তোর মতো ছোটগল্প গড়ে তোলবার?

রম্য উপন্যাসের নেশায় সারা দেশ আকণ্ঠ—কেউ আর গল্প পড়বে না। কবিরা কাব্য লিখবেন, বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করবেন, আর বড়োজোর বিদেশী লেখকের ভাষায় এই সান্ত্বনা লাভ করবেন—

www.pathagar.com

"Publishing a volume of verse is like dropping a rose petal down the Grand Canyon and waiting for the echo."

অতএব আগামীদিনের ছবিটা স্পষ্ট। শুধুই উপন্যাস, রাশি রাশি উপন্যাস এবং শারদীয়া বিজ্ঞাপনের ভবিষ্যৎ নমুনা : বারোখানা বিরাট উপন্যাস; একটিও গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ নেই!' অর্থাৎ সব জলবর্জিত খাঁটি ক্ষীর। হয়তো এর মধ্যে থেকেও দু'একটি ভালো লেখা বেরিয়ে আসবে, দুর্ঘটনা তো ঘটেই। এবং সেই সঙ্গে বাঙালীর রুচি এবং সংস্কৃতির অভিমান—

গৃহিণী ঢুকলেন বিজয়িনীর মতো। হাতে নতুন একটি পৃথুল শারদীয়া।

'কী ওটা?'

'অষ্টবসু পত্রিকা। আটটা উপন্যাস আছে এতে।' মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করতে লাগল, 'হকারকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলুম।'

বলতে যাচ্ছিলুম "অষ্টরম্ভা', কিন্তু মনের অগোচরে তো পাপ নেই। আটখানা উপন্যাসের আকর্ষণে ওটিকে গৃহিণীর কাছ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আমিই যে প্রাণপণে চেষ্টা করব, সেকথা আমার চাইতে বেশি করে কে জানে?

১৯/১০/১৯৬৩

'দাদু' প্রসঙ্গ

স্টেশনের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় বসে চা খাচ্ছিলুম। সামনে সাইকেল রিক্সার আনাগোনা, অদূরে দুটি আমের গাছে নতুন মুকুল। বসন্ত দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার গায়ে এখনো শীতের হালকা চাদর জড়ানো। আগেকার দিনে এই সময়ে লোকে কবিতার কথা ভাবত, আর আমি ভাবছিলুম অবিলম্বে টিকে নেওয়া উচিত। এমন সময়—

কী বললি? এই ছোঁড়া—কী বললি তুই?

গর্জন শুনে চেয়ে দেখলুম আমার সামনের টেবিলে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক একেবারে মারমূর্তি। আর পনেরো-ষোলো বছরের হাফপ্যান্ট পরা বয় থরহরি কম্পমান।

বয় একটু সামলে নিয়ে বললে : বলছিলুম 'মামলেট' দেব, না পোচ দেব? তাতে অন্যায়টা কী হয়েছে দাদু?

দাদু! ইয়ার্কির আর জায়গা পাসনি? কোন সুবাদে দাদু বলে ডাকিস আমাকে? ফের যদি ফাজলামো করবি তো একটি চড়ে আধখানা গাল উড়িয়ে দেব।

এর মধ্যেই হাঁ-হাঁ করে মালিক ছুটে এলেন। করজোড়ে বলতে লাগলেন : আপনারা পুরনো খদ্দের স্যার—এ নতুন এয়েচে, এসব ছেলে-ছোকরার কথায়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা আমার মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগিয়ে দিল। শুধু এজন্যে নয়—মনে পড়ে গেল, কিছুকাল আগে ট্রাম-বাস কন্ডাক্টারদের মুখে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে 'দাদু' সম্ভাষণ বে-আইনি করে দেওয়া হয়েছে। সেটা যে জনমতের চাপেই ঘটেছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে 'দাদু' প্রায় দদ্রু শব্দ থেকে নিষ্পন্ন—ওইরকম অশ্লীল এবং জ্বালাময়।

পশ্চিমে দেখেছি, অপরিচিত ব্যক্তিকে 'মামা' বলে ডাকলে মারামারির উপক্রম হয়ে থাকে। অর্থাৎ সম্বোধিত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বক্তার পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি অনুমান করে নেন। তাঁদের চটবার কারণ বুঝতে পারি। কিন্তু 'দাদু' শুনলে এতটা উত্তেজিত হবার কারণ কী?

বয়েস স্বাভাবিক নিয়মেই বেড়ে থাকে। এবং যদিচ আমাদের প্রত্যেকেরই প্রবল আপত্তি আছে, তবু বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের সকলেরই বুড়ো হতে হয়। আমরা আয়না ধরে পাকাচুল তুলে থাকি, কেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য-বর্ধক তৈল (নিন্দুকে কলপ বলে) ব্যবহার করি, সখেদে জানাই—'আমাদের বংশের ধারাই এই, বিশ পেরুতেই চুলে পাক ধরে!' তবুও শেষ রক্ষা হয় না। ট্রামের লেডিস সীটের তরুণীটি যখন পাশের খালি জায়গাটি দেখিয়ে বলে 'বসুন না দাদু—বুড়োমানুষ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?' তখন, সেই নিদারুণ মুহূর্তে একেবারে 'স্বর্গ থেকে বিদায়'! তারপর "মোহমুদ্গার" আওড়ানো ছাড়া কিছুই আর করবার থাকে না। তাই "দাদু" সম্ভাষণে আমাদের এমন আপত্তি; তাই ডাকটা শোনবামাত্র আমাদের অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে।

সুনীতি চাটুজ্জ্যে মশাই কী বলবেন জানি না, কিন্তু আমার ধারণা কলকাতায় ট্রামে, বাসে হোটেলে রেস্তোরাঁয় যে 'দাদু' শব্দটির আমদানি হয়েছে—তার সঙ্গে বার্ধক্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। আসলে ওটি কলকাতার সংস্কৃতিতে পূর্ববঙ্গের অবদান। 'সাথী' শব্দের সাথী হয়েই 'দাদু'র এতদ্দেশে অনুপ্রবেশ।

দাদা থেকে আদরার্থে 'দাদু'—যেমন হাবা থেকে হাবু। পূর্ববঙ্গে দেখেছি সবেগে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বন্ধু বা প্রিয়জনকে অভ্যর্থনা জানানো হল : 'কিরে দাদু, আছস্ কেমন?' অনুরাগ একটু প্রবল হলে 'দাদুয়া' পর্যন্ত শোনা যায়। তাতে কেউ কখনো চটেন না এবং দাদুয়ার সঙ্গে দর্দুরের কোনো যোগসূত্রও কল্পনা করেন না।

অতএব 'দাদা' যদি মূল উৎস হয়—তাহলে 'দাদু' ডাকে আমাদের উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। বরং আর একটু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা প্রণিধান করা দরকার। দাদা হতে পারা কি খুব খারাপ? আর হওয়াটাই কি খুব সহজ?

অবশ্য পারিবারিক "দাদাত্বে"র কথা বলছি না—ওটা কারো স্বোপার্জিত ব্যাপার নয়। কিন্তু রাজনৈতিক দাদাগিরি? তার মতো সুখের জিনিস সংসারে আর কী আছে?

তখন ভ্রাতাদের কাঁধে দোদুল্যমান পালকি, আর সেই পালকিতে দাদার অধিষ্ঠান। রোদে পোড়া, জলে ভেজা, কাদায় আছাড় খাওয়া—এগুলো ভ্রাতাদের জন্যেই বরাদ্দ, দাদা দয়া করে তাদের কাঁধে চেপেছেন, এতেই তাদের ইহ-পরকাল ধন্য!

www.pathagar.com

খরচের ভিতরে কিঞ্চিৎ বাণী-বিন্যাস কিন্তু আয়ের সম্ভাবনা অনন্ত। ক্ষীর-সর—গাড়ি-বাড়ি, ইলেকশনে সিদ্ধিলাভ এবং—আরো উর্ধ্বলোকের পথই বা ঠেকাচ্ছে কে! পনেরো বছর বয়সে একবার থানার দারোগাকে ভেংচি কেটে কিংবা বক দেখিয়ে ঘণ্টাখানেক হাজতে আটক থাকলেই হল; 'দেশ-সেবা' এবং 'কারাবরণে'র সেই প্রিমিয়ামেই বাকি জীবনটা চমৎকার করে উৎরে যাবে—কেবল দাদা হতে জানা চাই।

সে জানা অত সহজ নয়।

আরো একরকম দাদা আছেন। তাঁদের ননী-ছানার ভাগ্য কেমন জানি না কিংবা কখনো কখনো রাজনৈতিক দাদার চাইতেও তাদের আমি বেশি ঈর্ষা করে থাকি। কবি বলেছেন : রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন—এই সাধনায় তারা কেবল সিদ্ধই নন—একেবারে সিদ্ধাচার্য হয়ে বসে আছেন।

যে বাড়িতেই যান—ব্যথাহত প্রাণে দেখবেন, এইরকম একটি দাদাই সবক'টি তরুণীকে নিয়ে আসর জাঁকিয়েছেন—সেখানে নাক গলাবেন, সাধ্য কী আপনার। তাঁরাই মেয়েদের নিয়ে মার্কেটিঙে যান, নতুন গাড়ির ট্রায়াল দেন, ক্রিকেটের মাঠে সঙ্গিনীকে 'লেটকাটে'র জায়গায় 'লেগকাট' বোঝান, দুনিয়ার যত হাসির গল্প তাঁদেরই ঠোঁটাগ্রে! আপনি একমাস চেষ্টা করেও যে মেয়েটির কাছে মুখ খুলতে পারেননি, তিন মিনিটেই তার সঙ্গে দাদা জমিয়ে নেবেন, পাঁচ মিনিট পরে দু'জনে হাসিতে গড়িয়ে পড়বেন আর সেই অবিশ্বাস্য সিদ্ধিলাভ দেখে আপনার হৃদয় শুধু হাঁড়ি-কাবাবের মতো গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকবে।

এদের যে-কোনো একটি দাদা হতে আপনার আপত্তি আছে কি? আমার নেই। তাই 'দাদু' সম্ভাষণে আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই না—বরং একটা অদূর সম্ভাবনার আশায় আমার প্রাণ ময়ূরের মতোই নাচতে থাকে।

২২/২/১৯৬৪

উইলিঅম শেক্‌স্‌পীআর

অতএব মহাকবি শেক্‌স্‌পীআরের চার শতাব্দী পূর্ণ হল।

ব্যক্তিত্বটি এমন যে, তাঁর এই চতুর্থ শতবার্ষিকী সারা পৃথিবীর উৎসব। গ্রীক ট্রাজিডীর মহাস্রষ্টাদের মতো তাঁর নাটক দেশকালের সীমা অতিক্রান্ত, তাঁর রচনায় সর্বজনের সমান অধিকার। ভলত্যারের মতো উগ্র বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে আমাদের হৃদয়পদ্ম, রবীন্দ্রনাথের লেখায় পর্যন্ত তাঁর আক্ষরিক প্রভাব। শেক্‌স্‌পীআর মানব-সংস্কৃতির এক চিরন্তন বিস্ময়।

রূপকথার মতো জীবন, নাটকের মতো প্রেম, কিংবদন্তীর মতো ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের সাক্ষ্য যে না আছে তা-ও নয়। অ্যাভনের তীর আজও তাঁর স্মৃতিবাহী, হ্যাথাওয়ে ফার্ম এখনো বিদ্যমান, লিখিত প্রমাণও প্রচুর। তবু উইলিঅম

www.pathagar.com

শেক্‌স্‌পীআর এক মায়ালোকের অধিবাসী। কখনো তিনি ফ্রান্সিস বেকনের ছায়ায় অপসৃত, কখনো বা ক্রিস্টোফার মার্লোর নেপথ্য পুরুষ। থেকে থেকে অধ্যাপক ও সমালোচকের বিচিত্র মস্তিষ্কতরঙ্গে নানা দাবিদারের আবির্ভাব, তাঁর সমাধি খনন করে রহস্যভেদের পরিকল্পনা। সম্প্রতি রুশীয় 'শিকপুরভ' পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে কাউকে আমদানি করা সম্ভব কিনা সেটা পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচার্য, কিন্তু পাকিস্তানী গবেষকরা রাওয়ালপিণ্ডির অধিবাসী কোনো 'শেখপীর'কে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন কিনা, সে সম্পর্কে তাঁদের গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার।

শেক্‌স্‌পীআর কি সত্যিই কেউ ছিলেন—নিন্দা-প্রশংসার আলা-ছায়ায় গড়া অপরূপ যাঁর জীবন-চিত্র? স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের সেই উদ্ধত তারুণ্য—যিনি থিয়েটারে সামান্য চাকরি করতেন, মঞ্চের দাবিতে নাটক লিখতেন, আর মধ্যে মধ্যে 'সীটনে'র মতো দু-এক লাইনের ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করতেন? প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েই যে শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণ নিঃশব্দে সরে গিয়েছিলেন পাদপ্রদীপের সীমা থেকে, অপেক্ষা করে ছিলেন একটি প্রশান্ত মৃত্যুর জন্যে, তিনি কি সত্যিই বাস্তব? একগুচ্ছ আশ্চর্য সনেটে যিনি হৃদয়ের অন্তরঙ্গ উত্তাপ ভবিষ্যতের পাঠকগোষ্ঠীর জন্যে রেখে গেলেন, তিনি কি সত্যিকারের কোনো ঐতিহাসিক সত্তা?

মহাকবি মাত্রেই বিশ্বাত্মা—সমস্ত দেশ, সমগ্র কালের তিনি প্রতিভূ। পৃথিবীর যেখানে যা কিছু মনীষী, যা কিছু জীবনসত্য, যা কিছু বিস্ময়—সব তিনি সংহরণ করেন নিজের ভেতর। এই বিশ্বাত্মাকে বলা যায় সূর্যপ্রতিম। সূর্য যেমন পৃথিবীর প্রতিটি ছোট-বড়ো জলাধার থেকে—যা দেশকালের তটে আবদ্ধ, যা সমুদ্রের মতো বন্য আর লবণাক্ত, তাদের সকলের কাছ থেকে জলকণা সঞ্চয় করে নীল নিবিড় মেঘের সম্ভার সাজায়, তারপর উদারতম বর্ষণে তৃণাঙ্কুর থেকে বনস্পতিকে পর্যন্ত নতুন জীবন-রসে ভরিয়ে দেয়, মহাকবিও তা-ই করেন। আকাশের মেঘে একসঙ্গে মিশে থাকে ভারত-সমুদ্রের জল আর বাংলার পদ্মদীঘির অর্ঘ্য, মহৎ প্রতিভায় এই বিশ্ববিন্দু সম্মেলন।

তাই বারে বারে যাঁরা শেক্‌স্‌পীআরের উৎস-সন্ধানে ছুটেছেন, তাঁরা পরম বিস্ময়ে দেখেছেন, কী নেই তাঁর সাহিত্যে, কে নেই? ব্রান্দেল্লো-বোক্কাচিয়ো-চসার-হলিনশেডের এক অফুরন্ত তালিকা সেখানে; স্কটল্যান্ড থেকে ডেনমার্ক, ট্রয় থেকে এথেন্স, ভেনিস থেকে মিশর। রূপকথার জগতে এরিয়েলের স্বপ্ন-সঙ্গীত, দেশদ্রোহী কোরিওলেনাসের অন্তর্যন্ত্রণা, তৃতীয় রিচার্ডের বীভৎস জীবন-কথা, ম্যাকবেথের প্রেতলোক, অষ্টম হেন্‌রির তমিস্রা-কাহিনী, ক্লিয়োপাত্রার চোখের তারায় নীলনদে মার্ক অ্যান্টনির ভরাডুবি!

এই যাঁর সৃষ্টি, তাঁকে না-ই বা বাঁধা হল ব্যক্তির সীমায়, তিনি না-ই বা হলেন কোনো দেশ বা জাতির প্রতিনিধি। জার্মানরা বলে, 'শেক্‌স্‌পীআর ইংল্যান্ডের কে? ইংরেজরা তো ভুলেই গিয়েছিল, আমরাই তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি—তিনি আমাদের।' ফরাসী বলবে, 'ওই মেঘের বর্ষণেই যে আমাদের রাসিন-কর্নেট পুষ্পিত হয়েছে, আমাদের দাবি কিসে কম?' আমরাও কি চুপ করে থাকব? বলব, 'বাঙ্গালীর কাব্যে, নাটকে আর সাহিত্যচিন্তায় শেক্‌স্‌পীআর চিরদিন প্রাণবীজ হয়ে বিরাজ করছেন, তিনি আমাদেরই।'

www.pathagar.com

পৃথিবীবিখ্যাত লেখক তাঁর নির্বাসিত জীবনের দিনগুলো শেক্‌স্‌পীআর পড়েই কাটাতে চেয়েছিলেন। জানতেন—আইনের দণ্ড তাঁর বাইরের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খণ্ডিত করতে পারে, কিন্তু উইল তাঁকে যে বিশ্বপ্রাণের জগতে মুক্তি দিয়েছে—সেখানে তাঁকে বন্দী করবার শক্তি কারো নেই; তাই সমুদ্রতীরের সেই নির্জন শিলাখণ্ডে মহাসাগর আর শেক্‌স্‌পীআর তাঁকে অনন্তের সন্ধান দিয়েছে। যেদিন ব্যক্তিজীবনের শূন্যতা আর হতাশার ভেতরে চার্লস ল্যাম্‌ কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছেন না, দিদি মেরীর অসুস্থ উন্মাদ মনের বোঝা তাঁর পক্ষে আরও দুর্ভর হয়ে উঠেছে, সেদিন ভাইবোনে মিলে শেক্‌স্‌পীআরের গল্পই নতুন করে লিখেছিলেন। চার্লস আর মেরী ল্যামের জীবনে ওইটুকুই অবারিত আকাশের আনন্দ—আর ইংরেজি সাহিত্যে এক চিরন্তন সংযোজন।

এই তো শেক্‌স্‌পীআর।

কী হবে ব্যক্তিমানুষটার বৃত্তপরিচয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে? তিনি কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন, কতটা ছিলেন; তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কতদূর, তাঁর পক্ষে এ-সব দার্শনিক চিন্তা সম্ভব কিনা, কতটা তাঁর স্বরচিত আর কতখানিই বা আহৃত, এ-সব প্রশ্ন আজ সম্পূর্ণই অবান্তর। তিনি সারা পৃথিবীর অন্তর্লোক থেকে উদ্ভাসিত, আকাশের সব আলো তাঁকে রাঙিয়ে দিয়েছে, দূর মেরু-নক্ষত্র থেকে বাংলাদেশের মধ্যরাতের তারায় প্রসারিত তাঁর ধ্যান, সপ্তসমুদ্রের বাতাসে তাঁর অভিষেক, আর—সমস্ত মন ও মনীষার উপকরণে রচিত তাঁর শিল্পলোক। তিনি বিশ্বাত্মা।

মনে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা।

উত্তরপূর্ব ইউরোপের কোনো শহর। লন্ডন নয়—বলাই বাহুল্য।

সেখানে তখন প্রতিদিন চলছে এয়ার রেড—কামানের গোলা এসে ফেটে পড়ছে—শহর অবরুদ্ধ। খাদ্য নেই, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আশ্রয় সংকুচিত, যোগাযোগ বন্ধ, ভবিষ্যৎ নিষ্ঠুর এবং বিবর্ণ। তার মধ্যে তুষার ঝরছে অবিশ্রান্ত—রক্ত, মৃত্যু, ক্ষুধা আর শীতের এক অবাস্তব ইনফার্নো।

তবু তারই ভেতরে একটি ছোট সভার আয়োজন। শেক্‌স্‌পীআরের জন্ম-জয়ন্তী। মহামৃত্যুর এই সমারোহের মাঝখানেও মানুষ মহাজীবনকে ভুলতে পারেনি।

এই তো উইলিঅম শেক্‌স্‌পীআর।

২/৫/১৯৬৪

১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীআরের চার শতাব্দী জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই নিবন্ধটি লিখিত।

একজন ভাবী ভারতীয়

অজয় সেন বলেছিলেন, 'যাচ্ছেন ওখানে, আমার ছেলেটার একটু খবর নেবেন তো! অনেকদিন চিঠি-ফিটি দেয় না!

www.pathagar.com

অজয় সেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন, ছবি আঁকতে পারেন, বাসন্তী রঙের চাদর ব্যবহার করেন। ভদ্র, প্রিয়ভাষী—এককথায় চমৎকার একজন অ্যাকমপ্লিশড্ বাঙালী ভদ্রলোক।

কিন্তু অজয় সেনের গুণকীর্তন আমার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর উত্তরাধিকার শ্রীমান সুজয়ই এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের লক্ষ্য।

বলেছিলুম, 'নিজে শান্তিনিকেতনের ছাত্র হয়ে ছেলেকে—'

'আমি শান্তিনিকেতনেই দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সবাই বললেন, ওখানে আইডিয়ালিজম থাকতে পারে, কিন্তু ইউটিলিটি নেই। এ যুগে দাঁড়াতে গেলে ও-সব ঢিলে-ঢালা ব্যাপার চলবে না—আরো স্মার্ট আরো ইউজফুল হওয়া দরকার। স্ত্রীও দেখলুম সেই দলে। অগত্যা—'

নিশ্চয় অগত্যা, বিশেষ করে গৃহিণীর সঙ্গেই যখন গৃহে বাস করতে হয়।

সুজয় সেন যেখানে বিদ্যা লাভ করেছে, সেটি কলকাতা থেকে অনেক দূরে একটি শৈলাবাস। নাম না করাই ভালো। বিদ্যায়তনটির পরিচয়ও একই কারণে উহ্য রাখা যাক।

আমাকে যেতে হয়েছিল ব্যাংকের একটা দরকারি কাজে। বিকেল নাগাদ কাজ মিটলে শ্রীমানের সন্ধানে গেলুম, তাকে পাওয়া গেল না, কোথায় ফুটবল খেলতে গেছে। প্রিন্সিপ্যালকে নামধাম ও হোটেলের ঠিকানা দিয়ে নিবেদন করে এলুম, কাল যেন সুজয় আমার সঙ্গে দেখা করে—জরুরী কথা আছে।

পরদিন বিকেলে হোটেলের বারান্দায় বসে সবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, হঠাৎ—

'মিস্টার রয়, আই সাপোজ?'

চকিত চমকে আমার দুটি ঔপন্যাসিক চরিত্র মনে পড়ল : একটি লর্না ডুন, আর একটি কপালকুণ্ডলা। কপলাকুণ্ডলাই বেশি লাগসই বলে বোধ হল যেন, 'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতটে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে' নয়—পাইনগাছ আর কুয়াশার পটভূমিতে; 'অপূর্ব রমণী মূর্তি' নয়—আশ্চর্য এক তরুণ মূর্তি। গায়ে ব্লেজার, মাথায় স্কুলক্যাপ, পরনে চোঙা ট্রাউজার, পায়ে ছুঁচোলো জুতো।

অনুমান করতে হল, এই সুজয়। কারণ শিশুকালে এটিকে বারকয়েক দেখেছিলুম। বললুম, 'সুজয় না?'

শিস দেবার ভঙ্গিতে ঠোঁটদুটোকে একটু এগিয়ে দিয়ে বললে, 'হোয়াই—অফকোর্স!'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে আমি বিষম খেলুম। বললুম, 'আমি সুনন্দ কাকা। চিনতে পারছ না নাকি?'

'শিয়োর। হ্যাভ ন'ট চেঞ্জড্ এ বিট!'

কৃতার্থ হয়ে বললুম, 'ধন্যবাদ। এসো—বসো।'

শব্দ করে চেয়ার টেনে বসল। চোখানো মুখে 'চুঁ-চুঁ' করে একটা অস্পষ্ট ধ্বনি—কোনো বিলিতি সুরে মগ্ন আছে মনে হল।

www.pathagar.com

'চা খাবে?'

'নো-থ্যাঙ্কু। জাস্ট হ্যাভ মাই সিপ।'

খাসা উচ্চারণ, বেড়ে বলার ভঙ্গি। ঠিক 'কিংস ইংলিশ' হয়তো নয়—কিন্তু বালকটি বঙ্গজ না অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, চট করে বোঝা শক্ত। তার সংলাপের পনেরো আনাই ইংরেজি, কিন্তু যেহেতু আমি বাংলায় লিখছি সেইজন্যে আমাকে তা অনুবাদ করে দিতে হচ্ছে।

কিংবা তারও দরকার নেই। একটু বেছে-টেছে সারমর্ম বিন্যাস করা যাক।

'বাপকে চিঠি লেখো না কেন?'

'সময় পাই না একদম।'

'ওহো, এত ব্যস্ত! চিঠি লেখার সময় পাও না?'

'কী করে সম্ভব—ভারী পড়াশুনো। তা ছাড়া স্কুলের সামাজিক অনুষ্ঠানে হ্যামলেটের নির্বাচিত অংশ অভিনয় হবে।'

তাতে তাকেই হ্যামলেট খেলতে হবে; আমার তা জানা উচিত।

এবং, আমি তা জানলুম। হঠাৎ শান্তিনিকেতনের ছাত্র অজয় সেনের কথা মনে পড়ল। জানতে চাইলুম, রবীন্দ্রনাথ পড়ে কিনা।

'টাগোর? সেই বেচারা? টীচার বলেন, ইংরেজি রোমান্তিকদের একজন অনুকারী। পুহ্-পুহ্!'

শুনে রোমাঞ্চ হল। পনেরো-ষোলো বছরেই এই! উদিত হলে যে বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে যাবে!

সভয়ে প্রশ্ন করলুম, কলকাতায় যাও-টাও না?

'কলকাতা? কী নোংরা! ছেঁড়া কম্বল, ভিখারী আর পান-চিবুনো বাবু! ভয়ঙ্কর! তবু কখনো কখনো যেতে হয়, কারণ মাই পপ্‌ ইজ দেয়ার অ্যান্ড মাই ডার্লিং মম্‌—ইউ নো।'

পপ্‌ হচ্ছেন পিতা, মম্‌ হলেন জননী। যা হোক, তবু এঁদের কল্যাণেই কলকাতায় জুতোর ধুলো পড়ে!

বাইরের বই-টই কি পড়া হয়? উত্তরে যাকে বলে, একটু "রাঙা হল"। ভরসা দিয়ে বললুম, 'আরে প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে—তুমি তো বোধ হয় ষোলো ধরো-ধরো। বলেই ফেলো, লজ্জা কী!'

'রয়ার' (মানে ফরাসী লেখক বইয়ের) পছন্দ করে।

'লোলিটা?'

'হ্যাঁ, তার মধ্য দিয়েও যাওয়া হয়েছে।'

'ভালো, ভালো, খুব খুশি হলুম। তা ভবিষ্যতে কী হতে চাও?'

ফরেন সার্ভিসে যেতে চায়। দূতাবাসের চাকরি-টাকরিই পছন্দ।

'এখানে ভালো কাজ—ধরো জুডিশিয়াল লাইনে?'

'ও হো—না-না। আদালত, উকিল, পান-চিবুনো অলস ভারতীয় কেরানী—ওহ্—ভয়ঙ্কর!'

www.pathagar.com

'তাহলে বিদেশেই যেতে চাও?'

'অবশ্য। কেন নয়? এই গ্যান্ডির ভারত নেহ্রুর হিন্দ—বাইরে তার সম্মান রাখতে হবে না?'

তাদের ওপরেই তো দেশের আন্তর্জাতিক সুনাম রক্ষার ভার। তারাই যদি বাইরে না যায়, ভারতীয় আদর্শ, তার গৌরব—এসব কে প্রচার করবে?

'ঠিক ঠিক।'

কবজির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, বলল, 'ওহো, আমি বিলম্বিত। এক জায়গায় নিযুক্তি আছে। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।'—তড়াক করে উঠে পড়ল : 'শুভ সন্ধ্যা—কাকা!'

'বাপকে একটা চিঠি—'

'দেব, যদি সময় পাই। আমাকে হ্যামলেট খেলতে হবে, তার মহড়া আছে—আপনি জানেন!'

ট্রাউজারের দুই পকেট দু-হাতে টেনে বিলিতি ফিল্মের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল।

সকলের কথা বলছি না, ওর স্কুলের সব ছাত্রই হয়তো এতটা উন্নতি করেনি। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতীয়—গ্যান্ডি অর্থাৎ গান্ধীজীর এই একটি মানস-সন্তানের নমুনাই যথেষ্ট। সত্যিই তো এরাই দেশে দেশে, দিকে দিকে ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির জয়ধ্বজা বয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আমারই দুর্বুদ্ধি। কিছুতেই ভুলতে পারছি না—অজয় সেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র।

পুনশ্চ : ওপরের বিবরণটিকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক মনে করলেও ক্ষতি নেই।

২৯/৮/১৯৬৪

বিশ্ববিদ্যালয় ও আধুনিক সাহিত্য

কিছুদিন ধরে একটি আলোচনা চোখে পড়ছে পত্রিকার পাতায়। তার মূল কথা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং সাময়িক কালের সঙ্গে তার ব্যবধান। চর্যার যুগে যাত্রা শুরু করে এম.এ.-র বাংলা পাঠক্রম ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে থমকে রয়েছে, তারপরেই যেন তার বক্তব্য : 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। দুর্বার রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য *ঠেকানো* যায়নি, কিন্তু সে-ও ইতস্তত অসংলগ্নভাবে। মোটের ওপর বাংলায় এম.এ. পড়া যেন ফসিলচর্চা, জীবন্ত আধুনিকতার প্রাণস্পন্দন সেখানে ধরাই পড়ে না।

কৌতূহলী হয়ে একখণ্ড সিলেবাস সংগ্রহ করলুম। দেখলুম, বিশেষ পত্রগুলোতে আধুনিকতার কিছু কিছু পদধ্বনি বেজেছে। তবু মানতেই হবে—এই পাঠক্রম প্রাচীন এবং রক্ষণশীল। এর অনেক সংশোধন এবং প্রচুর আধুনিকীকরণের প্রয়োজন আছে।

www.pathagar.com

'প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু ঘণ্টাটি বাঁধবার দায়িত্ব কে নেবে?'

অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখলুম, সাহিত্যিক এবং অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর আসমান-জমিন পার্থক্য। একালের কবিরা জীবনানন্দকেও আধুনিক মনে করেন কিনা জানি না, কিন্তু অ্যাকাডেমিক মতে ঈশ্বর গুপ্ত হচ্ছেন আধুনিকতার পুরোধা; সাহিত্য-সমালোচক আধুনিকতম ঔপন্যাসিক হিসাবে যাঁকেই অভিনন্দিত করুন, সিলেবাসের বিচারে শরৎচন্দ্রই আপাতত শেষ কথা।

শুধু বাংলাকেই অবশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে লাভ নেই। একজন ইংরেজির অধ্যাপক আমাকে স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় বললেন, 'বার্নার্ড শ'র পরে ইংরেজি সাহিত্যে পঠিতব্য বিশেষ কিছু লেখা হয়নি।' আর একজনের সঙ্গে জেম্‌স্ জয়েস (তিনিও কি আজ আর আধুনিক?) নিয়ে আলাপ করতে চেয়েছিলুম। তিনি সোজা বললেন, 'ওটা পাগল।'

'বলেন কী! তা হলে ইউলিসিস্'—

'পাগলা গারদের ডাইরি।'

এগুলো হয়তো ব্যক্তিগত মতামতের কথা। অতি-আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত রসোজ্জ্বলবুদ্ধি অনেক অধ্যাপককে দেখেছি, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি অনেকবার। কিন্তু এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্বাচনে অনেকখানি সতর্ক পদক্ষেপ দরকার। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবার জন্যে প্রধানত সেইসব পাঠ্যবস্তুই বেছে নেওয়া উচিত, যাদের মূল্য-তাৎপর্য মোটের ওপর নির্ধারিত হয়ে গেছে; মতভেদের অবকাশ নিশ্চয় থাকতে পারে, কিন্তু মৌলিক মনোভেদের সম্ভাবনা যেখানে ন্যূনতম। না হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

জিনিসটা একটু স্পষ্ট করা যাক। একথা নিশ্চয় মানবেন যে, বর্তমানের কোনো লেখকই সমকালীন সব সমালোচকের কাছে একই মূল্যে স্বীকৃত নন; একজন যাঁকে মহৎ প্রতিভার দীপ্ত শিখা বলে মনে করেন আর একজন তাঁকে গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নন। সাহিত্যের পাঠকেরা জানেন, হেনরিক ইবসেনের অভ্যুদয়ে ইংল্যান্ডের একদল সমালোচক যখন তাঁকে প্রবল সংবর্ধনা জানাচ্ছিলেন, তখন আর একদল 'ইনসম্‌নিয়া'র সাদৃশ্যে আর একটি নতুন শব্দ তৈরি করেছিলেন—'ইব্‌সম্‌নিয়া'। আসলে সব বড়ো লেখকের জন্যেই একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে—সেটি 'পস্টারিটি'। আর সংস্কৃত কবিদের মতো লেখকেরও প্রধান সান্ত্বনা হল—'যেহেতু কাল নিরবধি এবং পৃথিবী বিপুল—অতএব আশা করা যাক, ভবিষ্যতে আমার সমানধর্মা কেউ নিশ্চয়ই আবির্ভূত হবেন।'

এ ক্ষেত্রে একজন অতি-সাম্প্রতিক কবিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলে কী দাঁড়াবে? স্টাফ-রুমে দুই অধ্যাপক হয়তো তাঁকে নিয়ে হাতাহাতি করবেন, নানা পণ্ডিতের নানা কূট-কচালে মাঝখান থেকে ছেলেমেয়েরা অথই সমুদ্রে পড়বে। মতের সঙ্গে না মিললে ক্রুদ্ধ পরীক্ষক পরীক্ষার খাতায় তাদের কী দেবেন, তা অনুমান না করাই ভালো। এইজন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়কে কালের কষ্টিপাথরের ওপর অনেকখানি

www.pathagar.com

নির্ভর করতে হয়। যার মূল্য সাধারণভাবে নির্ণীত হয়ে গেছে, যে সাহিত্যিকের শক্তি এবং সীমাকে মোটামুটি একটা বৃত্তের মধ্যে ধরা যায়—প্রধানত সেই সাহিত্য ও সাহিত্যিককে পঠনীয় রূপে নির্বাচন করলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সেইসব জীবিত লেখককেই অ্যাকাডেমিক আলোচনার সিদ্ধান্তের মধ্যে আনা চলে—যাঁর সম্পর্কে নতুনতর বিস্ময়ের আর অবকাশ নেই।

নইলে, 'শেষ কথা কে বলবে?' যাঁর সাহিত্যের সমাপ্তি এখনো সুদূর—ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাঁর সম্পর্কে সুনিশ্চিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরবার দাবি কার আছে? আজকের মহারথী কালকের সমালোচনার পাদটীকাতেও জায়গা পাবেন কিনা, কে জানে! এ তো পত্র-পত্রিকার সমালোচনা নয়—এমনিতেই ছেলেমেয়েদের দুঃখের অবধি নেই, জ্ঞানপাপী রূপে তাদের আরো বিভ্রান্ত করবার দুষ্কার্য ক'জন করতে চাইবেন?

তা ছাড়া আরো প্র্যাক্‌টিক্যাল বিপদ আছে। আমার বন্ধু একজন অধ্যাপকের অভিজ্ঞতা শুনুন। তিনি একজন জীবিত কবির পাঠক্রমভুক্ত কাব্য নিয়ে পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, 'এই কবিতাটিতে টেনিসনের অমুক কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।' কিছুদিন পরে অন্য প্রয়োজনে তিনি কবির সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে দেখেই প্রবীণ কবি ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো সিংহনাদ করে উঠলেন :

'কি হে, তুমি নাকি আজকাল খুব খলিফা হয়ে গেছ?'

অধ্যাপক চমকে গেলেন—নিজের মধ্যে কোনো খলিফাত্ব তিনি খুঁজে পেলেন না।

কবি সগর্জনে বললেন, 'তুমি নাকি ক্লাসে বলেছ, আমি চোর?'

'আজ্ঞে, সে কী কথা!'

'আমি নাকি টেনিসন-সুইনবর্ন থেকে চুরি করে কবিতা লিখি?'

এতক্ষণে অধ্যাপক থই পেলেন। কাতর হয়ে বলতে চেষ্টা করলেন, তিনি প্রভাবের কথাই বলেছিলেন এবং সেদিক থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও—

রুদ্রস্বরে কবি বললেন, 'কোনো কথা শুনতে চাই না—গেট আউট, এক্ষুনি বেরোও আমার বাড়ি থেকে।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে অধ্যাপক পালালেন। আর মিনিট-খানেক অপেক্ষা করলে বোধ হয় ঠ্যাঙানি খেতে হত।

সিলেবাস আধুনিক করুন, আপত্তি নেই; কিন্তু সেইসঙ্গে অধ্যাপকদের জন্যে দেহরক্ষীর ব্যবস্থাও করুন দয়া করে। কবি-কথাসাহিত্যিকেরা হয়তো সব সময়েই অরাতি-দমনে বেরুবেন না, ব্যক্তিগতভাবে সবাই হয়তো মারমুখী নন। কিন্তু তাঁদের অনুরাগী ভক্তেরা? এবং সেই ভক্তবৃন্দের মধ্যে যদি কিছু জিমন্যাস্টিক ক্লাবের সদস্য থাকেন—তা হলে?

তীর্থের দেবতা ঠুঁটো জগন্নাথ হতে পারেন; কিন্তু তাঁর পাণ্ডাদের সম্পর্কে আপনার কোনো সংশয় আছে কি? থাকলে একবার কাশীর ঘাটে গিয়ে তাঁদের ডনবৈঠক দেখে আসবেন।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিকতার দ্বার সানন্দেই খুলে দেবেন। কিন্তু তার আগে কিছু বেপরোয়া এবং শহীদত্বপ্রার্থী অধ্যাপক বুক ঠুকে এগিয়ে আসুন।

৫/৯/১৯৬৪

আংরেজি হটাও

আমার পলিটিশন্ মামা এসে বললেন, 'তুই অ্যান্টি-হিন্দী প্রচার চালাচ্ছিস?'

বললুম, 'হিন্দীর বিরুদ্ধে কেন আমি প্রচার করতে যাব? জোর করে এখন ভাষাটা অনিচ্ছুকদের ঘাড়ে না-চাপানোই ভালো, শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছিলুম। আমাদের সমস্যা অনেক, ফুড-ক্রাইসিস্, এডুকেশন্যাল প্রবলেম, ব্ল্যাক মানি—অজস্র ঝামেলা। সেগুলো না মিটিয়ে কোনো বাড়তি উৎপাত টেনে না আনাই উচিত—এইটেই আমার বক্তব্য ছিল।'

'তাহলে অনন্তকাল ধরে ইংরেজি চলবে? একটা সর্বভারতীয় ভাষা গড়ে উঠবে না?'

'উঠুক না ধীরে-সুস্থে। ক্ষতি তো হচ্ছে না। এর ভেতরে হিন্দী আরো সমৃদ্ধ হোক, অপরিহার্য হয়ে উঠুক, ভারতবর্ষের কাছে তখন—'

মামা চটে বললেন, 'ও-সব কিছু শুনতে চাই না। এ হল আজও মনে মনে ইংরেজের দাসত্ব, স্লেভ মেন্টালিটি। সোজা কথা হচ্ছে, এখন নয়া জামানা, নয়া ভারত, 'আংগ্রেজী হটাও'।

হিন্দী বুকুনিগুলো চমৎকার শোনাচ্ছিল মামার মুখে। কিন্তু হঠাৎ একটু কূট প্রশ্ন মনে এল আমার।

'মামা, টুটুল এখন কোথায় যেন পড়ছে?'

মামার নন্দন টুটুল কোথায় পড়ছে সে আমি জানতুম। কলকাতার কোনো অতি-অভিজাত ইংরেজি স্কুলে। মামা একটু থতমত খেলেন।

আমি আবার বললুম, 'ওরা বুঝি হিন্দীর মিডিয়ামে পড়াচ্ছে আজকাল?'

মামা ঘড়ির দিকে তাকালেন, 'ইস সাড়ে ছ'টা বাজে। এক্ষুনি জরুরী মিটিং আছে একটা—আচ্ছা, আসি।'

আমাদের পাড়া কাঁপিয়ে তাঁর ভারী মোটরটা বেরিয়ে গেল।

মামা ব্যবসা করেন, রাজনীতিও করেন। তাঁর পয়সা আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, খুব সম্ভব অফিসে ইঙ্গ-ভারতীয় সহকারিণীও আছে। তাঁর ছেলে যে স্কুলে পড়ে, মধ্যবিত্ত বাঙালী তার ত্রিসীমানায় যাওয়ার কথাও ভাবতে পারে না। সুতরাং তিনিই অবলীলাক্রমে বলতে পারেন : 'আংগ্রেজী হটাও'।

রসিকতাটা জমেছে চমৎকার।

পয়সা থাকলেই ইংরেজি স্কুল, ইংল্যান্ডে পাঠাতেও বাধা নেই, ডলারের বাধা ওঁদের অনতিক্রম্য নয়। ছেলেমেয়েরা কে কতটা মাতৃভাষা ভুলতে পেরেছে, তারই

www.pathagar.com

ওপরে ওদের আত্মশ্লাঘা। ব্রেকফাস্ট টেবিলে পরিজ না হলেও ওরা তুলকালাম কাণ্ড বাধান, ইংরেজি গোয়েন্দা উপন্যাসই ওদের একমাত্র পাঠ্য, অথচ ওরাই দরাজ গলায় শোর তুলছেন: আংগ্রেজী হটাও।

মনোগত অভিলাষটা যেন এই রকম : আমরা তো নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছি; এখন তোমরা যদু মধু হিন্দী-মিন্দী যা খুশি শেখো এবং চুলোয় যাও।

হিন্দী প্রবর্তনে উদ্যোগী সরকার কি একটা পরিসংখ্যান নেবেন? বিশেষ করে হিন্দী-ভাষীদের সম্পর্কে? প্রাক্-স্বাধীনতার পরে তাঁদের সন্তানেরা কী পরিমাণে ইংরেজির মাধ্যমে লেখাপড়া করত আর এখনই বা অবস্থাটা কী?

মধ্যে মধ্যে আমার সন্দেহ হয়, এ যেন একধরনের চক্রান্ত। এতদিন টাকার পুঁজি জমিয়ে যাদের মন ওঠেনি, এবার লেখাপড়াটাকেও তারা একচেটে কারবারের মধ্যে টেনে আনতে চায়। আমার মেয়ে মাসিক তিনশো টাকা খরচের ইংরেজি স্কুলে পড়ুক, আমার ছেলে-ভাইপো যাক ইটনে হ্যারোতে, আর তোমরা দুনিয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়ে চমৎকারভাবে পিছু হটতে থাকো। এ বিদ্যার পুঁজিবাদ, সাধারণের জন্যে অশিক্ষা-কুশিক্ষার ভেজালের ঢালাও ফতোয়া!

আংগ্রেজী হটাও। কেন হটাও? দাস মনোভাব? একদিন রোমানরা ব্রিটেন জয় করেছিল বলেই কি ইংরেজ ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে লাতিনকে? এসব অপবুদ্ধি আত্মহত্যার পথ। ইংরেজি শুধু আমাদের দাসত্বই দিয়েছিল? তার দক্ষিণ পাণিতে প্রসারিত করেনি আমাদের রেন্যাসাঁস—আমাদের ন্যাশনালিজ্‌ম?

বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার কথাও ছেড়েই দিচ্ছি। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হোক, উর্দু হোক, তামিল হোক, অসমীয়া হোক, এমনকি এসপেরান্টো হোক—দেশের মানুষ যদি তাতে সায় দেয়, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু যে-কোনো অপর সমৃদ্ধ ভাষার সঙ্গে সংযোগের অর্থই হল, চিন্তা, জ্ঞান, মনঃপ্রকর্ষ আর আন্তর্জাতিকতার এক দিগন্ত মুক্তি। পৃথিবীর সব দেশ তো জানে। ইংরেজি আলোচনা বই পড়তে পড়তে দেখি গ্রীক-লাতিন-জার্মান-ফরাসীর অবাধ উদ্ধৃতি—কিন্তু আজকাল কৃচিৎ সেগুলোর ইঙ্গানুবাদ চোখে পড়ে। কারণ লেখকেরা জানেন, এ-যুগের যে-কোনো শিক্ষিত পাঠকই (তাঁদের বিচারে) অন্যান্য কিছু কিছু প্রধান ভাষার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। এলিয়ট অবাধে অননূদিত সংস্কৃত পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেন, মালার্মের 'Donner un sens puls pur aux mots delu Tribu'-র মতো লাইনের ইংরেজি অনুবাদের কোনো সার্থকতা আছে, ইংরেজ আজ আর এ-কথা ভাবতে পারেন না।

বহুভাষার পারদর্শিতা, কিংবা অ্যাকাডেমিক বিদ্যাবত্তার কথা আমি বলছি না। কিন্তু পরিচিত, অভ্যস্ত ইংরেজিকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই বাঁচবার প্রয়োজনে! প্রচুর অনুবাদ করে আমরা দেশ (দক্ষিণভারতীয় ভাষাও কম সুদূর নয়!) এবং বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যকে কাছে আনব? সে কাজ কারা করবে? এবং কত যুগ-যুগান্তর পার হয়ে যাবে তাতে? ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসায় কিছু মূল্যবান বিদেশী বইয়ের খবর নিয়েছিলুম—ইংরেজিতেও তাদের অনুবাদ পাইনি, অথচ ভাষান্তরে

www.pathagar.com

ইংরেজি অতুলন। আজ যদি আমরা ইংরেজিও ভুলি, তাহলে আমাদের আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় ভাষায় বিশ্বচিন্তার ভাণ্ডার থেকে মাত্র কয়েকটি কণাই কুড়িয়ে আনতে পারব। তাতে খিদে তো মিটবেই না, বরং আত্মিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষার বাড়-বাড়ন্ত হোক, যে ভাষা ইচ্ছে রাষ্ট্রিক মর্যাদা পাক। কিন্তু 'আংগ্রেজি হটাও' শ্লোগান তুলে ইতিহাসের কাঁটা পেছনে ঘোরানো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ইংরেজি যদি না-ই শিখি তা হলেও জার্মান-ফরাসী-রুশ-ইতালিয়ান যে-কোনো ভাষার দ্বার আবশ্যিকভাবেই আমাদের খুলে রাখতে হবে। দম আটকে মরতে হবে তা নইলে।

আমার মামাও কি আর তা জানেন না? কিন্তু সত্য আর পলিটিক্সের সহাবস্থান দুর্লভ। আর মামা একজন পলিটিশান।

১৩/২/১৯৬৫

প্রেস্‌টিজ বনাম মাইনে

অনেক কাল আগে 'পাঞ্চ' পত্রিকা পাশাপাশি দুটি বিজ্ঞাপন তুলে দিয়েছিল। শিক্ষক চাই—পারিশ্রমিক পাঁচ পাউন্ড; কারখানায় কর্মচারী চাই—বেতন পঁচিশ পাউন্ড। বিজ্ঞাপন দুটি উদ্ধৃত করে জুড়ে দিয়েছিল সংক্ষিপ্ত একটি টিপ্পনী : শিক্ষার মতো অপব্যয়ের খাতায়ও আমার পাঁচ পাউন্ড পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আছি—একি কম ঔদার্যের কথা।

ইউরোপের অবস্থা অনেক বদলে গেছে, সন্দেহ নেই। তবু সবটা বদলায়নি। আজও এদেশের শিক্ষা-সংক্রান্ত কাগজপত্রে দেখি, প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষকের দুর্ভিক্ষ। বারো আনা মানুষই ছুটেছে টেক্‌নিক্যাল এবং কমার্শিয়াল লাইনে—শিক্ষকতার জন্যে যে দু-চারজন আসে তাদেরও অধিকাংশ বৃত্তির আকর্ষণে আসে না। আসে অন্যত্র সুবিধে হয় না বলে।

আমাদের দেশে ছবিটা এখনো ঠিক এ-রকম হয়ে ওঠেনি। আজও এখানে অন্যতর জীবিকার পথ এমন উদারভাবে অবারিত নয়। তবু তার পূর্বসূচনা দেখা দিয়েছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের কৃতী ছাত্রকে আজই স্কুল-কলেজ তো দূরে থাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের চৌহদ্দিতেই বেঁধে রাখা দুঃসাধ্য।

অর্থনৈতিক কারণ আছেই, কিন্তু তার চাইতেও বড়ো হয়ে উঠেছে প্রেস্টিজের প্রশ্ন। অধ্যাপককে রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করতে দেখলে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মেজো-সেজো কর্মচারী সহযাত্রীরও নাকের ডগা কুঁচকে ওঠে। 'আপনি প্রফেসর। আই সি'! ইংরেজ আমলে টিকেট থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নেটিভদের ফার্স্ট ক্লাসে চাপবার অপরাধে গলাধাক্কা এবং পদাঘাত লাভ করতে হত, আজকে তা আর ঘটে না; কিন্তু প্রফেসারের সহযাত্রী পাইপ ধরিয়ে স্বগতোক্তির মতো বলতে

www.pathagar.com

থাকেন : 'প্লেনের টিকিট পেলুম না, এ.সি.-তেও নয়, নইলে আজকাল কেউ ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভল করে! থার্ড ক্লাসের সঙ্গে কোনো ডিফারেন্স আছে আর।'

আজ অধ্যাপকেরা মাইনে বাড়াবার জন্যে আন্দোলন করছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের তূণ থেকে বের করেছেন ব্রহ্মাস্ত্র : 'পরীক্ষা বর্জন!' আমি অব্যবসায়ী, কাজটা তাঁরা ভালো করছেন কি মন্দ করছেন, তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। অপ্রীতিটা এই স্তর পর্যন্ত না-পৌঁছলেই শোভন হত; সরকার এবং অধ্যাপকেরা অন্তত ছাত্র আর অভিভাবকদের কথা ভেবেও মোটামুটি একটা রফা করতে পারতেন। ওদিকে শিক্ষক-আন্দোলনের মেঘও ঘনায়মান। আশা করি এখনো সময় যায়নি, শেষ পর্যন্ত দুর্যোগ কেটে যাবে।

আমি অন্য কথা ভাবছি। মাইনে নাহয় বাড়ল, প্রেস্টিজ বাড়বে কি? মাইনের স্কেল দেড় হাজার দু-হাজারের ঘরে পৌঁছুলেই কি অধ্যাপক-শিক্ষক জাতে উঠবেন?

শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, আচার্য মাত্রকেই নমস্য বলে মনে করা—অজ্ঞান-তিমিরান্ধকে যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা চক্ষুষ্মান করেন, সেই গুরুর উদ্দেশ্যে সভক্তি প্রণিপাতের বিনতি—এগুলো আমরা তো বৈদিক যুগ থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু তাহলেও সব শিষ্য যে গুরু কিংবা তাঁর পরিজনের প্রতি সব সময়ে সদাচরণ করেননি, পুরাণের গল্পে তার প্রমাণ আছে। গুরুরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলেই বোধ হয় বারবার করে গুরু-কৃত্যের কথা তাঁদের মনে করিয়ে দিতে হয়েছে, এত করে শোনানো হয়েছে ভক্তিমান শিষ্যদের বিবরণ! তবু ভারতীয় গুরুদের ভাগ্য ভালো, তাঁদের নীরোর মতো শিষ্য জোটেনি নইলে সোক্রাতেসের দশা হত।

তবে একালে আমাদের এই বাংলাদেশেও অ্যাসিড বাল্‌বের ব্যবস্থা আছে, পরীক্ষার হলে অত্যুৎসাহে নকল ধরবার পর পথে বেরিয়ে উত্তম-মধ্যমের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু সেকথা থাক। প্রশ্নটা হল প্রেস্টিজের।

জ্ঞানী আচার্যদের নির্বুদ্ধিতার অনেক সরস কাহিনী প্রাচীনকাল থেকে আমরা শুনে আসছি। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে সেকথা ভুলে তাঁরা আগুনের জন্যে দু-ক্রোশ দূরের শ্মশানে হেঁটে যান; ব্রাহ্মণী এক পলা তেল ঢেলে উথলে-ওঠা ডালের কড়াই সামলে নিয়েছেন দেখে তাঁরা স্ত্রীর দৈবীক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে সর্বাঙ্গে প্রণাম করেন, আকাশের তারা দেখতে গিয়ে তাঁরা কুয়োয় পড়েন এবং সেই ফাঁকে ক্রীতদাস ঈশপ পর্যন্ত তাঁদের সদুপদেশ শুনিয়ে দেন। এমনকি বাঙালী লেখকেরা পর্যন্ত গোবেচারা ভালোমানুষের (সরলার্থে বেকুবের) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'স্কুল-মাস্টার প্রফেসারের মতো চেহারা'; শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে কমলের হাতে ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয়কে বলতে গেলে বাঁদর-নাচ নাচিয়েছেন। ডিকেন্সের মিস্টার মিকোবারকে আপনাদের কেমন লেগেছিল জানি না, আমি তাঁকে খুব পছন্দ করতে পারিনি।

আধুনিক সাহিত্য থেকে গাদা গাদা নজির তুলে মাস্টার-অধ্যাপকদের দুর্গতি দেখাতে পারি, কিন্তু তার আর দরকার নেই। আসল কথা, শিক্ষক-অধ্যাপকেরা চিরদিনই ফাঁকা প্রণাম, প্রায় খালি পেট (অবশ্য যাঁরা নোটবই লেখেন বা অবসর

www.pathagar.com

সময়ে ঝোলাগুড়ের তেজী-মন্দী নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের বাদ দিচ্ছি) এবং উপেক্ষা আর অনুকম্পা নিয়ে কাল কাটিয়ে আসছেন। তাঁরা হলেন বিদ্যার ভারবাহী একটি জন্তু—কী জন্তু, সেটা জানা যায় বিদ্যাদানের তেরো বছর পার হলে পর।

অতএব মাইনে নয় বাড়ল, খালি পেটও নাহয় ভরল, কিন্তু 'স্টিগ্‌মা'টা যাবে তো?

আন্দোলনকারী অধ্যাপকদের কাছে আমার একটি সরল প্রস্তাব আছে। যদি কৌলীন্য পেতে হয়, মাইনে বাড়ানোতে কুলোবে না। নাম-টামগুলোই একেবারে বদলে ফেলতে হবে। বাংলা পরিভাষাগুলো এখনো আমার ভালো করে রপ্ত হয়নি, তাই ইংরেজিতেই কিছু আভাস দেওয়া যাক। স্কুলের শিক্ষকদের 'জুনিয়ার অ্যাকাডেমিক অফিসার' বললে কেমন হয়? কলেজের মাস্টারেরা যদি 'সিনিয়ার' হন? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদি 'স্পেশাল অফিসারস্' হন—এই গোছের গোটা কয়েক ভারী ভারী শব্দে নামাঙ্কিত হতে পারেন? তা হলে?

হাওয়াই বদলে যাবে তাহলে। অফিসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতে উঠবেন। চিরকালের কলঙ্ক কেটে যাবে, সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যাবে, বাড়িতে চাকরির জন্যে উমেদারের যাওয়া-আসা শুরু হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, শিক্ষক-গৃহিণী কিংবা শিক্ষিকার স্বামীর পর্যন্ত পাড়ায় খাতির বেড়ে যাবে।

যতদূর জানি, অধ্যাপকেরা মাইনের চাইতেও প্রেস্টিজকে বেশি মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন। তা-ই যদি, তাহলে তাঁরা আগে 'অফিসার' হওয়ার জন্যেই আন্দোলন করুন, মাইনের কথা পরে ভাবলেও চলবে।

২০/২/১৯৬৫

রাজকীয়

হিন্দীর নয়া জমানায় গেজেট অব ইন্ডিয়ার নাম হয়েছে 'ভারত কা রাজপত্র'। সরকারি পত্রিকার অকস্মাৎ এক রাজকীয় গৌরবপ্রাপ্তিতে ভারতীয় গণতন্ত্রের কোনো কোনো নাগরিক দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, একজন কলকাতা হাইকোর্টে এর বৈধতা পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর আবেদন ধোপে টেকেনি, কারণ বিচারপতি বলেছেন, 'রাজ' শব্দ এখন নানার্থক, তার ব্যঞ্জনা ব্যাপকতর অতএব 'রাজপত্র' অর্থে রয়্যাল গেজেট—এমন সিদ্ধান্ত করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

খুব ভালো কথা।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন কতকগুলো ভূত আছে যেগুলোকে ঘাড় থেকে নামানো শক্ত। 'রাজা' হচ্ছে এদেরই একটি। 'শেষ পুরোহিতের অন্ত্র ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে শেষ রাজার শ্বাসরোধ করতে হবে'—ফরাসী বিপ্লবের এই ঘৃণা শেষ পুষ্পাঞ্জলি হয়ে ঝরে পড়ল নাপলেয়র পাদপীঠে। আজও ব্রিটিশ ডেমোক্র্যাসি হ্যানোভার বংশের সামনে ভক্তিতে নতশির, সুইডেন জাপান এখনো রাজতন্ত্রের ছায়ায় সুখাশ্রিত। রাজাকে তাড়িয়ে গণতন্ত্র

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করেও শান্তি নেই, থেকে থেকে একজন প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী রাজকীয় হয়ে উঠতে চাইছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়ন, হত্যাকাণ্ড, 'কুদেতা'র তাণ্ডব!

আসলে আভিজাত্য বস্তুটার ওপর বাইরে আমাদের যতই বিতৃষ্ণা থাকুক, মনে মনে ওটির সম্পর্কে একটা গোপননিহিত দুর্বলতা আছেই। আমরা প্রত্যেকেই অন্যের চাইতে বিশিষ্ট হতে চাই আর এই বিশিষ্টতা যত বাড়ে, আত্মপ্রসাদের পরিমাণটাও বাড়তে থাকে সেইসঙ্গেই। ব্রাহ্মণতন্ত্রকে তারস্বরে গালাগাল দিতে পারি কিন্তু উপবীত নিতে পারলে নেহাৎ মন্দ লাগে না; হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরে জাতিভেদের যে উগ্রতম নিদর্শন আমি দেখেছি, সমাজের ওপরতলার মানুষেরা তা কল্পনা করতে পারবে না।

আর এই 'আভিজাত্যে'র চরম হচ্ছে 'রাজা'! শব্দটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই যে যাত্রার দলের রাজাকে মনে পড়ে, তা নয় (যদিও ছেলেবেলায় জরি ভেলভেটের পোশাক পরা, কোমরে টিনের তলোয়ার ঝোলানো ওই মূর্তিটির দিকে চেয়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতুম)। 'রাজা' কথাটার সঙ্গে ঐশ্বর্য, প্রতাপ মহিমা, শ্বেতপাথরের সাতমহলা প্রাসাদ, নানা লৌকিক অলৌকিক কীর্তিকলাপ আর সেই সঙ্গে রূপকথার রাজকন্যার এক অপূর্ব রোমান্টিক অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। রাজতন্ত্র ইতিহাসের একটা বিলুপ্ত বা ক্রমবিলীয়মান অধ্যায় হতে পারে কিন্তু 'রাজা' চিরকালের রোমান্স।

এই রোমান্সের আকর্ষণেই আজও ছেলের নাম 'রাজকুমার'।

পিতাকে বললুম, 'ছেলের ও-নাম রাখতে গেলেন যে বড়ো?'

তিনি বললেন, 'একটু সেকেলে, না? কিন্তু নামটা আদর করে ওর দাদু দিয়েছিলেন, সেই থেকেই রয়ে গেছে ওটা।'

বললুম, 'তা নয়। আমি বলছিলাম, দেশে তো আর রাজা নেই, খামোকা ছেলেকে রাজপুত্র বানিয়ে আর লাভ কী? তাছাড়া আপনি নিজে তো ডাক্তার। ছেলের নাম ডাক্তারকুমার—না না, বিশ্রী শোনাচ্ছে, বৈদ্যকুমার দিতে পারতেন। অশ্বিনীকুমার দিলেও মন্দ লাগত না।'

ভদ্রলোক কাষ্ঠ-হাসি হাসলেন। বুঝতে পারলুম চটেই গেছেন আমার ওপরে।

প্রিয়জনকে আমরা আদর করে 'রাজা' বলি। বৃহত্তর ভারতে প্রণয়-সম্বোধনে ওটা তো সর্বময়। কিসের রাজা? না—'দিল্‌কে'! আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শোনা গেল না 'মেরে দিল্'কে রাষ্ট্রপতি। কিংবা 'মহব্বতকে রাজ্যপাল'। যদিও পরোক্ষভাবে দুটোর সঙ্গেই রাজার সম্পর্ক আছে, কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি সেটা বুঝতে চাইবে কিনা, তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। এসব সম্ভাষণ যতই প্র্যাকটিক্যাল এবং প্রাণ-কাড়া হোক, ফলে চিরকালের মতো চটাচটির সম্ভাবনা আছে।

ধরুন, বাংলা সাহিত্যের এক মহতী সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে তিনজন মহৎ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, একজন উদ্বোধক, দ্বিতীয়জন সভাপতি এবং তৃতীয়জন প্রধান অতিথি। এঁরা আবার যথাক্রমে কথাসাহিত্যের সম্রাট, কবিতার রাজ-অধিরাজ এবং নাটকের শাহান্‌শা।

www.pathagar.com

মনে করুন, রাজতন্ত্রে অস্থি-মজ্জায় ঘৃণা এমন এক অত্যন্ত রিয়ালিস্ট ব্যক্তি এঁদের পরিচয় দিতে উঠলেন আর শুরু করলেন : 'আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এই মহান সাহিত্যসভায় বাংলাদেশের তিন দিকপালকে আমরা পেয়েছি। একজন হলেন উপন্যাসের রাষ্ট্রপতি, আর একজন কবিতার সর্বহারাতন্ত্রের ডিক্টেটার, তৃতীয়জন বাংলা নাটকের মুখ্যমন্ত্রী'—

তিন মহৎ ব্যক্তি মালা, সন্দেশ, প্রেসরিপোর্ট এবং বক্তৃতাবর্ষণের লোভ ছেড়ে যদি সভা ত্যাগ না-ও করতে পারেন (আর সভা ছেড়ে প্রস্থানটা সবসময়ে সভাপতি-প্রধান অতিথিদের ইচ্ছের ওপরেও নির্ভর করে না, কখনো কখনো প্রহারের ভয়ও থাকে), মনে মনে তাঁরা কেউ যে একবিন্দু খুশি হবেন না, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ব্যাপারটাকে ঠাট্টা এবং তাঁদের প্রতিভার ওপরে কটাক্ষপাত ধরে নিয়ে হাঁড়ির মতো মুখে বসে থাকবেন, আর সংকল্প করবেন, এই অঞ্চলের অর্বাচীনদের কোনো সভায় তাঁরা ভবিষ্যতে আর পদধূলি দেবেন না।

অথচ, সম্রাট, মহারাজ, বাদশা বললে কত সহজেই ব্যাপারটা মিটে যেত!

যাঁরা 'গেজেট'কে 'রাজপত্র' বলে অনুবাদ করেছেন তাঁদের মনের সামনে এই রাজকীয় রোমান্সটিই ছিল।

'গেজেট' মানে কী? ১৯৬৪ সালের চেম্বার্স ডিকশনারি খুলে দেখছি : "An official newspaper containing lists of Government appointments, Legal notices, despatches"—etc. বলা অনাবশ্যক, এর সঙ্গে 'রাজা'র কোনো সম্পর্ক নেই। বরং 'রাষ্ট্রপত্র' বললে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হত।

আসল কথা, 'The king is dead, long live the king!' রাজতন্ত্রের মৃত্যু আছে, 'রাজা' আমাদের মনের যে মোহের কেন্দ্রে বাসা বেঁধেছে, সেখান থেকে কোনোদিন তাকে উপড়ে ফেলা যাবে কিনা সন্দেহ।

ফিল্ম ডিভিশনের কল্যাণে দিল্লীতে উপাধি বিতরণে, আকাদেমি পুরস্কার বিতরণের ছবি দেখি। সেই বিচিত্র রীতি, অদ্ভুত পোশাকপরা ভৃত্যের দল, অপূর্ব আবহাওয়া। আচমকা মনে হয়, দিল্লীর দরবারে ইংল্যান্ডের ভারত-সম্রাট অনুগত নেটিভদের ওপর উপাধির করুণা বর্ষণ করেছেন!

তাহলে 'রাজপত্র' আর কী অপরাধ করল?

১৩/৩/১৯৬৫

জীবনকে আর একটু রমণীয় করতে

হঠাৎ মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এরকম হবার কোনো কথা ছিল না; হয়েছিল সামান্য একটি অসুখ, যা এসময় কলকাতার ঘরে ঘরেই হয়। কিন্তু সামান্যের সেই খোলা বাতায়নটুকু দিয়েই বিরাটের আবির্ভাব ঘটল। একমুহূর্তে জানালার বাইরের অতখানি

www.pathagar.com

আকাশকে সে মুঠোর মধ্যে ছিনিয়ে নিল। আমার হৃৎপিণ্ডে-ফুসফুসে দু'খণ্ড অন্ধকার মেঘ এসে চেপে বসল, মনে হল, কোথাও আর এতটুকু বাতাসও অবশিষ্ট নেই।

আমি মৃত্যুকে দেখলাম।

তারপর কী হল, ভালো করে জানি না। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর, কয়েকটা সন্ত্রস্ত টেলিফোন করবার আওয়াজ, ইন্‌জেক্‌শন, চারদিকের চেপে আসা পাথরের দেওয়াল থেকে একটুখানি বাতাস পাওয়ার জন্যে আমার প্রাণপণ চেষ্টা আর থেকে থেকে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি আমি অকারণে কতকগুলো অসংলগ্ন কথা বলে চলেছি—ডিলিরিয়ম!

ক'দিন ক'রাত কাটল বলতে পারব না! তারপর ধীরে ধীরে আকাশ আলোর পদ্মের পাপড়ি মেলল। আবার পৃথিবীভরা বাতাসের ভেতর আমি ফিরে এলাম। এখনো বিছানা ছাড়বার ক্ষমতা নেই, তবু চারদিকের চলিষ্ণু জীবনের ছন্দ এসে আমাকে স্পর্শ করছে—জানালা দিয়ে মেঘ চলেছে, পাখি চলেছে, বিমান চলেছে; দূরের কয়েকটা পামগাছ লুটোপুটি খাচ্ছে দক্ষিণের হাওয়ায়, মানুষের কোলাহল উঠছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে কী আশ্চর্য এই বেঁচে থাকা, কী অপরূপ এই পৃথিবী।

কবি বলেছেন মরণকে "শ্যাম সমান"—। কবির উপলব্ধি তাঁরই থাক, কিন্তু আমি কোনোদিন মৃত্যুকে বাঞ্ছিত বল্লভ বলে ভাবতে পারব না। আমি দেখেছি কী নিষ্ঠুর তার আবির্ভাব, কী কঠিন তার পেষণ, তার হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে জীবনের কী আকুল আর্তি! একদিন সে আসবেই, তাকে ফেরানো যাবে না, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় কখনো তাকে ডাকব না। মৃত্যু কোনোদিন সুখের নয়, মৃত্যু কখনো মানুষের বান্ধব হতে পারে না।

কিন্তু এই অসুস্থ অবস্থাতে কানের কাছে সমানে চিৎকার শুনছি : 'ভোট দিন—ভোট দিন।' অর্থাৎ কর্পোরেশনের নির্বাচন আসন্ন, এই জার্নাল যখন ছাপা হয়ে বেরুবে, ভোটরঙ্গ তার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। হয়তো নির্বাচিত পৌর-পিতা গলায় ফুলের মালা পরে হাসিমুখে সন্দেশ খাচ্ছে এবং ভোটযুদ্ধের সেনাপতিদের খাওয়াচ্ছেন। মৃত্যুর সিংহদ্বার থেকে ফিরে এসে মনে হচ্ছে, আমাকে আবার এই কাউন্সিলারদের পাল্লায়ই পড়তে হবে এবং জীবনের প্রতি সুনিবিড় নবীন প্রেম সত্ত্বেও বলতে ইচ্ছে করছে : 'এর চেয়ে মৃত্যু ভালো!'

তার মানে, আবার এক পসলা বৃষ্টিতে কলকাতার পথে পথে এক কোমর জল এবং সেই "What Not" পঙ্কিল প্রবাহে পা ডোবানোর অর্থই হল একজিমা! ঘড়িওয়ালা, বাড়িওয়ালা, ছাতাওয়ালা আমাদের স্কন্ধে যেই চাপুক, আমাদের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। কী শুভক্ষণেই এরা ডাস্টবিন বিদায় করেছেন, ফলে এক-একটি রাস্তা দৃশ্যে এবং গন্ধে ছোট ছোট ধাপায় পরিণত হয়েছে। পথে গর্তের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। যদি অনুগ্রহ করে দু'বছরে একবার স্টীমরোলারের আবির্ভাব হয়, তা হলে অবস্থা আরো করুণ! অর্থাৎ, যদি তিনটি গর্ত বন্ধ হল তার বিনিময়ে লাভ হয় দু'হাজার মণ কাঁকর—তারা পথের ওপরে হিমালয় পর্বত রচনা করে বসে থাকে। টেলিফোন কিংবা গ্যাস কোম্পানি একবার যদি রাস্তা খুঁড়ে গেল তা হলে সেই ক্ষতচিহ্ন পথিককে হোঁচট খাওয়াতে এবং

www.pathagar.com

মোটরগাড়ির স্প্রীং ভাঙতে কায়েম হয়ে রইল। কলের জল তেমনি ক্ষীণধারা এবং ইঁদুর, কেঁচো, ব্যাঙ আর সাপের পরিবাহিনী। পৌর-নির্বাচনে যে-কর্তার অদৃষ্টেই শিকে ছিঁড়ুক আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে!

এবারের ঢালাও গণভোটে নির্বাচিত হয়ে যাঁরা কাউন্সিলর হবেন তাঁদের হাতেও আমাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে—এ আশা নেই। তাঁরাও চিৎকার করবেন, গালাগালি করবেন, পরস্পরের উদ্দেশ্যে আস্তিন গোটাবেন, কখনো কখনো মেয়রের চেয়ার নিয়ে টানাটানি করবেন এবং তাতেই ভোটদাতাদের সম্পর্কে কর্তব্য তাঁদের শেষ হয়ে যাবে। সেই ট্রাডিশন চলতে থাকবে সমানে!

আমি ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য একটি কার্যকরী প্রস্তাব দিতে চাইছি। ভবিষ্যতে যাঁরা কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হবেন; তাঁদের ফাঁপা কণ্ঠবাদনে প্রোসেশনের চিৎকারে অথবা প্রচারপত্রের চটকে আমরা আর ভুলব না। এইসব ভদ্রমহোদয়রা হাফপ্যান্ট পরে এবং বালতি হাতে নিয়ে এক একটি করে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনের গর্তে নেমে যাবেন। অন্তত একমাস ধরে তাঁরা নিয়মিতভাবে কাদা তুলবেন এবং প্রতি ওয়ার্ডে যিনি যত বেশি কাদা তুলতে পারবেন, তিনি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন।

এতে দু'দিক থেকে লাভ হবে। প্রথমত, ড্রেনের কাদা তুলতে তুলতে মুখে কাদা ছিটোবার সময় মিলবে না; দ্বিতীয়ত, কলকাতার ড্রেনগুলো সাফ হয়ে যাবে। জীবনকে আর একটু সুসহ করার পক্ষে আশা করি, এ প্রস্তাবে আপনারা সকলেই একমত হবেন।

৩/৪/১৯৬৫

হাউলার

হরধনু কে ভেঙেছিল?

পাড়াগাঁয়ে স্কুলের ছাত্র তার জবাব দিতে পারেনি, বলেছে, 'জানি না।' আর গ্রামের এক প্রধান মাতব্বর তাই শুনে স্কুল-ইন্সপেক্টরকে বলেছেন, 'ও-সব কথা বিশ্বাস করবেন না স্যার, এ গাঁয়ের লোক ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী।'

সম্প্রতি এই ছোট ঘটনাটুকু কাগজের খবর হয়ে উঠেছে। মূর্খতার এই চেহারাটা দেখেও বলা গেল না : 'কী বিচিত্র এই দেশ!' কারণ এইরকম ঘটনা শুধু বাংলাদেশেই নেই, বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে।

বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ইংল্যান্ডের এক স্কুল-ইন্সপেক্টরও ঠিক এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। সাদৃশ্যটা আশ্চর্য রকমের।

গ্রামের স্কুলে যে ক্লাসে বিলিতি লোকটি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, সেখানে পড়ানো হচ্ছিল হ্যামলেট। গোবেচারী ধরনের একটি ছোট ছেলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি জানতে চাইলেন : 'Who Wrote Hamlet?'

www.pathagar.com

থরহরি-কম্পিত গলায় জবাব এল : 'P-P-Please, Sir, it wasn't me?'

পরে গ্রামের 'স্কয়্যার' অর্থাৎ খুদে জমিদারের সঙ্গে ডিনার খেতে বসে ভদ্রলোক সকৌতুকে ব্যাপারটি শোনালেন। শুনে স্কয়্যার হেসেই অস্থির, হাসতে হাসতে তাঁর পেটে ব্যথা ধরে গেল। শেষকালে খানিকটা সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমার মনে হয় আসলে লিখেছে ওই বাচ্চা শয়তানটাই।'

বাঁকুড়া জেলার গ্রামে এই যে ছোট কৌতুক-নাট্যটি ঘটে গেছে, তাই নিয়ে কোনো কোনো গম্ভীরবেদী মানুষ ভারী দুর্ভাবনায় পড়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'দেখ দেখ, কী পরিমাণ মূর্খতা দেশে জড়ো হয়েছে, সেটা দেখ একবার।' কেউ বা মাথা নেড়ে বলেছেন, 'এ হবেই।' জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ না থাকলে, ছেলেবেলায় রামায়ণ মহাভারত না পড়িয়ে আজে-বাজে গাল-গল্প শোনালে এ ট্রাজেডি অনিবার্য। অতএব 'আত্মানং বেত্তি—নিজেকে জানো, স্বদেশকে জানো।'

এগুলো খুবই সিরিয়াস কথা—নিশ্চয়ই আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। দেশের ক্লাসিক্সের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে না আসে স্বদেশবোধ, না আসে সাংস্কৃতিক চেতনা—একটা মানসিক বয়স্কতাই অর্জিত হয় না। কিন্তু তাই বলে 'হরধনু-ভঙ্গে'র ব্যাপারকে অত গুরুতরভাবে না নিলেও চলে। শিক্ষার দৈন্য আমাদের আছেই, সেইজন্যে কলার খোসায় কেউ পিছলে গেলেই আমরা জীবনে পতন অভ্যুদয়ের জটিল তত্ত্ব-চিন্তাকে ডেকে আনি কেন?

'হ্যামলেট'-এর ব্যাপার নিয়ে ইংরেজও গম্ভীর হয়ে ভাবতে পারত : 'মাই গড, এই কি আজ ব্রিটিশ জাতির শিক্ষার অবস্থা? অ্যান্ড পুয়োর উইল শেক্স্পীয়র, কবরের মধ্যে কি আর একবার মৃত্যু হল তোমার?' কিন্তু ইংরেজ তা ভাবেনি। সে জিনিসটার নাম দিয়েছে 'হাউলার'—হাউ-মাউ করে কাঁদেনি, উলটো হা হা করে হেসেছে।

একবার এক দার্শনিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি স্বর্গে যেতে ইচ্ছুক কিনা। উত্তরে তিনি অতিশয় 'ল্যাকোনিক' ভাষায় জবাব দিলেন, 'না—কদাপি নয়।'

'কারণ?'

'কারণ স্বর্গে ছাত্র মিলবে না—সেখানে সবাই পণ্ডিত, সেখানে কেউ ভুল করে না, সুতরাং পড়া জিজ্ঞেস করে সুখ নেই। অতএব—'

অতএব 'থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করে সুধাপান।' অত গম্ভীর নির্ভুল জগৎ আমাদের চলবে না। আমরা নিয়ম ছেড়ে বেনিয়মে চলব, আমরা ভুল করব—বোকামো করব, আমরা নায়ক হতে গিয়ে ম্যালভোলিয়োর মতো সং সাজব, ডন কুইকসোটের মতো মদের মশকে তলোয়ার চালিয়ে রাক্ষস বধ করব—এককথায় প্রতি পদে পদে 'হাউলার' তৈরি করব। সে 'হাউলার' কখনো কখনো একটু বেশি হয়ে যাবে, 'অ্যাপল অব ডিসকর্ড' থেকে হিটলারের ছাঁটা গোঁফ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে—হাসিটা এমন বিরাট মাত্রায় দেখা দেবে যে, ভয়ে হৃৎপিণ্ড থমকে যাবে, হাসতে আর সাহস পাব না। তবু এই ভুল-ভ্রান্তি-অসঙ্গতি-অন্ধতাই তো জীবন, এর বিচিত্রতাই তো জীবন-লীলা। বাইবেল-কথিত আখ্যান যদি সত্যি হয়, তাহলে আদিম মাতাপিতৃকৃত

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাউলার—আজও সেই আনন্দেই আমরা নেচে চলেছি। সেই প্রথম কৌতুক-নাট্যের সবাই কুশীলব।

অত বড়ো কথাও থাক। ভুলই যদি না করব, সাহিত্য আসবে কোন পথ দিয়ে? বেঁচে থাকবার রস কোথায় যদি সবই নীতিশাস্ত্রের নিয়ম মেনে জ্যামিতিক রেখায় নির্ভুল এগিয়ে চলে? ভুলো-মন স্বামী দু'পায়ে দু'রকমের জুতো পরে বেরুতে চেষ্টা না করলে সুগৃহিণীর মনে সুখ কোথায়? সব ছাত্রই যদি নির্ভুলভাবে পড়া করে আসে—যদি বেঞ্চিতে কাউকে দাঁড় করানো না যায়—বেত অনাবশ্যক হয়ে ওঠে—তাহলে মাস্টারির স্বাদই যে ফিকে হয়ে যায়!

তাই জীবনে আমরা নিয়ম ভাঙব, ভুল করব, মূর্খতার পরিচয় দেব। আমাকে দেখে অন্যে হাসবে, অন্যকে দেখে আমি হাসব—এই পারস্পরিক হাস্য বিনিময়ের মধ্য দিয়েই আমরা বেঁচে থাকব। এই হাসিকে সবসময় দন্ত-বিকাশ বলে চেনা যাবে না; কখনো চোখের জলে তা গলে পড়বে, কখনো হাহাকার বিদীর্ণ হবে, কখনো ধূসর নিঃশব্দ বিষাদে তা লীন হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে সবই 'হাউলার'—ভুল শোনা, ভুল বোঝা, ভুল বলা, ভুল করা আর ভুলের ফসলে জীবনের গোলা ভরে ভরে তোলা।

তা হলে আসুন, বাঁকুড়ার সেই অর্বাচীন বালক এবং বিমূঢ় বয়স্ককে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করা যাক। এবং এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক আর একটি বিদেশী 'হাউলার' দিয়ে :

স্কুল-ইন্সপেক্টর বাচ্চাদের ক্লাসে ঢুকে শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করলেন, ছোটদের নানা ধরনের শব্দ চিনতে শেখানো হয়েছে কিনা? শিক্ষিকা জানালেন, হয়েছে।

তখন ইন্সপেক্টর বাচ্চাদের চোখ বন্ধ করতে বলে, চাপা শিস দেওয়ার মতো আওয়াজ করলেন একটা! তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো, এটা কিসের শব্দ?'

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। তারপর একটি ক্ষুদ্রকায় শিশু দাঁড়িয়ে উঠে নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে জানাল : "Please, Sir, you kissed the teacher!"

২৯/৫/১৯৬৫

মহাযাত্রার কথা

'একখানা পা হবে, দাদা?'

কলকাতার ট্রাম-বাসের যাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত একটা পুরনো হিউমার। বাস কিংবা ট্রামে যে নতুন অফিসযাত্রীটি উঠতে চাইছেন, পা-দানিতে তাঁর সর্বাঙ্গের ভর রাখবার দাবিও তিনি জানাচ্ছেন না, শুধু একটি মাত্র পায়ের জায়গা হলেই যথেষ্ট।

'দাদা—একখানা, মাত্র একখানা পা হবে?'

এ-ও একযুগ আগেকার কাহিনী। এমনকি পায়ের ডগাটুকু রাখবার পালাও শেষ। এখন বোধ হয় জিজ্ঞাস্য : 'আপনার ট্রাউজারের বেলটে তিনটে আঙুল হবে, স্যার?' তার মানে তিন আঙুলে সামনের ভদ্রলোকের বেল্টটা একটু ধরতে পারলেই

www.pathagar.com

হবে, বাকী যাত্রাটা শূন্যপথে ঝুলতে ঝুলতে—বাসের পা-দানির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও চলবে।

কলকাতার অফিস-টাইমে ট্রাম-বাস যাত্রা কোনোদিনই সুখের ছিল না, গত সতেরো-আঠারো বছরে অবস্থাটা চরমে পৌঁছেছে। এর মধ্যে রাজ্য পরিবহনের নতুন নতুন একতলা দোতলা বাস এসেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবহনের ব্যবসায় বহু টাকা লোকসান দিয়েছেন, কিন্তু কলকাতার মানুষের বরাত ফেরেনি। তারা আদিতে ঝুলেছে, মধ্যে ঝুলেছে এবং অন্তেও ঝুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ বাধা পড়েছে। একসঙ্গে ছ'জন লোকের প্রাণহানির ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবিষ্কার করেছেন যে ট্রাম-বাসের ফুটবোর্ডে পরিভ্রমণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং তা আইনত দণ্ডনীয়।

নিতান্তই একসঙ্গে ছ'জন তাই ব্যাপারটা খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে। কিন্তু গত চৌদ্দ-পনেরো বছর ধরে বিশেষ করে স্টেটবাস চালু হওয়ার পর আলাদাভাবে কতজনের যাত্রা যে মহাযাত্রায় পরিণত হয়েছে, তার একটা হিসেব পাওয়া যাবে কি? 'স্টেটবাসে অফিসে বেরুবার আগে একটা উইল করা ভালো'—এরকম সদুপদেশও কি আমরা শুনিনি? স্টেটবাসের মারাত্মক হাতল, তার পেটকাটা দরজা, তার চলা এবং থামার বিচিত্র রীতিনীতি—এ থেকে আমরা বুঝে নিয়েছিলুম যে মৃত্যুর ওপর মানুষের হাত নেই আর স্টেটবাসের ওপর ভগবানেরও হাত নেই। এই নির্বেদ নিয়েই আমরা পরম সুখে ছিলুম, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ এমনভাবে তৎপর হয়ে উঠলেন কেন? অ্যাকসিডেন্টটা একেবারে রাজভবনের সামনেই ঘটেছে বলে?

পা-দানিতে না-ঝুললেই যে নাতি-নাতনি বেষ্টিত হয়ে আমরা সত্তর বছর পেরিয়ে বেঁচে থাকব, এমন গ্যারান্টি আমাদের কে দেবে? বাস যে হঠাৎ খোশ-মেজাজে ফুটপাতে চড়তে চাইবে না, ট্রামের ঘাড়ে চড়াও হবে না, ব্রীজ থেকে তলায় ঝাঁপ দেবে না—এসব ভরসা কেউ কি দিতে পারেন? তখন তো ভেতরে বাইরে দুই-ই সমান। বরং ওসব অবস্থায় বাইরে ঝোলাই ভালো, তাতে অন্তত লাফিয়ে পালাবার একটা সুযোগ মিলতে পারে।

শেক্‌স্‌পীয়রের ফলস্টাফ ভুলে গেছে কতদিন নিজের পা সে দেখতে পায় না—মাঝখানকার ভুঁড়িটিই অন্তরাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতার শতকরা ষাটভাগ যাত্রীও বোধ হয় জানেন না যে ট্রাম-বাসের ভেতরটা কিরকম, সেখানে বসতেই বা কেমন লাগে। 'অন্ধের হস্তিদর্শন' ন্যায়ের মতো তাঁদের কাছে হাতল, ফুটবোর্ড এবং ঝুলন্ত, দুলন্ত আর ঘর্মাক্ত পিণ্ডাকার কতকগুলো মানুষই বাস-ট্রামের বিশ্বরূপ। আজ যদি কোনো যাদুমন্ত্রের বলে তাঁদের জন্যে কলকাতার রাস্তায় সারি সারি ডি-ল্যুক্স বাস আসে, তাঁরা প্রত্যেকে একটি করে বসবার জায়গা পান, গুঁতোগুঁতি, মারামারি, গালাগাল, পা মাড়ানো, অলৌকিক উপায়ে ঝুলে থাকা—এগুলো কিছুই যদি না ঘটে, তাঁরা কি তা সইতে পারবেন? হঠাৎ অভ্যাস বদলে গেলে আচমকা কেউ কেউ মারাও পড়বেন কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

www.pathagar.com

কিন্তু সেরকম ম্যাজিক কলকাতায় কোনোদিন ঘটবে না। এত ঘন বসতির শহর, পথগুলি এত সংক্ষিপ্ত, ট্রাফিক এত বেশি যে অতিরিক্ত বাস-ট্রাম এখানে চালু করাই অসম্ভব। সুতরাং পা-দানিতে যাঁরা চাপতে পারবেন না, আর চাপলেই যাঁদের অফিসের বদলে থানায় যেতে হবে, অতঃপর তাঁদের পক্ষে পাওদল ছাড়া গত্যন্তর নেই। একদিক থেকে ভালোই—বেশ এক্‌সারসাইজ হবে, ক্ষিদে বাড়বে, রাত্রে সুনিদ্রা হবে। শ্যামবাজার থেকে যিনি হেস্টিংসে যাচ্ছেন কিংবা টালিগঞ্জ থেকে যাঁকে ডালহাউসি স্কোয়ারে আসতে হচ্ছে—তাঁর ভবিষ্যৎ তো আরো ভালো, ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ান হওয়ার পথে তিনি অনেকখানি এগিয়ে রইলেন।

আশঙ্কা হচ্ছে, ভ্রমণ-চর্চায় সকলে হয়তো উৎসাহ বোধ করবেন না। চোখের সামনে চলন্ত গাড়ি দেখলেই চাপতে ইচ্ছে করবে, ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হওয়া মানুষের স্বভাব। অথচ পা-দানিতে ভ্রমণ আইনত দণ্ডনীয়। তখন আবার নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করতে হবে, যাত্রীরা বসবেন বনেটে, ট্রাম-বাসের ছাতে! ছাতে ওঠবার জন্যে, বলাই বাহুল্য সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকবে না। কিন্তু অফিসে যাঁদের যেতেই হবে, তাঁরা তেলমাখা বাঁশে আরোহণকারী পাটিগণিতের সেই বাঁদরের মতো পিছলে পড়তে পড়তেও সিদ্ধিলাভ করবেন, অ্যাক্রোব্যাটিক ফীটসে ক্রমশ বিশারদ হয়ে উঠবেন, তারপর চক্ষের পলকে কাঠবেড়ালীর মতো দোতলাবাসের ছাদে চড়ে বসবেন। অবশ্য তার আগে কিছু লোককে চাকার তলায় যেতে হবে, কিন্তু অল্প-বিস্তর আত্মদান ছাড়া কবে কোন মহৎ ব্রতই উদ্‌যাপিত হয়েছে?

বিহারের মিটারগেজ লাইন সম্পর্কে যাঁদের সামান্য মাত্রও অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাই জানেন যে যদিচ সেখানে দোতলা ট্রেনের কোনো ব্যবস্থা নেই, তবুও বহু যাত্রীই দোতলায় ভ্রমণ করে থাকে। তারা সকলেই যে বিনা-টিকিটের প্যাসেঞ্জার তাও নয়। চড়া রোদ কিংবা প্রবল বৃষ্টিতে খোলা দোতলা সবসময় খুব আরামও দেয় না। তবু ওইভাবেই তারা চলে, চলতে বাধ্য হয়, তারপর কখনো হয়তো কোনো নিচু ওভার-ব্রীজের সংঘর্ষে দশ-বিশজন একসঙ্গে ভবপারে যাত্রা করে। কলকাতার ট্রাম-বাসের ছাদে যাঁরা উঠবেন, তাঁরাও ভাববেন, 'কা চিন্তা মরণে রণে!' আমাদের ভারতবর্ষ চিরকালই মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলে জেনেছে, তাই তার প্রতিটি যানবাহনই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে এগিয়ে চলে।

শুধু কলকাতার ট্রাম-বাসের ফুটবোর্ডে নজর দিলেই চলবে? বাদুড়ঝোলা লোকাল ট্রেন, উদ্দামগতি লরী, আইনভাঙা ট্যাক্সি, নিস্পৃহ ঠেলাগাড়ি, প্রতিযোগিতায় পুলকিত প্রাইভেট কার—?

মনে হচ্ছে, সবরকম যানবাহন নিষিদ্ধ করাই একমাত্র উপায়। গাড়ি না থাকলেই কেউ আর গাড়ি চাপা পড়বে না।

২৬/৬/১৯৬৫

www.pathagar.com

'ফোর এন'

অধ্যাপক ধপাস করে আমার ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বললে, 'নাহ্, হল না চাকরিটা। বামুনের পাথর-চাপা কপাল।'

আমি বললুম, 'অত মুরগী খেলে আর ওভাবে হ্যামের অনুরাগী হলে সে বামুনের কপালে পাথর কেন, একেবারে গিরিগোবর্ধন চাপিয়ে দেবেন শ্রীগোবিন্দ। কিন্তু ব্যাপারটা কী? তোমার তো দরকারি কোওলিফিকেশন অভিজ্ঞতা—সব ছিল।'

'ছিল ব্রাদার—তদ্বিরেও ত্রুটি করিনি। কিন্তু বাধ সাধল একটি ফোর এন।'

'ফোর এন?'—আমি আশ্চর্য হলুম : 'এ তো নতুন শুনছি। মানে কী এর? নেমেসিস? নেপোটিজম? নেফিউ? কিংবা—'

'থামো, তোমাকে আর মিথ্যে পরিশ্রম করতে হবে না। কথাটা ফোর এন নয়—ফোরেন। ওটি একটি ইংরেজী শব্দের হিন্দী উচ্চারণ—যার বানান হল F-o-r-e-i-g-n-'

'তাই বলো, ফরিন!'—এতক্ষণে আমি থই পেলুম : 'এইবারে বুঝেছি। অর্থাৎ ইন্টারভিউতে বিলিতি ডিগ্রিওলা কেউ ছিলেন; তিনি তোমাকে টপকে চলে গেছেন।'

'এতক্ষণে ব্যাপারটা তোমার মগজে ঢুকেছে।' অধ্যাপক আমার চুরুটের কেসটা টেনে নিলে, একটা চুরুট বের করে ধীরে সুস্থে ধরিয়ে নিয়ে বললে, 'এবার আমিও একটা ফোর এন করব ভাবছি। ডলারের জন্যে ইওরোপে যেতে দেবে না, কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে রাজশাহীতে তো অন্তত যেতে পারব। সেখান থেকে যদি পি-এইচ.ডি হয়ে আসতে পারি, তা হলে তোমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বাঘা ডি.লিট.-ও মার খেয়ে যাবে আমার কাছে, কারণ আমি 'ফোরেন'।

নিদারুণ চটেছে, গলার ঝাঁজে সেটা মালুম হল। আমি বললুম, 'বিদেশ গিয়ে কেউ যদি ভালো একটা থীসিস লেখে—ডক্টরেট পায়, চাকরিতে তোমাকে ছাড়িয়ে যায়, সেজন্যে তুমি রাগ করতে পারো না।'

অধ্যাপক খানিকটা কটকটে চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কিছুদিন ফরিনে ছিলে না সুনন্দ?'

অপরাধ স্বীকার করতে হল। অধ্যাপক আবার বললে, 'তুমি নিশ্চিত জানো ভারতীয় ছাত্রছাত্রী মাত্রেই মূল্যবান থীসিস লিখে বিদেশী ডক্টরেট পেয়ে থাকে?'

জবাব দেওয়া শক্ত, আমাকে চুপ করে যেতে হল এবারে। না, বিদেশী গয়না মাত্রই সোনার নয়। ইউরোপের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরের ছাত্রদের ডিগ্রী দেবার ব্যাপারে একধরনের সকৌতুক অনুকম্পা আছে। কষ্ট করে, খরচ করে এত দূরে যখন এসেইছে, তখন দিয়েই দাও গোটাকতক অক্ষর। ফ্রান্স ইতালী জার্মানীতে রিসার্চ করছে, অথচ ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মানের দুটো লাইনও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না, তাতে কী, অনুবাদ করিয়ে দাও। বিষয় : 'ভারতের ভোজবাজি ও হাতসাফাই,' বাহ্! বেশ ইন্টারেস্টিং, দাও ডক্টরেট। 'কবি চণ্ডীদাসের মামাবাড়ি কোথায়?' সেটা বার্লিনে হোক আর মরেয়াল-এ-ই হোক—আমাদের পক্ষে সমান—দাও ডক্টরেট। 'পল্লীকবি

www.pathagar.com

গদাধর চাকলাদারের প্রতিভা বিশ্লেষণ?' চমৎকার! আমরা 'টাগোরে'র নাম শ্রুত আছি, তাছাড়া অন্য সব ভারতীয় কবিই আমাদের কাছে গ্রীকভাষার লেখক, অতএব গদাধরের কাব্যে সন্ধ্যাবেলায় শেয়াল-ডাকার যে রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন গবেষক, সেইজন্যেই তাঁকে পি-এইচ.ডি. দেওয়া উচিত।

বিদেশের বড়ো ইউনিভার্সিটির ভালো ডিগ্রী, বিশ্বনন্দিত পণ্ডিতদের নির্দেশে বহুমূল্য গবেষণা—এদের মূল্য কেউ অস্বীকার করবে না। আমাদের কৃতী ছাত্রেরা দিগ্‌দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে আনুন—ডক্টর নারলিকার, ডক্টর ভৈরব ভট্টাচার্যেরা বিদেশে গবেষণা না করতে গেলে সে ক্ষতি ভারতবর্ষেরই। কিন্তু লন্ডন থেকে রাংতা কুড়িয়ে আনলেও ভারতবর্ষে তা 'প্লাটিনাম' হয়ে যাবে? 'ফোরেনে'র এমনি মহিমা যে স্থান পাত্র বিবেচনার দরকার নেই, গবেষণার বিষয়টা পর্যন্ত তলিয়ে দেখবার প্রয়োজন নেই, ডিগ্রীর পাশে ব্র্যাকেটে সেনিগেম্বিয়া কিংবা মাসাচুসেটস্ গোছের একটা কিছু লেখা দেখলেই 'পেয়েছি—পেয়েছি' বলে উর্ধ্ব-বাহু নৃত্য শুরু করে দিতে হবে? কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব বাছা বাছা ছাত্র রক্ত জল পরিশ্রমে সার্থক গবেষণা করলেন, গেঁয়ো যোগী বলে তাঁরা 'ভিখ' পাবেন না আর তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র যে-কোনো একটা 'ফোরেনে'র জোরেই তাঁদের মাথার ওপরে চড়ে বসবে?

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই দাস-মনোবৃত্তি যেন আরো বেশি করে পেয়ে বসেছে আমাদের। যে-দিকে তাকানো যায়, এইসব 'ফোরেনে'র জয়জয়কার! শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান—চাকরির ক্ষেত্রে সর্বত্র তাঁদের দাবিই অগ্রগণ্য। আজ লক্ষ লক্ষ ছাত্র কেন এমনভাবে ইউরোপে আমেরিকায় ছুটতে চাইছে, তার প্রধান উত্তরটিও এরই মধ্যে নিহিত। 'বিদেশী একটা ছাপ না থাকলে ভবিষ্যৎ নেই'—ভারতীয় তরুণেরা এই সত্যটি মনে মনেই বুঝে নিয়েছে।

আত্মস্তুতিতে আমার উৎসাহ নেই, আত্ম-সমীক্ষায় অনীহা নেই, কিন্তু আত্মদূষণে প্রবল আপত্তি আছে। আজ একধরনের বিচিত্র হীনম্মন্যতার আমরা শিকার হয়ে বসেছি। নিজেদের প্রতি মুহূর্তে অশ্রদ্ধা না করতে পারলে আমাদের স্বস্তি নেই, বিদেশীর ভারতনিন্দার রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে সানন্দেই আমরা নির্বোধ সহযোগিতা দিয়ে থাকি। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কেউই আমরা অন্ধ নই, কিন্তু বিদেশের তুচ্ছতম বিশ্ববিদ্যালয়েরও ডিগ্রী প্রাপ্তির ক্ষিপ্ত আকুলতাকে আত্মদূষণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বিদেশী ছাত্র আমাদের ডিগ্রী নিয়ে গর্বিত হোক এ আমরা চাই না—বিদেশে নিজেদের কতখানি লজ্জিত করা যায়, সেইদিকেই যেন আমাদের লক্ষ্য।

এই হল স্বাধীন ভারতের মনস্তত্ত্ব—'ফোরেনে'র জন্যে তার উদ্দাম উন্মত্ততা। এর পরও ইন্টারন্যাশনাল প্রেস্টিজ?

নিজের ভাবনায় তলিয়ে ছিলুম, হঠাৎ দেখি লাফিয়ে উঠেছে অধ্যাপক। বললে, 'চললুম হে সুনন্দ। একটা "ফোরেন" আমায় জোগাড় করতেই হবে। দেখি রাজশাহী যাওয়ার জন্যেই পাসপোর্ট-ভিসার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।'

৩/৭/১৯৬৫

www.pathagar.com

পটভূমিকা

অফিসটা সরকারি নয়—স্বায়ত্তশাসিত বললে যে-ধরনের একটা আবছায়া ধারণা জাগে, তাই। ভীতি-বিহ্বল চিত্তে সেখানে গিয়ে, আমার অভিলষিত সেই চেয়ারখানার দিকে দৃষ্টিপাত করলুম।

কিন্তু অহো ভাগ্য। বার্নিশ-ওঠা বিবর্ণতা নিয়ে শূন্য চেয়ার যেন হাহাকার করছে।

টেবিলের অন্য প্রান্তবর্তী করণিককে সকাতরে প্রশ্ন করলুম : ইনি কোথায়?

ছুটি নিয়েছেন। মেয়ের বিয়ে, আরো কী সব যেন আছে। দশ দিনের আগে আসবেন না।

দরকারি কাগজপত্র আর দরখাস্তখানা এগিয়ে দিয়ে বললুম, কিন্তু আমার এই টাকাটার যে ইমিডিয়েট্ পেমেন্ট হবার কথা ছিল।

ইমিডিয়েট!—সরু গোঁফের নীচে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা খেলে গেল : তা হলে সেভাবে ব্যবস্থাও করুন।

ইঙ্গিত শুনেই রাগে মাথার শেকড়গুলো পর্যন্ত যেন জ্বলে উঠল আমার। না—এক পয়সাও ঘুষ দেব না। এই করেই আমাদের চরিত্র অধঃপাতে গেছে। বেশ শক্ত গলায় বললুম : ব্যবস্থার কথা জানি না, জানতেও চাই না। কিন্তু টাকাটা এক্ষুনি আমার দরকার।

ওঃ, দরকার?—ভ্রূদুটো একসঙ্গে জুড়ে গেল একবারের জন্যে : তা হলে তেতলায় অমুক সেকশনে চলে যান; সেখানেই ওগুলো জমা দিয়ে আসুন। এখানে নয়।

আমি তেতলাতেই গেলুম।

আমার এই পেমেন্টটা—

ইনি দু'গালে দুটো পান পুরে দিয়ে ভরাট স্বরে বললেন, রেখে যান।

কবে পেতে পারি টাকাটা?

তা মাস-চারেক লাগবে অন্তত।

চার মাস!—আমি সভয়ে বললুম, সব তো করাই আছে কেবল—

হুঁ, কেবল!—আমার কথার মাঝখানে বাধা পড়ল : কখনো কখনো একটা চেকে সই হতেই এখানে এক বছর কেটে যায়, মশাই! তবে—

চোখের কোণায় হাসি নাচতে লাগল, না-বলা বাণীর অর্থ বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট রইল না আমার কাছে। এবং আমার মাথার ভেতর দিয়ে সেই আগুনের স্রোত বয়ে গেল আবার। দেব না, কিছুতেই ঘুষ দেব না।

বললুম, দেখা যাক—কত দিনে চেকে সই হয়। সাত দিন পরেই রিমাইন্ডার দেব আমি।

দেবেন রিমাইন্ডার—সমস্ত মুখ তাচ্ছিল্যে কুটিল হয়ে উঠল : আমরা রিসিভ করব এখন।

www.pathagar.com

বুঝতে পারলুম, টাকা ছাড়া এক ইঞ্চি নড়ানো যাবে না এদের, অভ্যাসটাও এইরকম দাঁড়িয়ে গেছে। বিরক্তি আর ঘৃণায় রী-রী করতে লাগল সারা শরীর। কিন্তু ঘুষ নেওয়াটাই যদি এদের নীতি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমারও প্রিন্সিপল আছে একটা। কিছুতেই আমি ঘুষ দেব না। রিমাইন্ডারের পর রিমাইন্ডার দেব; উকিলের চিঠি পাঠাব তারপরে, তারও পরে না-হয় আদালত পর্যন্তই এগোনো যাবে। আমার টাকাটা যখন ঘুষের নয়, তখন সততার সাহায্যেই সেটা আদায় করা সম্ভব কিনা, তাই না-হয় পরীক্ষা করে দেখব একবার।

জ্বলতে জ্বলতে ঘর থেকে করিডরে বেরোতেই ডাক শুনলুম : সুনন্দ যে।

চমকে চেয়ে দেখি, কলেজের এক সতীর্থ। জিজ্ঞেস করলে, এখানে কী মনে করে?

বুঝতে পারলুম, বন্ধুটি এখানকারই চাকুরে। বেশ ভরসা এল মনে। অবস্থাটা সব নিবেদন করলুম ওর কাছে।

ঠিক আছে—বন্ধুটি অভয় দিলে : আমি ওটা তাড়াতাড়িই বের করে দেব।

কতদিনে?

তা মাস দেড়েক লাগবে নিশ্চয়।

দেড় মাস! এত দেরি?

বন্ধুটি হতাশভাবে হাত নাড়ল : কী করা যাবে ভাই, নানা রকমের প্যারাফার্নেলিয়া আছে তো! ধরাধরিও করতে হবে একে-ওকে। বুঝিস তো সব। লাল ফিতের ব্যাপার, কেউ হাতটুকু পর্যন্ত নাড়তে চায় না। এ টেবিলের ফাইল ও টেবিলে যেতে পনেরো দিন গড়িয়ে যায়। যাই হোক, এটা তোর কেস্ যখন, স্পেশ্যাল ইন্টারেস্ট নেব আমি।

ক্যান্টিনে চা খাইয়ে এবং আরো কিছু ভরসা দিয়ে বন্ধু আমাকে অভয় দিলে। চার মাস দেড় মাসে নেমেছে, তবু মনটা বিস্বাদ হয়েই ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে বোধহয় দু'তিন দিনের বেশি লাগা উচিত নয়, হয়তো এক সপ্তাহও লাগতে পারে, কিন্তু যেহেতু আমি ঘুষ দিতে প্রস্তুত নই, সেই অপরাধে আমার পাওনা টাকা চাপা পড়ে থাকবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে? আর এই চলতে থাকবে? কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না এর?

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছি, চুরুট গালে একজন উঠে আসছিলেন। মুখার্জি সাহেব। বড়ো একটা বিলিতি ফার্মের ছোট ম্যানেজার, ভাগ্যগুণে এই অধমকে চিনতেন। কী কাজে এখানে আসছিলেন জানি না, কিন্তু আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কী হয়েছে আপনার? মনের চেহারা ও-রকম কেন?

বিরস গলায় সংক্ষেপে সবটা তাঁকে নিবেদন করলুম।

'ইজ ইট সো?'—মুখার্জি সাহেব বললেন ঠিক আছে, একবার আসুন তো আমার সঙ্গে।

অতঃপর মুখার্জির বন্ধু বড়োকর্তার ঘরে প্রবেশ, মুখার্জি প্রমুখাৎ সমস্ত শুনে বড়োকর্তার সিংহনাদ : 'এই এদের জন্যেই দেশটা গেল,' কলিং বেলে একটি প্রবল

www.pathagar.com

মুষ্ট্যাঘাত : 'ডাকো অমুক সেকশনের চৌধুরীকে' এবং কিছুক্ষণ পরে সেই প্রথম ব্যক্তির বিনীত চিত্তে প্রবেশ—যিনি আমাকে ব্যবস্থার কথা সর্বাগ্রে শুনিয়েছিলেন।

বিনা ভূমিকায় বড়োকর্তা বললেন : এঁর পেমেন্টটা করিয়ে দেন চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। ইনি আমার ঘরে বসছেন ততক্ষণ।

স্যার, হাতে বিস্তর কাজ—

কোনো কথা শুনতে চাই না, জাস্ট ফর্টি মিনিটস। এক সেকেন্ডও বেশি নয়।

ঘুষ আমাকে দিতে হল না, চার মাস অপেক্ষাও করতে হল না, চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই টাকাটা হাতে এসে গেল। বিজয়গর্বে চলে আসছি, দেখি করিডরে সেই চৌধুরী।

ক্ষীণ গলায় শুধু বললেন, এতটা না করলেও পারতেন স্যার—হয়তো সামনের লিফ্‌টটা আমার—।

একটু চুপ করে থেকে বললেন : কুড়ি বছরে চাকরি করেও কত মাইনে ঘরে নিয়ে যাই জানেন? দু-শো সাত টাকা। বাড়িতে আটটি পোষ্য—বিধবা একটা বোনকেও সাহায্য করতে হয়।

কুড়ি বছর চাকরি, দু-শো সাত টাকা মাইনে, আটজন পোষ্য এবং বিধবা বোন! থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম, ঘুষ না-দেবার তৃপ্তিটা মুহূর্তে আমার ফিকে হয়ে গেল।

১০/৭/১৯৬৫

একটি অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী

ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। ঠিক রাত সাড়ে তিনটেয় কানের কাছে যেন ক্যাড়াং কুড়াং শব্দে নাচতে শুরু করে দিলে। উত্তেজনায় সারারাত আমি প্রায় জেগেই ছিলুম, কাজেই ওই বিকট আওয়াজটার কোনো দরকার ছিল না; উঠে বসে আমি ঘড়ির কণ্ঠরোধ করলুম এবং মৃদু নাসিকাধ্বনি থামিয়ে ফিস্‌ফিসে গলায় স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'এইবার যেতে হবে?'

ব্যাপারটা এত গম্ভীর আর গুরুতর যে, অতি সাবধানে চলতে হবে আমাকে। সামনে যে দুঃসাধ্য কর্মযোগ, তাতে যদি সিদ্ধিলাভ করতে পারি—তাহলে এক অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হব আমি। কিন্তু আপাতত কীর্তির চাইতেও বড়ো হয়ে উঠেছে প্রলোভন—এক দুরন্ত দুরাশার পেছনে ছুটেছি—রক্তের তালে তালে হৃৎপিণ্ড বলছে : পাব? পাব না? পাব? পাব না?

ঠিক চারটে পনেরোয় আমার অকুস্থলে পৌঁছবার কথা। আমি তৈরি হতে আরম্ভ করলুম। স্কুল ছাড়বার পরে আর ফুটবল খেলিনি; কিন্তু এরই জন্যে কালকে কালো একটা হাফপ্যান্ট কিনতে হয়েছে আমাকে। সেইটে পরে গায়ে একটা পুরনো নীল রঙের হাফশার্ট চড়ালুম—বুড়োবয়সে সবটা মিলে নিজেকে কেমন 'পকেটমার-পকেটমার' দেখাতে লাগল।

www.pathagar.com

স্ত্রী বললেন, 'জুতো পরবে না?'

বললুম, 'ক্ষেপেছ। দৌড়াতে হতে পারে, পাঁচিল টপকাবার দরকার পড়তে পারে, জুতো-টুতো পায়ে দিয়ে শেষতক বেঘোরে মারা যাই আর কি।'

'খুব সাবধানে যেয়ো—আমার প্রাণ কাঁপছে।'

বললুম, 'আমারও কাঁপছে না তা নয়, কিন্তু কী করব। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি দুর্গানাম জপ করো বসে বসে।'

চারদিক বেশ করে দেখে শুনে আমি পথে পা দিলুম। ফাঁকা নির্জন রাস্তা। পাহারাওয়ালারা ফিরে গেছে, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা এখনো বেরোয়নি। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া দূরের কথা, অচেনা লোকেরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কিন্তু উৎপাত বাধাল কুকুরগুলো। একে পাড়ায় নতুন এসেছি, তার ওপর এই অপূর্ব বেশবাস—আমাকে ছিঁচকে চোর মনে করে তারস্বরে সংবর্ধনা জানাতে লাগল তারা।

'হ্যাট্ হ্যাট্' বলে নার্ভাস গলায় তাড়াতে চেষ্টা করলুম, তাতে তারা আরো বেশি অনুপ্রেরণা পেল বলে মনে হয়। 'ডাকলে কুকুর কামড়ায় না'—প্রাণপণে এই সান্ত্বনা-বাক্যটি জপ করতে করতে আমি এগিয়ে চললুম—আমার যাত্রাপথ তারা জয়ধ্বনিতে চিহ্নিত করতে লাগল।

কুকুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলল বড়ো রাস্তায় এসে। এইবার আরো বেশি করে চোখ-কান খাড়া রেখে চলতে লাগলুম। এই তো সাইকেলের দোকান, ওই তো, সিঁড়ি—আর—আর সিঁড়ির ওপর থেকে বেঁটে মতন কে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে? মুখে একটা বিড়ি জ্বলছে তার।

হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল আমার।

মুখ থেকে বিড়ি নামিয়ে বেঁটে লোকটা খ্যাড়খেড়ে চাপা গলায় বললে, 'কে ওখানে?'

'আমি—আমি'—তিনবার ঢোক গিলে বললুম, 'আমার কথা ভবতারণ বলেছিল?'

'অঃ, আপনিই?' চাঁচা-ছোলা গলায় লোকটি বললে, 'আপনার জন্যেই বসে আছি। তা চারিদিকে বেশ দেখে-শুনে এয়েছেন তো?'

'তা দেখেছি।'

'মানে, পেছনে পুলিশ-টুলিশ কিছু নেই তো?'

'আজ্ঞে না, কেউ নেই।'

'তা হলে আসুন'—বলে লোকটা চট করে পাশের একটা গলির মধ্যে পা বাড়াল। আমিও চললুম পেছনে পেছনে।

গলির ভেতরে আরো গলি এবং সেগুলি ভয়াবহ। কর্পোরেশনের পরিভাষায় 'সিউয়ার্ড ডিচ্।' এবার তারই ভেতরে ঢুকতে হল আমাকে। অবশ্য ঢোকবার আগে ছোট্ট একটি অ্যাডভেঞ্চার ঘটল, অর্থাৎ অন্ধকারে ঘুমন্ত একটি লাল গরুকে ঠাহর করতে না পেরে আমি তার ওপর হোঁচট খেয়ে পড়লুম। গরু মাথা তুলে

www.pathagar.com

নির্বিকারভাবে জাবর কাটতে লাগল, নাকে আর থুতনিতে দারুণ ব্যথাটা পেলুম আমিই, চশমাটা ছিটকে হাত তিনেক এগিয়ে গেল।

খ্যাড়খেড়ে গলায় লোকটা একটু হাসল : 'আছাড় খেলেন স্যার? এ-সব একটু দেখে-শুনে হাঁটতে হয়।'

চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি কোঁ-কোঁ করে বললুম, 'আছাড়ের জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ওটা পাব তো দাদা?'

'খুব আশা আছে। তবে জানেন তো, শেষ পর্যন্ত সবই আপনার লাক। আচ্ছা—এখানে একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।'

কোনদিকে যে সুট্ করে চলে গেল জানি না, একটা নোনাধরা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। পায়ের তলা দিয়ে মৃদু একটা জলের ধারা বয়ে চলেছে মনে হয়, অদ্ভুত দুর্গন্ধ উঠছে চারদিক থেকে, হাতখানেক দূরে বালিশের মতো ফুলে রয়েছে একটা মরা ইঁদুর। মাথার ওপর থেকে থেকে টুপটাপ করে কিসের দু-একটা ফোঁটা পড়ছে, জানি না—গঙ্গাজল-চোয়ানো ট্যাঙ্কের ব্যাপার হলে ভালোই, আর না হলে কী যে পড়ছে, তা আর অনুমান করবার দরকার নেই।

অন্ধকার একটা একতলার উঠোন। এবড়ো-খেবড়ো গর্ত। এই ভোররাতেও ইঁদুর দৌড়োচ্ছে। এককোণায় মস্ত একটা পুরনো চৌবাচ্চা। খ্যাড়খেড়ে-গলা লোকটি বললে, 'ওই চৌবাচ্চায় নেমে চুপটি করে বসে থাকুন। ভয় পাবেন না—জলটল নেই।'

'কিন্তু কাঁকড়া-বিছে—'

'থাকতেও পারে দু-চারটে। কিন্তু এইটুকুন্ রিস্‌ক না নিলে কী হবে মশাই? আপনি না লুকিয়ে থাকলে আপনার সামনে কেউ বেরুবে না।'

ঠিক। পত্রপাঠ আমি চৌবাচ্চায় গিয়ে লুকোলুম। পায়ের তলায় ভাঙা ইট বিঁধতে লাগল, কানের ওপর নাচতে লাগল আরশোলা, আর পুরো আধঘণ্টা ধরে কতকগুলো পিনপিনে মশা—

না মশাই, তবুও পাইনি। আমার 'লাক' ছিল না সেদিন। যে কটা আসছিল, তারা নাকি ট্রেনেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। খালিহাতেই ফিরতে হল আমায়। বলেছে, দিন সাতেক পরে আবার হয়তো চান্স পেতে পারি।

হাঁ, বুঝেছেন এতক্ষণে, আমি একটা ইলিশ মাছ কিনতে গিয়েছিলুম।

১৭/৭/১৯৬৫

সে চায় না পিবে

ভারতের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে সমস্যার জট এখনো সম্পূর্ণ খুলেছে বলে মনে হয় না।

ব্যস্তসমস্তভাবে জোড়াতালি দিয়ে গণ্ডগোলটাকে থামিয়ে একজায়গায় ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, আপাতত তো কাজ চলুক। পরের অবস্থাটা পঞ্চদশ

www.pathagar.com

লুই আর মাদাম দ্য পঁপাদুরের ভাষায় : 'আপ্রনুল্য দেল্যুঝ'—'আমাদের পরের মহাপ্লাবন!'

কিন্তু দেশের দুর্ধর্ষ নেতারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন বলেই সমস্যার সমাধান মিলবে না, এমনটা হতেই পারে না। কোন নিভৃত নগণ্যতায় কী দুর্জয় ব্যাপারের অঙ্কুর যে পল্লবিত হচ্ছে আমাদের তা কল্পনারও বাইরে। এইটে বুঝেই 'হিতোপদেশে'র বিচক্ষণ রচয়িতা আমাদের সাবধান করে বলেছেন, 'বাপু হে, ক্ষুদ্রকেও অবহেলা করতে নেই। সামান্য টিট্টিভ পাখিও সমুদ্রকে শায়েস্তা করে দিয়েছিল।'

টিট্টিভ পক্ষী কাকে বলে আমার ঠিক জানা নেই। চড়ুই থেকে গাংশালিকের ভেতরে যে-কোনো একটি সাইজের বলে অনুমান করা যেতে পারে। এমনকি ঈগলের মতো বড় গোছের ব্যাপারও হতে পারে কিন্তু 'মহোদধি'র কাছে মোটের ওপর সে জ্যামিতিক বিন্দুর চাইতে বেশি নয়।

এই টিট্টিভের মতোই একটি উদ্গম দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী জেলা, সাঁওতাল পরগণা থেকে। ভাষা-সমস্যা সমাধানের নিশ্চিত একটা সূত্র এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, এখন কিছু কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্জন-পরিবর্ধন করে নিলেই আমাদের দুর্ভাবনার সমাপ্তি ঘটে।

একটি চিঠি ও প্রশ্নপত্র পেয়েছি ডাকযোগে। যে ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন, তিনি ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত। তাঁর চিঠি থেকেই উদ্ধৃতি দিই : 'এই প্রশ্নপত্রে বাংলা হতে দশটি বাক্য ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বলা হয়েছে।..হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত অপূর্ব ভুনি-খিচুড়ি অন্য যে কোনোখানে মুখরোচক হতে পারে, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের পাতে এ যে-বিরূপ তিক্ত ও বিস্বাদ তা সহজেই অনুমেয়। যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভাষা-ভাষী ছাত্র অধ্যয়ন করে এবং যে-স্থানে ভাষা অনুসারে ছাত্রদের প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, সেখানে এহেন বাংলা গদ্য-গদা দিয়ে ছাত্রদের আঘাত করার অর্থ বুঝতে পারিনে।'

যে প্রশ্নপত্রটি ভদ্রলোকের এই উত্তেজনার কারণ, তার ওপরে ইংরেজিতে লেখা আছে : 'Translate any ten sentences into English' এবং তারপরে পনেরোটি বাক্য বাংলায় মুদ্রিত। অতএব এটি বাঙালী ছাত্রদের জন্যেই। আর এই বাংলা বাক্যগুলির চেহারা এই রকম :

"ভারত আমার মাতৃভূমি আছে। রাত্রিকালে আমি রুটি খাবার পছন্দ করি। তুমি আমার প্রিয় মিত্র থাকেন। ঘোড়া বেগে দাঁড়ায়। কি আপনি প্রত্যহ স্কুলে যাইতেছেন? আমার ভাই আজ বিমার আছে। হস্তী এক বহু বিস্তৃত জানবার আছে। গোলাপ এক সুন্দর ফুল থাক। সে চায় না পিবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ বাক্যটির অর্থোদ্ধার করতে বেশ সমস্যায় পড়েছিলুম। একবার মনে হল, সে 'চায়না' অর্থাৎ চীনকে পান করতে চায়, তারপর মনে হল, সে পান করতে চাইছে না, শেষে বোঝা গেল (অথবা যতটা বোঝা যাচ্ছে) ওর অর্থ হচ্ছে 'সে চা খাবে না।'

এই স্কুলটি যদি পাঞ্জাব, কেরল কিংবা কুর্গে হত, তা হলে বাংলায় এই দেখেই আমাদের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে থাকত। 'হস্তী বহু বিস্তৃত জানবার' হলেও অন্তত

www.pathagar.com

বঙ্গাক্ষরেও সে আত্মপ্রকাশ করেছে, এতেই আমি রাত্রিকালে রেশনের গমসম্ভূত 'রুটি খাবার পছন্দ' করতুম এবং 'ঘোড়া' যতই 'বেগে দাঁড়িয়ে থাকুক' (নিশ্চয় একটা দুঃসাধ্য শারীরিক প্রক্রিয়া) আমার তা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং রোমাঞ্চকর বলে মনে হত।

অথচ স্থানটি নিতান্তই সাঁওতাল পরগণায় এবং ভৌগোলিকভাবে যতটা অনুমান করছি মাঝখানে মাত্র গঙ্গার ব্যবধান আর পরপারে বিশুদ্ধ বাংলাদেশ, অর্থাৎ মালদহ জেলা। আরো মনে পড়ছে, শিশুকালে তখন সুনন্দরও ওই অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তখন ওদিকের সত্যিকারের ভাষা বাংলা না হিন্দী এ নিয়েও তর্ক চলতে পারত। আর স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে আজ গঙ্গা পেরিয়েই বাংলাভাষার গঙ্গালাভ হচ্ছে, এ একটা নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহ!

কিন্তু আমিও তো দেখছি পত্রলেখক শ্রীযুক্ত মজুমদারের মতো সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছি। আসলে এই প্রশ্নপত্রটি বাংলাভাষার গঙ্গাযাত্রা নয়, ভাষা-সমস্যা সমাধানের চমৎকার একটি সংকেত। এ এক ভারতীয় 'এসপ্যারান্টো'—সর্বভাষার সমন্বয়ের উদ্যোগ—একটি 'অ্যাস্পিরেশন'। এখন এর ভেতরে কিছু মারাঠী-মালায়ালাম-পাঞ্জাবী-তামিল-উর্দু-ওড়িয়া ছিটিয়ে দিলেই ফকিরের আলখাল্লার মতো বর্ণবিচিত্র এক ভারত-ভাষার আবির্ভাব। অর্থাৎ এই প্রশ্নপত্রকে টিট্টিভ পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, এরই দ্বারা একদিন সমুদ্র ব্যাকুলীকৃত হবে।

পত্রলেখক আর একটি সংবাদ সরবরাহ করেছেন, সেটিও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। অর্থাৎ ওই সমস্ত অঞ্চলে নাকি প্রশ্নপত্র তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। স্কুলের মাস্টার মশাইদের আর কষ্ট করতে হয় না। পরিশ্রম করে প্রশ্ন লিখতে হয় না, প্রুফ্ পর্যন্ত দেখতে হয় না। শুধু কাঞ্চনমূল্য পাঠিয়ে দিলেই যথেষ্ট—ছাপা প্রশ্নপত্র সোজা স্কুলে এসে হাজির হয়।

এই তো হওয়া উচিত—এ না হলে আর 'অটোমেশন'-এর যুগ! এইভাবেই তো 'ম্যান-পাওয়ার' ক্রমশ অনাবশ্যক হয়ে আসছে, এখন সবাই অটোম্যাটিক এবং নির্ঝঞ্ঝাট।

ছেলেবেলায় বিয়েবাড়িতে রঙ-বেরঙের প্রীতি-উপহার পেয়ে রোমাঞ্চিত হতুম আমরা। জ্যাঠামশাই, মা, মামা, দাদু, স্নেহের ছোট ভাই বিল্টু—সবাই মিলে এমন চমৎকার কবিতা কী করে যে লেখে তা আমার কাছে দারুণ রহস্যময় বলে বোধ হত। বয়স বাড়লে জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করতে হল, জানা গেল অনন্তকাল ধরে প্রীতি-উপহারের বিবিধ নমুনা, ফুলমালা হাতে দুটি উড়ন্ত পরীর এবং কোট-পরা আর চুড়ি-পরা দুটি মিলিত হাতের ছবি প্রেসে মজুত আছে, শুধু গিয়ে নাম-ধাম এবং বিবাহ-বাসরটা বসিয়ে দিলেই হত।

প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রেও যাঁরা প্রীতি-উপহারের এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদভাজন। আশা করা যায়, এই দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে সকলেই অনুপ্রাণিত হবেন এবং যেদিন এইরকম এসপ্যারান্টো রচিত অটোমেশন-সম্ভূত প্রশ্নপত্র কলকাতার স্কুলেও বিতরিত হবে, সেদিনটি আমাদের জাতীয়-জীবনের মহোৎসব।

বলতে ভুলে গেছি, উক্ত প্রশ্নপত্রটি প্রীতি-উপহারের মতোই লাল কাগজে লেখা।

৩১/৭/১৯৬৫

www.pathagar.com

হ্র্যাম্বো—র‍্যাঁবো—ঘ্যাঁবো

হ্র্যাম্বো', 'র‍্যাঁবো', 'ঘ্যাঁবো'—বিদেশী কবির নামের এই উচ্চারণ-বিতর্কে 'দেশ' পত্রিকার পাতা দেখছি কলমুখর। তাঁর নাম নিয়ে এইসব বিপর্যয় কাণ্ড ঘটবে—এইটে অনুমান করেই খুব সম্ভব উক্ত ফরাসী কবিটি সাঁইত্রিশ বছর বয়েসেই মারা গিয়েছিলেন, যৎসামান্য লিখে তার অনেক আগেই সাহিত্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর সাহিত্যের পাতায় ভ্যার্ল্যান আর মালার্মের মাঝখানে একটুখানি জায়গা রেখে গিয়েছিলেন—অমরত্বের দাবি তাঁর একেবারেই ছিল না। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে ছাড়ল না, উত্তরকাল আবার আসরে টেনে নামাল। কিন্তু নামের জন্যে এত দুর্ভোগ বইতে হবে জানলে কবি হয়তো সনিশ্বাসে তাঁর প্রায় গুরু ভ্যার্ল্যানকে একটু বদলে আবৃত্তি করতেন :

"O triste, triste etait nion ame
A cause, a cause–"

উঁহু— "d'une femme" নয়, d'un nom !

অর্থাৎ—'হায়, ব্যথিত—ব্যথিত ছিল আমার হৃদয়, কিন্তু একটি—"

"নারীর জন্য নয়"—"একটি নামের জন্য"। অবশ্য 'ame'-এর সঙ্গে 'nom'টা মিল হিসেবে আদৌ খাটে না, কিন্তু ওখানে যদি বাংলা মতে লেখা যায় "A cause, a cause d'un নাম"—তা হলে আর কিছুই বলবার থাকে না।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, খামোকা নাম নিয়ে এই মাতামাতি কেন? এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ফরাসী 'R'-এর উচ্চারণ guttural, একটু চেপে শ্বাসের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করলে যে ধ্বনিটা ওঠে, সেটা 'R' যদি না হয়, তবে 'H'-ও নয়, কারণ 'H' উচ্চারণ তো ফরাসীর জানাই নেই। আবার দক্ষিণ ফ্রান্সে শুনেছি 'R'-কে 'R-R-R'-এর মতো উচ্চারণ করা হয়, তাহলে যে ব্যাপারটা র্-র্-র‍্যাঁবো হয়ে দাঁড়াবে।

মেনে নেওয়া যাক, বাংলায় ফরাসী 'R'-এর উচ্চারণ নেই। তাহলে ইংরেজী 'R'-ই চলুক না। ফরাসী 'J'-র উচ্চারণ আছে বাংলায়? শব্দের শেষে 'ge'-কে বোঝাব কোন ধ্বনিতে? আর শুধু ফরাসীই বা কেন, প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কতগুলো ধ্বনি আছে যা সেই ভাষীর একান্ত নিজস্ব, অন্য ভাষায় তার ধ্বন্যন্তর নেই। ইংরেজী 'Z'-এর কী হবে? এবং জার্মান 'Z' কি 'ৎস' দিয়েই নির্ভুল উচ্চারিত? রুশ 'X' 'খ' আর 'হ'-এর মাঝখানে এমন একটি জায়গায় অবস্থান করছে যে বাঙালীর মুখে উক্ত 'X'- সম্ভূত চেকভের 'ক' উচ্চারণ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা! ফরাসী 'U' কঠিনতম প্রয়াসে আয়ত্তগম্য—সেইজন্যে মলিয়্যার সকৌতুকে শুয়োরের মুখাকৃতি অনুকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফারসী উর্দুতে যে 'গায়েন' হরফটি আছে—যা দিয়ে 'গজল' 'গম' ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য শব্দ তৈরি হয়, সেটি গ এবং ঘ-এর মধ্যবর্তী—অনেক চেষ্টাতেও আমি তাকে দুরস্ত করতে পারিনি। ইংরেজকে একবার আমাদের 'ক' বর্ণ উচ্চারণ করতে বলুন, দেখবেন কী দুর্গতি তার হয়। আর অত গবেষণাই বা করে কী হবে, বাঙাল সুনন্দর বিলক্ষণ জানা

www.pathagar.com

আছে যে পদ্মা পার হলে চন্দ্রবিন্দু বিন্দুবৎ হয়ে যায়, আর 'ড়'-এর উচ্চারণ যিনি করতে পারেন তিনি তো অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

মুশকিল হয়েছে এই যে, বিদেশী নামের নির্ভুল উচ্চারণের জন্য আমাদের যত আকুলতা, অন্য বিদেশীদের তা নেই। নিতান্তই পণ্ডিত আর ভাষাতাত্ত্বিক ছাড়া সকলেই নিজের ভাষা অনুযায়ী বিদেশী নামের উচ্চারণ করে থাকে। তারা 'ঠাকুর'কে 'ট্যাগোর' করে, বর্ধমানকে 'বার্ডোয়ান'-এ পৌঁছে দেয়, কলকাতাকে 'ক্যালকাটা' বানায় এবং বিন্দুমাত্রও লজ্জিত হয় না। 'দেশ'-এ যে কবি পত্রলেখক 'কালক্যুত্তা' শুনে 'ডালকুত্তা'র সঙ্গে সাদৃশ্য ভাবনায় বিচলিত, তিনি ইংরেজী ভাষায় ইন্ডিয়ান হতে পারেন, কিন্তু ফরাসীতে অবধারিত 'অ্যাঁদিয়াঁ' এবং তাঁর পদবী অকরুণভাবে একেবারে "শাকরাবাবর্তী"। ইউরোপের সর্বত্র এ-ই চলে, 'Don Quixote'-এর বিখ্যাত নমুনার মতো শব্দের আসল উচ্চারণটি যা-ই হোক—প্রত্যেক দেশই তাকে নিজস্ব ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করে নেয়। এ শুধু সাধারণের মৌখিক ভাষাতেই নয়—সাহিত্যেও চালু। মনে পড়ছে আমাদের বাংলাদেশেই 'Don Quixote'-এর কে যেন অনুবাদ করেছিলেন 'ডনকুস্তি'। আমার ধারণা, এইটিই সবচাইতে বিচক্ষণ অনুবাদ—বইটির এমন লাগসই সরস নাম আর হতেই পারে না।

সব বর্ণমালায় সব ধ্বনি নেই, সব জিহ্বা সব উচ্চারণ করতে পারে না। আমার বন্ধু অধ্যাপক দারুণ পণ্ডিত লোক, কিন্তু 'শেক্‌স্‌পীয়র'-এর 'শ'-কে সে 'স' বলবেই। তাতে শ্রুতিগতভাবে একটা আপত্তিকর পরিবর্তন ঘটে এবং মহাকবিকে এমন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে 'পীয়ারেজ' দেওয়া হয় যা মোটেই তাঁর গৌরব বাড়ায় না। আমি যখন প্রতিবাদ করি, তখনই দারুণ আশ্চর্য হয়ে যায় অধ্যাপক। কপালে চোখ তুলে বলে, 'কেন, আমি তো শেক্‌স্‌পীয়রকে শেক্‌স্‌পীয়রই বলে থাকি!'

পৃথিবীর অন্য কেউ যদি লজ্জিত না হয়, আমরাই বা কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়ি? ক্রীশ্চান ইউরোপের বিভিন্ন দেশ 'যীশুখ্রীস্ট'কে কী কী নামে স্মরণ করে থাকে, সেটা অনুধাবন করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হতে পারবে। যে কবির নাম নিয়ে এত আলোচনা—খ্রীস্টের চাইতে বিখ্যাত তিনি নিশ্চয়ই নন এবং বাংলা মতে (অবশ্যই ইংরেজীর আনুগত্যে) আমরা নাহয় তাঁকে 'রিমবাউড'-ই বলব। সেটা শুদ্ধ না হতে পারে, কিন্তু উৎকট হবে না এবং কবির দেশের মানুষও হয়তো চেষ্টা করে বুঝে নেবেন—যেমন 'গ্যাঞ্জেস'কে গঙ্গা বলে আমরা চিনে নিতে পারি।

মূল উচ্চারণ করতে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করবার সম্ভাবনা অনেক বেশি, বিপদের সম্ভাবনা তাতে আরও বেশি। আমরা সবাই জানি, সংস্কৃতির সব ধ্বনিগুলো বাংলায় উচ্চার্য নয়—যেমন 'ঋ', 'ষ', 'ণ' ইত্যাদি। এখন কেউ যদি সেই মূলে ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের "চক্ষে আমার তৃষ্ণা"কে 'চকশে আমার ত্রহ্‌ণহা"—বলে গান শুরু করেন, তা হলে তার চাইতে দুর্দিন তো কল্পনাও করা যায় না!

সেই চীনে গল্পটি জানেন? একটি ছোট শব্দ, শুধু উচ্চারণের ওপরেই নির্ভর করে তার দুটি অর্থ : 'যুদ্ধ চাই', 'সন্ধি চাই'। এক ছোট রাজার রাজধানীর বাইরে

www.pathagar.com

সসৈন্যে বড়ো রাজা এসে হাজির। বলা বাহুল্য ছোট রাজা সন্ধি চান—যুদ্ধ চান না, সেইটে জানাবার জন্যেই দূতও পাঠিয়ে দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দূতের জিভ ছিল 'শেক্‌সপীয়র'কে 'স' দিয়ে বলবার মতো এবং ফলে—

ফলে যা হল, তা আশা করি আপনাদের অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছে না। সেইজন্যেই বলছি, 'রিমবাউড'কেই আঁকড়ে ধরুন, অনেক বিড়ম্বনার হাত থেকে নিস্তার পাবেন।

২১/৮/১৯৬৫

সন্দেশায়ন

আসুন এবারে কিছু 'ড্যর্জ'—অর্থাৎ শোকসঙ্গীত গাওয়া যাক। এতদিন ধরে দিকে দিকে বহুজনের কড়িতে কোমলে বিবিধ বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাতে যোগ দিইনি। আমার কেবলই মনে হয়েছিল, হয়তো শেষমুহূর্তে আবার সিদ্ধান্ত বদলাবে—এর আগেও একবার যেমন ঘটেছে।

কিন্তু এবার সত্যি সত্যিই 'নামিল আঘাত শেষ বজ্রাঘাত'। তার মানে, 'সন্দেশ' ইতিহাস হল। এই জার্নাল যখন আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে তখন সন্দেশ তৈরি বে-আইনী, সন্দেশ খাওয়াও নিশ্চয়ই আইনী নয়। চব্বিশে অগাস্টকে তাই আমাদের শোকদিবস হিসাবে গণ্য করা উচিত। বলা দরকার 'সয়াবীন' সম্পর্কে আমি আশাবাদী নই।

ছানা-জাত সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ, চমচম ইত্যাদি বঙ্গীয় প্রতিভারই অবদান। ভারতবর্ষের আর কোথাও ছানার মিষ্টি তৈরি হত না। অবাঙালীরা বিদ্রূপ করে বলতেন, 'বাঙালীর বুদ্ধিই বিপরীত। তারা মাছ খাওয়ার জন্য পাগল, তারা টিকি রাখতে ভালোবাসে না এবং টুপি পরে না—তারা টাটকা দুধকে নষ্ট করে দিয়ে ছানা তৈরি করে। আরে রাম—রাম।'

কিন্তু ধীরে ধীরে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জয়যাত্রা শুরু হল। বাঙালীর কাছ থেকে আরো অনেকেই মাছের স্বাদ রসনায় নিলেন; গঙ্গার ইলিশের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বাগবাজার, কিন্তু ইলিশের অনেক নৌকাকেই ব্রেকজার্নি করতে হল বড়বাজারের ঘাটে। টিকি-না-রাখা এবং টুপি-না-পরা আধুনিকতা হয়ে দাঁড়াল। আর ছানা মিষ্টি? একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলি সে প্রসঙ্গে।

উত্তর প্রদেশের সুদূর প্রান্তের এক শহরে একটি বিয়েবাড়ি। বিয়ে বাঙালীর কিন্তু অতিথিদের নব্বুইভাগই অবাঙালী। খেতে বসে একটি মাত্র বস্তুর জন্য সকলে ব্যাকুল হয়ে আছেন—'রস্‌গুল্লা?'

রসগোল্লা এসেছে মাইল কুড়িক দূর থেকে—এক বাঙালী কারিগর আছেন সেখানে। যে রসগোল্লা তিনি তৈরি করেছিলেন কলকাতা হলে বোধ হয় সেগুলো

www.pathagar.com

ব্যুমেরাঙের মতো পরিবেশনকারীর গায়ে মাথায় ফেরত যেত। কিন্তু স্থানীয় অতিথিরা যে কী পরিতোষ নিয়ে তা খেলেন—তা চেয়ে দেখবার মতো। 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ অবদান কী?' বহু অবাঙালীই সমস্বরে তার উত্তরে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ আর রসগোল্লা!'

অতএব রবীন্দ্রনাথের মতো রসগোল্লাও আর আমাদের একচেটিয়া সামগ্রী নয়—সে এখন ভারতবর্ষের হৃদয়ে (স্থূলভাবে 'জিহ্বায়') আসন করে নিয়েছে। ভ্যাকুয়াম টিন আর 'সুপারসোনিক স্পীডে'র গতি তাকে বিশ্বময় পৌঁছে দিচ্ছে, কে জানে কবে তার ভেতরে 'ডলার' উপার্জনের স্বর্ণবীজ অঙ্কুরিত হবে! কিন্তু স্বদেশ? সে বাঙালীর, শুধুই বাঙালীর? 'এই বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' সে যে কত অপরূপ রূপে দেখা দিয়েছে, একমাত্র বাঙালীই তা জানে। সে কখনো 'মনোহরা', কখনো 'গুপো সন্দেশ', কখনো 'আবার খাবো', কখনো 'বরফি', কখনো 'তালশাঁস', কখনো 'অবাক জলপান', কখনো বা অমুকের বিখ্যাত 'কড়াপাক'! বিচিত্ররূপে তার প্রকাশ, বিচিত্র স্বাদে তার মহিমা। শুভ সংবাদে আমরা খেতে চাই, তত্ত্বে সন্দেশ না পাঠালে আমাদের মান থাকে না; বিয়ের ভোজে যেখানে ছ্যাঁচড়া-শাকভাজা থেকে প্ল্যাস্টিক চাটনি পর্যন্ত 'কমন'—সেখানে গৃহস্বামীর ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরোয় সন্দেশের বৈচিত্র্যে—সেইটিই হল তাঁর ওস্তাদের মার!

সন্দেশ-শিল্পী যাঁরা—তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থায় প্যাঁড়া তৈরি করবেন, সন্দেশের জন্যে সংরক্ষিত কলাবিদ্যা তাঁরা রাজভোগ-চমচমে নিয়োগ করবেন, ল্যাংচার সাদামাটা কৃষ্ণাঙ্গে হয়তো নানা ডিজাইনের ফুলপাতার আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু সন্দেশ আর থাকবে না। সে ইতিহাস হয়ে গেল। আর একমাত্র মহৎকীর্তির অধিকারীরাই তো ঐতিহাসিক মহিমা লাভ করে।

সন্দেশের এই মহতী বিনষ্টিতো কোনো বাঙালী উদাসীন আছেন কিনা জানতে কৌতূহল হল। প্রথমেই মনে পড়ল ডায়বেটিকদের কথা, একমাত্র তাঁরাই এ ব্যাপারে অনুদ্বিগ্নমনা এবং বিগতস্পৃহ হয়ে থাকতে পারেন। পরক্ষণেই চোখ পড়ল মিষ্টির দোকানের একটি ছোট্ট উপ-সাইনবোর্ডের ওপর : 'কবিরাজী সন্দেশ পাইবেন'।

কবিরাজী সন্দেশ! না, উক্ত বিশেষণে ভূষিত কাট্‌লেটের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কবিরাজী কাট্‌লেট খেলে অনেক সময় কবিরাজ ডাকতে হয়, কিন্তু সন্দেশ সম্পূর্ণ হাইজিনিক। অর্থাৎ চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিধি মেনে, শর্করা বর্জন করে, ডায়বেটিকের তৃপ্ত্যার্থে এটি নির্মিত।

সুতরাং সন্দেশ শুধু মিষ্টরসিকদের জন্যে নয়, যাঁরা স্বরচিত মাধুর্যে বাইরের মিষ্টির আস্বাদে বঞ্চিত, কবিরাজের বরাভয় নিয়ে সন্দেশ তাঁদেরও তাপিত চিত্ত শীতল করছিল। রসগোল্লা গেলে, চমচম উধাও হলে, রাজভোগের স্বর্গপ্রাপ্তি হলে, তাঁরা এতটুকুও ব্যথা পেতেন না। কিন্তু সন্দেশ একেবারে সকলকে শূন্য করে দিয়ে গেল। 'মছলী' এবং 'কড়ুয়া তেল' বর্জিত বাঙালী এতদিন তবু সন্দেশের মধ্য দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখছিল। এইবার সে তেলের নিরামিষ তরকারি আর প্যাঁড়া-

www.pathagar.com

লাড্ডু-পেঠা-সোনহালুয়া-পুরী-রায়তা-দহিবড়া নিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পঙ্ক্তি-ভোজনে বসে গেল।

অতএব আসুন, আমরা চব্বিশে অগাস্ট থেকে সাতদিন সম্মিলিতভাবে শোকদিবস পালন করি। আর চিত্তদাহ ভোলবার জন্য রসগোল্লা-রাজভোগ-লেডিকেনির ওপর হিংস্র আক্রমণ চালাই, অহোরাত্র খেয়ে খেয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলি—যাকে বলে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'।

অধ্যাপক ঘরে ঢুকে বললে, 'কী যা-তা লিখছ পাগলের মতো? সন্দেশ গেছে, হাড়ে বাতাস লেগেছে।'

'বলো কী!'—বাঙালীর ভেতরে যে এমন হিদেন ছিল তা আমার জানা ছিল না।

'তা ছাড়া কী! চার আনার সিকি সাইজের সন্দেশ, তা-ও বোধ হয় শঠীমেশানো। খেতে গেলে গলায় আটকে যায়। যেগুলো ভালো, তা কেনা তোমার আমার সাধ্য নয়। ও সন্দেশ থাকলেই বা কি, আর গেলেই কি। নুইসেন্স।'

'কিন্তু—'

'থামো, বেশি বকিয়ো না। জনাইয়ের মনোহরা? সবাই বলে সে জিনিস আর নেই। পানিহাটির গুপো সন্দেশ' লোকে বলে, সে আর তৈরি হয় না। "অমুক ময়রার কড়াপাক?" না মশাই—তেমনটি আর কোথায় পাবেন? আরে বাপু, আসলই যদি নেই, তবে আর নকল নিয়ে মাতামাতি কেন? তাকে যেতে দাও। চতুর্দশ লুই পর্যন্তই থাক, ষোড়শ লুইকে আর দরকার নেই।'

হুঁ, মোক্ষম যুক্তি! তাহলে গৌরব নিয়েই সন্দেশের মরা ভালো, অগৌরবের অপঘাত কোনো কাজের কথা নয়। 'দ্য কিং ইজ ডেড—লং লিভ দ্য কিং।'

২৮/৮/১৯৬৫

এই রচনাটি প্রকাশের কিছু আগে পশ্চিমবঙ্গে দুধের খুব আকাল হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আদেশে সাময়িকভাবে কলকাতায় সন্দেশ তৈরি ও বেচাকেনা বন্ধ থাকে।

লেখক-নামা

পুজো সংখ্যায় দেখছি উপন্যাসের দারুণ চাহিদা। টাকাও ভালোই পাওয়া যায় শুনেছি। সেই আশায় আমিও একখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছিলুম কিন্তু যেহেতু বাজারে সুনন্দর কোনো নাম নেই, সেজন্য কেউ তার উপন্যাসটা ছাপতে চাইল না।

কিন্তু তাই বলে আমি হাল ছাড়িনি। অনেকে তো একবছর আগে থেকেই শারদীয়া সংখ্যার তোড়জোড় করেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে, এবং আকৃষ্ট করবার জন্যও বটে এইখানে আমার উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করলাম। তাঁরা লক্ষ্য করে দেখবেন, আমার বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ মৌলিক—পুজো সংখ্যার লেখকদের নিয়েই আমি উপন্যাস লিখেছি। এ কাজ অবশ্য লেখকেরাই করতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের অনেকেই

www.pathagar.com

আত্মচরিত রচনায় কুণ্ঠিত, তা ছাড়া মার খাওয়ার ভয়ও তাঁরা করেন। আমি কিন্তু নিরপেক্ষ চিত্তে, অকুতোভয়েই লিখতে পেরেছি।

এই উপন্যাসটির আরো একটি গুণপনা, আশা করি, কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। আরো কিছু 'সংলাপিত' এবং 'সাংঘাতিক' করে একে বেশ মনোরম মঞ্চ-সফল নাটকে দাঁড় করানো চলে। এমনকি, সুনন্দর অদৃষ্টে শিকে ছিঁড়লে চমকপ্রদ একটি চলচ্চিত্রও হতে পারে। আপনারাই অনুধাবন করুন।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়

উপন্যাসের নায়ক হচ্ছেন লেখক নরহরিবাবু। নিরীহ ভদ্রলোক ভবিষ্যৎহীন একটা মাঝারি চাকরি করেন; বাজার করতে গিয়ে ওজনে ঠকেন এবং পচা মাছ কিনে থাকেন কিন্তু কপালগুণে জীবনের গভীরে যেতে শিখেছেন, ধারালো কলমে লেখেন, বাংলাদেশে কিছু শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ তাঁর লেখার জন্যে প্রতীক্ষা করে।

অতএব পুজো সংখ্যার প্রাক্কালে :

১। 'নরহরিদা আপনার একটা গল্প চাই-ই।'
২। 'আমাদের কিন্তু উপন্যাস দিতেই হবে। ছাড়ব না।'
৩। 'আপনার গল্প ছাড়া কোনো শারদীয়া সংখ্যা কল্পনাই করা যায় না।'
৪। 'লেখা না পেলে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করব দাদা, দরজা থেকে নড়ব না।' ইত্যাদি—ইত্যাদি।

ভদ্রলোক নরহরি ক্ষীণস্বরে বললেন, 'এত লেখা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

১। 'আপনার পক্ষে সব সম্ভব দাদা—আপনি লিখতে বসলেই গল্প বেরুবে।'
নরহরি আর্ত হয়ে জানালে, 'সে ভালো হবে না, ভালো হতে পারেই না।'
২। 'চমৎকার হবে দাদা, খাসা হবে।'
৩। 'নরহরিবাবু, অন্যে যে যাই বলুক, আমরা জানি—প্রত্যেক লেখাই ক্লাস।'
৪। 'আপনার কলমে ম্যাজিক আছে দাদা, একটা মরা প্রজাপতি নিয়ে তিনপাতা রিফ্লেক্‌শন লিখলেও প্রথমশ্রেণীর ছোটগল্পে দাঁড়িয়ে যায়। পুজো সংখ্যার সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন তো আপনিই।'

নরহরি করজোড়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমার শরীর ভালো নেই, আমি এত লিখতে পারব না—নিজের আনন্দে দুটো-একটা আমায় লিখতে দিন—

লেখা-প্রার্থীরা একজোটে নরহরিকে জাপটে ধরলেন।

'ছাড়ব না—ছাড়ব না—কিছুতেই ছাড়ব না—'

ভালোমানুষের দুর্গ্রহ যেমন হওয়া উচিত, নরহরির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। সবাই-ই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে গেলেন। শুধু নরহরির স্ত্রী রক্তচক্ষে বললেন, 'এত লিখবে কী করে?'

www.pathagar.com

নরহরি কখনো ভগবানের নাম ভাবেননি। আজ আকাশে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'উনিই ভরসা।'

তৃতীয় অধ্যায়ের অতিরিক্ত শেষাংশ

৫। 'নরহরিবাবু, আমাদের নয় টাকাই নেই; তাই বলে কি একটা লেখা আমরা পাব না?'

৬। 'ডাইনে বাঁয়ে তো টাকা কামাবেন, আমাদের কাছ থেকে নাই বা নিলেন।'

৭। 'কিন্তু একটা গল্প আমাদের চাই-ই। ফ্রী।'
নরহরি চিঁ চিঁ করতে লাগলেন, 'দোহাই আপনাদের, আমি—'
সমস্বরে ধ্বনিত হল : 'দিতেই হবে, ছাড়ব না—'

৮। 'ঠিক আছে, নতুন কিছু দিতে না পারেন, আপনার পুরনো লেখাই রিপ্রিন্ট করব আমরা।'

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়

পুজো সংখ্যাগুলো বেরিয়ে গেছে। পাঠকেরা কী পড়ছেন না পড়ছেন তাঁরাই জানেন; কিন্তু 'শারদীয়া সাহিত্যে'র "বিদগ্ধ" (বিশেষরূপে দগ্ধ ইত্যর্থে) সমালোচনা, ডি-ফিল অ্যান্ড কোং-দের কলম থেকে অগ্নিবাণের মতো বেরিয়ে আসছে। কিন্তু অধ্যাপকদের সমালোচনায় নরহরি অবিচল, কারণ ভূয়োদর্শনে তিনি জেনেছেন যে সৎসাহিত্যের অপাঠ্য ভাষ্য রচনাই অধ্যাপকীয় প্রতিভার চরম।

তাঁর বেদনার কারণ—পূর্বপরিচিত ১ থেকে ৮ নম্বর পর্যন্ত, যাঁরা লেখার জন্যে তাঁর কাছে তাগাদা দিয়েছিলেন, এখন তাঁরা স্বনামে—অনামে—বেনামে সমালোচনার পুণ্যকার্যে ব্রতী।

১। 'অতিরিক্ত লিখলে যা হয় তাই, নরহরি ঘোষের সব গল্প অপাঠ্য।'

২। 'পুজো সংখ্যায় নরহরি ঘোষের উপন্যাস পড়ার চাইতে তিন বছর সশ্রম কারাবাস বাঞ্ছনীয়।'

৩। 'নামী লেখকেরা—যথা নরহরি ঘোষ—যে-সব কাগজে লেখেন, সেগুলো বর্জন করলেই পাঠকেরা যথার্থ রসবোধের পরিচয় দেবেন—'

৪। 'টাকার জন্য নরহরি ঘোষেরা যে লেখক হিসেবে কত নীচে নামতে পারেন—'

৫। 'পুরনো লেখা নতুন করে ছেপে পাঠকদের ঠকাতে নরহরি ঘোষের দল—'

সপ্তম অধ্যায়

একটি শোকসভার মতো দৃশ্য। বাঙালী লেখকেরা চোরের মতো দল বেঁধে বসে আছেন, বলা বাহুল্য নরহরিও আছেন তাঁদের ভেতর। প্রত্যেকেই প্রাণপণে বলবার চেষ্টা করছেন যে, অন্যের চাইতে তিনি কম লিখেছেন অতএব অবধ্য। স্নায়বিক

www.pathagar.com

দুর্বলতার তাড়নায় সবাই নিজের লেখার ভয়েই সন্ত্রস্ত—শেষ পর্যন্ত সমবেতভাবে নরহরিকে 'Scape goat' করে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

অষ্টম অধ্যায়

চিৎকার করে নরহরি বলছেন, 'আসছে পুজোয় আর আমি লিখব না—লিখব না—লিখব না—'

স্ত্রী তিক্ত হাসি হেসে বললেন, 'দশবছর ধরেই শুনে আসছি এই কথাটা।'

সুনন্দর এই উপন্যাস এপিক। শুধু প্রথম খণ্ডের সারমর্ম দেওয়া গেল। যদি কোনো প্রকাশক উৎসাহিত হন তাহলে 'লেখকমেধ' নামে দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্তসার পরে নিবেদন করা যাবে। আপাতত আশা করি পুজো সংখ্যার কোনো লেখক এর প্লটটি মেরে দেবেন না।

২৫/৯/১৯৬৫

নির্জনতার আনন্দে

তখন আকাশে, মাটিতে, স্বর্গে, মর্তে অনন্ত শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই শূন্যতার রঙ নেই, স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই—শুধু স্রষ্টার মহাচৈতন্যের এক স্পন্দনহীন স্পন্দন ছাড়া বস্তুর চিহ্নমাত্রও নেই। বহুযুগ এইভাবে বয়ে যেতে যেতে একদিন সেই শূন্যতাব্যাপী মহাচেতনা ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। এই নিঃসঙ্গতার ভার আর সহ্য হয় না—অতএব 'আমি বহু হইব'।

দেখতে দেখতে সমীরিত হল দখিন বলয়, উচ্ছ্রিত হল পাহাড়, উদ্গীত জাগল সমুদ্র-তরঙ্গে, উল্লোলিত হল মৌন অরণ্য। জীবাণুর সঞ্চার জীবের সঞ্চরণ। সশব্দ আর নিঃশব্দ কোলাহলে, জৈবিক আর আরণ্যক চঞ্চলতায়, জড় আর চেতনের ঐকতানে পৃথিবী উদ্বেলিত হল। নিঃসঙ্গতা কোথাও রইল না—এমনকি মরুভূমির মৃত-পঞ্জরেও অলক্ষ্য—অগণ্য জীবনবিন্দু সীমূখের ক্ষ্যাপা ডানায় ভর দিয়ে উড়ে চলতে লাগল। তা হলে বিশ্বপ্রকৃতিতে কোলাহল, কলহ, ভিড় (এমনকি মহাশূন্যও শূন্য নয়—সেখানে বিচিত্র রশ্মির বিকিরণ) তার দিনের জীবন নীরব হয়ে গেলে, রাত্রির জীবন জাগ্রত। একজন ফরাসী লেখকের লেখায় পড়েছিলুম দিন হল 'অ্যাৎর' অর্থাৎ প্রাণীর জন্যে; আর রাত্রির ওপর 'শোজ্' অর্থাৎ বস্তুর অধিকার। সবাই জীবিত, সবাই মরব। যে কথা বলছিলুম—স্রষ্টা কোথাও কারো জন্যে নিঃসঙ্গতা রাখেননি, কখনো নয়, কোথাও না।

আমার এই গভীর গম্ভীর আলোচনায় নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন এবং হঠাৎ কেন যে এই ধরনের উচ্চচিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে এ নিয়ে আপনাদের মনে নানা কূট প্রশ্ন জাগছে। তা হলে কারণটা সরল বাংলাতেই খুলে বলি। আমি শ্রীভগবানের ইচ্ছার

www.pathagar.com

বিরোধিতা করেছিলুম—অর্থাৎ কামনা করেছিলুম নির্জনতার। কিন্তু নিঃসঙ্গতা যেমন প্রকৃতির ধর্ম নয়; তেমনি নির্জনতাও মানুষের স্বভাববৃত্তি হতে পারে না। মাটিতে মাথা দিয়ে হাঁটতে গেলে যেমন বিপর্যয় অনিবার্য, সেই রকম যে যা নয় তার পক্ষে তাই হতে যাওয়া একেবারে আগ-বাড়িয়ে ট্রাজিডিকে ডেকে আনা।

তরুণ বয়সে ম্যাথু আর্নল্ডের একটি কবিতা পড়েছিলুম। তাতে বোধ হয় এইরকম কিছু বাণী ছিল (এতদিন পরে লাইনগুলো আর মনে আসছে না): 'দ্যাখো বন্ধু, মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কখনোই দোস্তি হতে পারে না। প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনেই বাঁচে—আমাদের বাঁচতেও বাধা দেয় না। সূর্যটাকে সে জ্বালিয়ে রেখেছে সকলের উপকারার্থেই—ব্যস্—এর বেশি কিছু আর আশা কোরো না।'

বলা অনাবশ্যক অল্পবয়সে এই বক্তব্য ঠিক পছন্দ হয়নি। কারণ তখন অভিভাবকের শাসনে কলেজে পড়বার আভিজাত্য ভুলে গিয়েও সন্ধ্যার পরেই বাড়ি ফিরতে হত এবং আমাদের এই মফঃস্বল শহরেও কংক্রিটে বাঁধানো রাস্তা আর ইলেকট্রিকের আলো ছিল। কাজেই নির্জনতার স্বপ্ন এতদিন নিশ্চিন্তে লালন করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি জ্ঞানবৃক্ষের একটি ফল চর্বণ করবার পরে আমি আর নির্জনতা-বিলাসী নই। আমার মনে আপাতত যে ভাবোদয় ঘটেছে এই লেখার সূচনায় তারই পরিচয় আপনারা পেয়েছেন।

শাল, মহুয়া, পাহাড়, টিলা, পাহাড়ী নদী, ধানক্ষেত, পাখি; আর এদের ভেতরে ফল ফুলের বাগানে সাজানো ছিমছাম বাড়িটি নির্জন-বাসের পক্ষে নিশ্চয় আদর্শ, এমন স্বভাব-কবি যদি কেউ থাকেন—তাঁর কায়িক প্রয়োজন নাম মাত্র, তাহলে ছ-মাস তিনি এখানে বাস করে কাগজের বাজারে টান ধরিয়ে দিতে পারেন। তাঁকে প্রণামান্তে সুনন্দর নিবেদন, কখনো কখনো প্রো-কলকাতা প্রশস্তি দরকার, এমনকি পিণ্ডি খেজুরের মতো মানুষের পিণ্ডি মাখানো বড়বাজারও সানন্দে বন্দনীয়।

এই নির্জনতায় যা যা আনন্দ পাচ্ছি, সংক্ষেপে তার কিছু তালিকা দিই :

১। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন; সাতদিন খবরের কাগজ পড়িনি। সংবাদপত্রে আমার অনীহা এর কারণ নয়; আসলে কাগজ আমি জোগাড় করতে পারিনি।

২। সকালে চা খেতে গিয়ে পাউরুটির দরকার পড়ল। রুটি অবশ্যই পাওয়া যাবে, কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে। ভোরবেলায় মাইল সাতেক মর্নিংওয়াক এমন কী আর শক্ত কথা।

৩। একটি দেহাতী সরল ব্যক্তি সাড়ে পাঁচ টাকা সের দরে মাছ বিক্রি করে যায়। মাছ নাকি সে নিজেই ধরে। চোখে-মুখে তার শালবন আর পাহাড়ী নদীর পবিত্রতা। সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি, সাড়ে তিন মাইল দূরের শহর থেকে চার টাকা সেরে মাছ কিনে আনে এবং যে মাছ সে দেড় সের বলে চালায়—আসলে সেটি তিন পোয়া। গ্রাম্য সরলতা বোধ হয় একেই বলে।

৪। কাল রাত্রে প্রাচীরের ওপর থেকে কাঁটাতারের বেড়া টপকে, কে যেন নীচে লাফিয়ে পড়েছিল। খুব সম্ভব কেউ বাড়ি ভুল করেছিল—অবোধ গ্রাম্য মানুষ কিনা! অথবা

www.pathagar.com

অনেক রাত্রে পরের বাড়ির প্রাচীর টপকাতে কেমন লাগে—কেউ সেটা পরীক্ষা করে দেখছিল। কিন্তু আমাদের শহুরে পাপ-মনে নানা সন্দেহ জেগেছে—আমরা নির্জনতার সুখে নিদ্রামগ্ন থাকলে সে কেবল পাঁচিল টপকে ফিরে যেত এরকম ভরসা হচ্ছে না।

৫। সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ এই যে সকালে একজন পুলিশ কন্‌স্টেবল এসে সেলাম দিয়েছে থানা থেকে। তার দেওয়ালী বক্‌শিশ চাই এবং সে নাকি দু'টাকার কমে বক্‌শিশ ছোঁয় না। তাকে আগন্তুকের সংবাদ জানাতে তাচ্ছিল্য ভরে বললে, 'চোর-উর হোগা'। 'তুমি আছো কি জন্যে?' সে আছে বোধ হয় বক্‌শিশের জন্যে, কিন্তু তা আর মুখে বললে না, একটু হুঁশিয়ার থাকবার উপদেশ দিয়ে গেছে।

অবশ্য নির্জনতা সুখ—অর্থাৎ শাল মহুয়ার বন, পাখির ডাকটাক, এগুলো সব ঠিক আছে। রাত্রে লাখ মশা ছেঁকে না ধরলে মহামৌনের ধ্যানেও বসা যেত। কিন্তু আর পেরে উঠছি না। আপাতত সাড়ে তিন মাইল দূরে একখানা দাড়ি-কামানোর ব্লেড আনতে যেতে হবে; সেই চিন্তাতেই ওপরের গভীর-গম্ভীর থীসিসটি বেরিয়ে এসেছে। ভাবছি, কলকাতায় ফিরে বড়বাজারের বন্দনাই লিখব।

৩১/১০/১৯৬৫

মিখাইল শলোখভ

প্রত্যেকবার যেমন হয়, এ বছরও সাহিত্যের সেই শিকেটি—অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার নিয়ে, বিস্তর গবেষণা চলেছিল। কোন লেখকের জন্যে কে কে তদ্বির করছেন, কোন ভারতীয় কবির কবিতা পাঠ করে দ্বিতীয়বার ইউরোপের সমালোচকেরা রসস্থ হয়ে উঠেছেন (বলা বাহুল্য, প্রথমবারে এই কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের), কোন বাঙালীর 'সুপারহিট' উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে জয়যাত্রায় চলল—খবরের কাগজে এবং লোকমুখাৎ এইসব নানা রোমাঞ্চকর স্পেকুলেশন চলছিল। শেষ পর্যন্ত সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দিয়ে পুরস্কার পেলেন বনেদী রুশ লেখক মিখাইল শলোখভ—যার লেখার সঙ্গে কম করেও সাতাশ-আটাশ বছর ধরে, বাঙালী পাঠকের পরিচয় আছে। আপাতত কয়েকমাস তদ্বিরকারীরা নিশ্চিন্ত থাকুন, হিন্দী কবি আরো গভীর এবং আন্তর্জাতিক কবিতা লিখে প্রস্‌পেক্‌ট তৈরি করুন, বাঙালী ঔপন্যাসিকের কীর্তিস্তম্ভ রিমখানেক কাগজে টাইপ হতে থাকুক, আরও বিচক্ষণেরা সুইডিশ অ্যাকাডেমিতে 'দালাল' (কথাটা স্ল্যাং মনে হলে আমাকে মার্জনা করে 'গুণগ্রাহী' ব্যবহার করতে পারেন) পাঠিয়ে জমি তৈরি করতে থাকুন, এর মধ্যে আমরা আবার নতুন করে শলোখভ পড়তে আরম্ভ করি।

বোরিস পাস্তেরনাক কেন নোবেল পুরস্কার নিলেন না আর কেনই বা তা 'কৃতজ্ঞচিত্তে' গ্রহণ করলেন শলোখভ, এ নিয়ে অনেক জটিল আলোচনা উঠতে পারে, নানারকম রাজনৈতিক কূট-কচাল দেখা দিতে পারে। ও-সব ঘোরতর

www.pathagar.com

ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। পাঠক হিসেবে শলোখভের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি আমার ভালো লেগেছে। আমি খুশি হয়েছি।

লেখক শলোখভের জায়গা ঠিক কোনখানে, আমি জানি না। আমার হাতে বিশ্বসাহিত্যের একখানা বৃহৎ ইতিহাস রয়েছে, তাতে শলোখভের নামোল্লেখ পর্যন্ত দেখলুম না অথচ ছেলেমানুষ দুদিন্‌ৎসেভের 'নট বাই ব্রেড অ্যালোন'-এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেল। অতএব বিশ্বপণ্ডিত রসজ্ঞদের বিচারে শলোখভ বোধ হয় খুব বড়ো লেখক নন। কিন্তু 'ডন-ট্রিলজি' আর 'ফেট অভ এ ম্যান'-এর স্রষ্টা আলেক্সি তলস্তয়ের মতো সাধারণ পাঠকের বল্লভ লেখক হতে বাধা নেই। মিখাইল শলোখভ আমাদের প্রাত্যহিক পরিচিত জীবনের মধ্যে উত্থিত করেন, তার ক্রোধ-প্রেম-হিংসা-কামনা-প্রত্যাশা-পরাভবের স্পর্শ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন, আমাদের মোটা রেখার সত্যগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেন—সেইখ্যানেই তিনি আমাদের চিত্তজিৎ।

পণ্ডিতেরা অব্যাপারী সুনন্দর ধৃষ্টতা মাপ করবেন, রুশ-সাহিত্য পড়তে গিয়ে ক্রমাগত মনে হয়, কোথায় যেন বাঙালী মনের সহমর্মিতা আছে। এই কারণেই লিও তলস্তয় আগের যুগের বাংলা উপন্যাসে এত প্রভাব ফেলেছেন, বাঙালী রাজবন্দীরা জেলে বসে এত বেশি দস্তয়ভ্স্কি পড়েছেন, গোর্কীর 'মা' আমাদের দেশপ্রেমকে এমন উদ্দীপিত করেছে, আন্দ্রেভের 'যে সাতজনের ফাঁসি হল' যেন বাঙালী বিপ্লবীদেরই কাহিনী, তুর্গেনেভ যেন শরৎচন্দ্রের মেজাজে বাঁধা। বিশুদ্ধ ইউরোপীয়েরা রুশদের 'এশিয়াটিক' বলে বিদ্রূপ করে থাকেন—খুব সম্ভব সেই কারণেই এশিয়ার দূরপ্রান্তে একটি বাংলাদেশ রুশ-সাহিত্যের সঙ্গে তার মর্ম-মর্মর অনুভব করে।

আমি সমালোচক নই। কিন্তু পাঠক হিসেবে শলোখভ পড়তে পড়তে এই মর্ম-সম্বন্ধ অনুভব করেছি। ডন-কসাকদের আমরা কখনও দেখিনি, গ্রেগর-বান্‌চুক-আক্সিনিয়া অনেক দূরের, দেভিদভ অন্য জগতের মানুষ, নাৎসী শিবিরের বন্দী রুশ সৈনিকটি (নাম মনে পড়ছে না) পালিয়ে আসবার পরে সব শূন্যতার মাঝখানে যে নবজীবনের সন্ধান পেল—তা-ও হয়তো আমাদের অপরিচিত। তবুও সব ছাপিয়ে কী গভীর অন্তরঙ্গতার স্বাদ মেলে—কী নিবিড় ঐক্য অনুভব করা যায়।

হয়তো এইটেই মহৎ শিল্পের চারিত্রিক-লক্ষণ, দেশ-কাল-জাতি অতিরেকী তার ব্যাপ্তি। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদের মতিগতি দেখে মনে হয়, তাঁরা শলোখভকে মহান শিল্পী বলে গণ্য করেন না। অতএব আমরা যারা 'অদীক্ষিত' পাঠক—তারা সমমর্মিতা দিয়েই তাঁকে বরণ করলুম।

শলোখভ পড়বার প্রথম অভিজ্ঞতা আমার বিচিত্র। তখন ছাত্রজীবন। কলকাতার এক মেসে, পাশের বিছানার বন্ধু দারুণ জ্বরে অর্ধচেতন—আমি রোগীর কাছে প্রহর জাগছি। ঘুমন্ত কলকাতার সেই কতকগুলো পরিচিত শব্দ—শবযাত্রার হরি বোল, গঙ্গায় জাহাজের বাঁশি, পুলিশের জুতোর মচমচানি, কুকুরের ডাক, এক-আধটা গাড়ির আওয়াজ—আর মধ্যে মধ্যে স্ফুট-অস্ফুট কিছু বিচিত্র ধ্বনি—যাদের অর্থ বোঝা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয়—তারই ভেতরে বসে যে বইটি

www.pathagar.com

আমি পড়ছিলুম সেটিও অপূর্ব! ডনত্রয়ীর মধ্যম খণ্ড—যার ইংরেজী নাম :'ভার্জিন সয়েল আপ্‌টার্নড্‌'।

সবাই জানেন, ত্রয়ীর ভেতরে এই খণ্ডটি একেবারে বিচ্ছিন্ন, মূল দুটির সঙ্গে সম্পর্করহিত, হয়তো সাহিত্য-হিসেবেও কিছু নীরস, ল্যাকোনিক হয়ে বলা যেতে পারে 'কৃষি-সমবায়ের' প্রোপ্যাগ্যান্ডা। তবু কী কৌতূহল নিয়ে, কী তন্ময়তা নিয়ে উপন্যাসটি আমি পড়েছিলুম, সে-কথা আজও ভুলতে পারিনি। কালেক্‌টিভ্‌ ফার্মিং-এর ভালোমন্দ, কুলাক্‌দের চক্রান্ত, রুশ কৃষকের এই নব্য-ব্যবস্থায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এ-সবই আমার বিচার আর অভিজ্ঞতার বাইরে—তবু কী যে আকর্ষণ সে-লেখায়! যখন ভোরের প্রথম কাক ডাকল তখন উপন্যাস আমার শেষ হয়েছে, রোগীরও জ্বর নেমে গেছে।

বিকর্ষণ সৃষ্টি করাই নাকি এ-কালের কথাসাহিত্যে শক্তির স্বাক্ষর, পাঠককে ক্রমাগত আঘাত করাই নাকি লেখকের কৃতিত্ব। হতে পারে, অন্তত এ-যুগের বিদেশী উপন্যাস পড়তে গিয়ে এই 'নশিয়া'র স্বাদ প্রায়ই মেলে। সেদিন দাঁড়ি-কমাবর্জিত এবং প্রচুর ফুট্‌কি-চিহ্নিত একখানি ফরাসী উপন্যাস হাতে এসেছিল, তার প্রত্যেক প্যারাগ্রাফে গা-গুলোনোর সর্বাত্মক আয়োজন। এই যদি কালধর্ম হয়, তা হলে আকর্ষক শলোখভের সাহিত্যের দরবারে কল্‌কে পাওয়া শক্ত। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু পাঠকও আছে যারা জীবনের দৈনন্দিনতাকে, তার আশা-স্বপ্ন—ব্যর্থতা-বিকারকে মোটা রেখায় পেতে যায়—যারা উদ্দীপিত হয়, যাদের চোখে জল আসে, যাদের আবেগ আলোড়িত হয়, যারা সমাধির উপর পাখির নীড়ে নতুন শাবকের স্বপ্ন দেখে।

শলোখভ তাদেরই লেখক।

এ-যুগের পাঠক শলোখভকে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। নোবেল-পুরস্কারের উপলক্ষে তিনি হয়তো পুনরপি উদ্‌ঘাটিত হবেন। পুনর্বিচারে শিল্পীর মহিমা কতখানি পাবেন জানি না, কিন্তু আমার মতো অনেকের কাছে এই 'স্থূল' জীবনের গভীর স্বাদ নতুন করে ফিরিয়ে আনবেন তিনি।

৬/১১/১৯৬৫

শেষ 'গল্প'-লেখক

পৃথিবীর শেষ গল্প-লেখক আর গল্প লিখবেন না।

অবশ্য লেখা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। 'ক্যাটালিনা' তাঁর শেষ উপন্যাস, 'ক্রেচারস অভ সারকামস্ট্যান্স' খুব সম্ভব তাঁর শেষ গল্পের বই। তারপর 'ইভল-আই' নামীয় সেই বিশেষ প্রতীকচিহ্নটির বৃত্তের মাঝখানে বসে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের ভেতর, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেই গল্প-লেখক—সাহিত্য-চর্চা করে যিনি দু'লক্ষ পাউন্ডের অধিকারী হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সমারসেট মম গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেকদিন। তবু মনে হত, তিনি গল্প আবার লিখবেন। যে-কোনো দিন, যে-কোনো সময়। 'ইংল্যান্ডের মোপাসাঁ' (এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন)-র কলমে আবার ঝকঝক করে উঠবে উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ ভাষা, লেখার রেখায় ফুটে উঠবে চরিত্র, প্লটের চাতুর্যে চমকে উঠবে পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা। শেষ নিশ্বাস পড়বার আগে স্রষ্টার সমাপ্তি তো কোথাও নেই।

তবু সেই সমাপ্তিই এল। মম আর গল্প লিখবেন না।

অবশ্য এই ঘোষণা তাঁরই জবানীতে এর আগে একবার শোনা গিয়েছিল, অথচ তখন কলম বন্ধ করবার কোনও বাসনাই সমারসেট মমের ছিল না। তখন তাঁর 'দ্য মিক্‌শচার অ্যাজ বিফোর' বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। কাজের ঝঞ্ঝাটে বিব্রত মম তাঁর বন্ধু এডোয়ার্ড মার্শকে বইটির প্রুফ দেখে দিতে বলেছিলেন। ভূমিকার প্রুফ দেখে মার্শ এসে সনিশ্বাসে বললেন, 'ভারী দুঃখিত হলুম হে, তুমি আর গল্প লিখবে না।' মম কথাটা শুনেও শুনতে পেলেন না, কাজের চাপে তিনি তখনও উদ্‌ভ্রান্ত। তারপর মাস তিনেকের জন্যে চলে গেলেন আমেরিকায়; না চোখে পড়ল নিজের বই, না তার কোনো সমালোচনা। ফিরে এসে নিজের বইয়ের মুখবন্ধ খুলে তিনি চমকে গেলেন : "I shall not write any more stories!"

এ কী করে হয়? লেখনিক-বানপ্রস্থের সংকল্প তো তিনি করেননি। পাণ্ডুলিপির খোঁজ পড়ল। তখন ধরা পড়ল আসল রহস্যটি। মম সকৌতুকে লিখেছেন : 'I had written : "I shall not write many more stories," and either the typist or the type-setter thinkin perhaps that I had written quite enough stories, had left out an m, so that—'

সারাজীবন গল্পের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেছেন সমারসেট মম। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার সেই গ্রন্থ-চূড়ায় বসে রক্তের ভেতরে অনুভব করেছেন মোপাসাঁর অনুপ্রেরণা, ইংরেজের চারিত্রিক নিষ্ঠা নিয়ে লড়াই করেছেন চেখভের সেইসব ভাবশিষ্যদের সঙ্গে—যাঁরা পৃথিবীর গল্প-সাহিত্য থেকে 'গল্পতত্ত্ব'কে বিদায় করবার জন্য তৎপর। তাই গল্প-তাপস মমের জীবনেও গল্পেরা বারবার দেখা দিয়েছে।

গল্প ছাড়া কী আর! ডাক্তারি পাস করলেন, কিন্তু ডাক্তার হলেন না—হতে চাইলেন সাহিত্যিক। কিন্তু এগারো বছর ধরে চলল একটানা ব্যর্থতার ইতিহাস। বেরুল 'লিজা অভ ল্যামবেথ', লিখলেন 'দ্য বিশপ্‌স্ অ্যাপ্রন', ছাপা হল গল্পের বই 'অরিয়েন্টেশন্‌স'—কিন্তু তখনও রুটির সংস্থান পর্যন্ত হয় না। চাকরি খুঁজে বেড়ান সাহিত্য-পত্রিকায়, বন্ধুরা উপদেশ দিয়ে বলেন, 'ছেড়ে দাও সাহিত্য—না-খেয়ে মরবে নাকি শেষ পর্যন্ত। ডাক্তারিই ধরো—সাহিত্যের পথ তোমার জন্য নয়।'

কিন্তু তারপরে আবার গল্প এল।

গল্প এল সেই রাত্রে—যেদিন জন কলটন তাঁর অতিথি! শোওয়ার সময় কলটন বললেন, 'নতুন গল্প কিছু আছে নাকি? ঘুমুবার আগে পড়তে চাই।'

www.pathagar.com

একটা গল্পের প্রুফ এসেছিল সেদিন। 'স্যাডি টমসন'। বন্ধুকে সেটি পড়তে দিলেন মম।

সকালে উত্তেজিত হয়ে দেখা দিলেন কলটন। চেহারা বিশৃঙ্খল, চোখ জাগরণে আরক্তিম। বললেন, 'এই তোমার ঘুম-পাড়ানো গল্প? সারাটা রাত এই হতভাগা গল্প আমাকে জাগিয়ে রেখেছে। তোমার স্যাডি মাথা খারাপ করে দিয়েছে আমার। আমি নাটক করব একে।'

'নাটক?'—অবিশ্বাস-কুঞ্চিত মুখে মম বললেন, 'তা হতে পারে মর্বিড ধরনের একটা কিছু। চলতে পারে হপ্তা ছয়েক। ও নিয়ে মিথ্যে মাথা ঘামিয়ো না। কোনও মানে হয় না।'

কিন্তু কলটন শুনলেন না। গল্পটিকে নাটক করলেন তিনি। একটির পর একটি মঞ্চ সে-নাটক ফিরিয়ে দিতে লাগল। চলবে না—এ গল্প চলবে না।

শেষ পর্যন্ত নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন স্যাম হ্যারিস—নতুন নায়িকা জীন ইগলসকে স্যাডির ভূমিকায় সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাতেও বাধা এসেছিল। তারপর যখন সেই নাটক ব্রডওয়েতে মঞ্চস্থ হল শেষ পর্যন্ত, তখন মমের গল্পও নয়—ও-হেনরির চমকপ্রদতম গল্পের মতোই সমাপ্তি ঘটল তার। রাতারাতি জীন বিখ্যাত হলেন, মম উঠলেন অর্থ এবং যশের স্বর্ণশিখরে।

সেই নাটকের নাম 'রেন'। একবার নিউইয়র্কের নাট্য-সমালোচকেরা গোপন ভোটে পৃথিবীর দশটি শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। সবচাইতে বেশি ভোট পেয়েছিল 'হ্যামলেট', দ্বিতীয়ের গৌরব শেক্‌স্‌পীয়র-ইবসেন—হাউপ্‌ট্‌মান-শ কারো নাটক পায়নি—'রেন'ই পেয়েছিল।

এখানেও সেই গল্প। পৃথিবীর দ্বিতীয় মোপাসাঁ প্রতিষ্ঠা পেলেন গল্পে নয়, নাটকে। সে নাটকও তাঁর নিজের লেখা নয়। তারপর ধুলো-মুঠি সোনা হওয়ার ইতিহাস।

অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন মম, বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন অনেকগুলো : 'দ্য মুন অ্যান্ড সিক্‌স পেনস', 'অভ হিউম্যান বন্ডেজ', 'দ্য পেন্টেড ভেল', 'দ্য রেজর্স এজ', সাহিত্য-পাঠকদের দিয়েছেন একটি আশ্চর্য বই : 'এ রাইটার্স নোট বুক'। তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্পের আকর্ষণ অসামান্য। 'চেতনা-প্রবাহ' নয়, 'মুডে'র অভিব্যক্তি নয়, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূক্ষ্মতম কারুকার্যও নয়—গল্পই তাঁর আসল শিল্প। তিনি বিশ্বাস করেছেন জীবন গল্পময়—তার আরম্ভ আছে, তার মধ্য আছে, তার সমাপ্তিও আছে। সব খণ্ডেই অখণ্ডের একটি পারম্পর্য রয়েছে—কেবল তাকে দেখবার চোখ চাই, তাকে আবিষ্কার করবার শক্তি চাই।

এ-কালের লেখকেরা আর এ-কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা গল্প থেকে গল্পত্ব বর্জনের সংকল্প নিয়েছেন। কিন্তু এ-কালের পাঠকেরা? তাঁরাও কি আর গল্প চান না? সমারসেট মমের অনুরাগীরাও কি ফুরিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে?

আমার সন্দেহ হয়।

www.pathagar.com

আপাতত সুনন্দর দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। এ-কথা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না যে, শেষ 'গল্প-লেখক মম' আর গল্প লিখবেন না আমাদের জন্য।
১/১/১৯৬৬

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উইলিঅম সমারসেট মম-এর তিরোধান উপলক্ষে নিবন্ধটি লিখিত। মম-এর জন্ম ১৮৭৪ সালে।

একটি যান্ত্রিক যন্ত্রণা

বার বার সাতবার!

অতএব কার্ডোজা নামে সেই মানুষটি একটা গগনভেদী চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ক্রিস্‌মাসে কেনা সাধের ফনোগ্রাফটিকে মেজেতে ছুড়ে ফেলল, 'ত্রিস্তান আর ইসোল্‌ড্'-এর নতুন রেকর্ডের সেট্‌টা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। টেলিফোনের রিসিভার তুলে খানিকটা অকথ্যতম গালাগাল করে, শেষ পর্যন্ত টেলিফোনটাকে দা দিয়ে কোপাবার জন্যে কার্ডোজা যখন উদ্যত সেই শুভলগ্নে পুলিশ এসে পড়ল। কার্ডোজাকে গ্রেপ্তার করা হল। পরের অধ্যায়ে কী ঘটল—খবরের কাগজে মার্কিনী বার্তার সেই অংশটুকু পাওয়া যায়নি।

অকস্মাৎ কার্ডোজা নামে এই নিরীহ নাগরিকটি এই ধূর্জটিনৃত্য আরম্ভ করল কেন—স্বভাবতই এ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে। আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ—যাদের হৃদয়ে বৃহত্তর-মহত্তরের কোনো অভীপ্সা নেই, তাদেরও দুটো-একটা আকাঙ্ক্ষা মনের গভীরে লালিত হতে থাকে—যাকে বলা যায় 'অ্যাম্বিশন'। যেমন বর্ষার বিকেলে চায়ের সঙ্গে দুটো গরম কাটলেট, নিদেনপক্ষে এক প্লেট ফুলুরি, কিংবা গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে দক্ষিণী হাওয়ায় হাত-পা ছড়িয়ে একটি আইসক্রীম, নইলে ডায়মন্ডহারবারের গঙ্গার ধারে বসে টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে সপরিবারে একটুখানি 'মধ্যবিত্ত লাঞ্চ'—ইত্যাদি ইত্যাদি। কার্ডোজারও এমনি একটা নিবিড় গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। 'ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা'-ও নয়, সে চেয়েছিল এমন একটা প্রশান্ত অবসর—যখন নিভৃতে বসে, বিনা বাধায় 'ত্রিস্তান আর ইসোল্‌ড্'-এর চার সেট রেকর্ডটি সে পরম আনন্দে আস্বাদন করতে পারে।

এই সুখটুকু 'অতি সহজ সরল'—কিন্তু দেখা গেল, যত সোজা মনে হয়েছিল ব্যাপারটা, আদৌ তা নয়। এর আগে ছত্রিশবার সে মেশিনে রেকর্ড চড়িয়েছে, কিন্তু কোনোবারই প্রথম পিঠটার ওপারে যেতে পারেনি, ঝনঝন করে টেলিফোন বেজেছে, তাকে উঠতে হয়েছে ফোন ধরতে—সুর কেটে গেছে। আর সাঁইত্রিশতম চেষ্টার সময় আবার টেলিফোন, এবং তারপর যা ঘটেছিল তা আগেই বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

আজকের এই ফোনটা এল সপ্তমবার। কার্ডোজার বালিকাকন্যার ছয়বার খোঁজ করছে তার একটি বালক-বন্ধু। কন্যাটি বাড়িতে নেই—এই খবর জানাবার জন্যে কখনো কার্ডোজাকে খাওয়া ফেলে উঠতে হয়েছে, কখনো দিবানিদ্রা চটকে গেছে, কখনো টেলিভিশনে গল্‌ফ-ম্যাচ দেখায় বাধা পড়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত 'ত্রিস্তান আর ইসোল্‌ড়'—

অতএব, 'এই অবধি, এবং আর নয়!' এইবারে প্রলয়োল্লাস। ফনোগ্রাফ বিধ্বস্ত, রেকর্ড চুরমার, সমস্ত ভব্যতা-বর্জিত আদিম ইয়াংকী গালাগাল (ও-বস্তুটি যে শুনেছে সে-ই জানে যে, ওর কাছে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যও ম্লান হয়ে যায়), কর্নেই-র নাটকে পলিয়োক্‌তের মতো, অস্ত্র নিয়ে, প্যাগান দেবতার বদলে টেলিফোনকে আক্রমণ—'ভাঙনের জয়গান গাও'!

নিজের রেকর্ড ভাঙবার অধিকার—মৌলিক অধিকার—কার্ডোজার নিশ্চয়ই আছে। টেলিফোন ভাঙলে তার ফয়সালা করবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী। পুলিশ কার্ডোজাকে ধরেছে অন্য কারণে—টেলিফোনে অকথ্য অশ্লীল ভাষা ব্যবহারের অপরাধে।

বেচারী!

আমরা যারা চাকরিজীবী বাঙালী—আমাদের ঘরে মার্কিনীদের মতো দৈনিক গড়পড়তা ৮৯টি কল কখনো আসে না এবং তার মধ্যে ৮০টি-ই অপ্রীতিকর নয়। তবু স্বীকার করতে বাধা নেই—কার্ডোজার জন্যে আমরাও অন্তরে অন্তরে সহানুভূতি বোধ করছি, তার সঙ্গে নিবিড় একটি আত্মিক ঐক্যও অনুভব করা যাচ্ছে। কলকাতায় টেলিফোন একটি সাধন-দুর্লভ ধন সন্দেহ নেই, তার ক্রম-বর্ধমান রেট তাকে আভিজাত্যের আরো ঊর্ধ্বলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু হায়, কোনো সুখই কি অবিমিশ্র?

শীতের মাঝরাতে টেলিফোনের ঝঙ্কারে লাফিয়ে উঠতে হল। ঘড়ি তখন একটা পেরিয়ে। কম্বলের তপ্ত আশ্রয় ছেড়ে কম্পমান দেহে ফোন ধরলাম। কোনো টেলিগ্রাম? হাসপাতালের খবর? মারাত্মক কিছু দুঃসংবাদ? এত রাতে ডাক পড়লে এইরকম সব আশঙ্কাই জাগে।

পরপার থেকে জড়ানো একটি গলা : 'সুনন্দবাবু?'

'কথা বলছি।'

'বেড়ে আছেন মশাই—খাসা আছেন।'—জড়িয়ে জড়িয়ে সেই তিনি কৌতুকহাস্য করলেন।

'কে আপনি? কী বলতে চান?'

'বলতে চাই, বেশ আরামে আছেন আপনারা—কী বলেন, অ্যাঁ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—'—আবার কৌতুক-হাস্য এবং আমাকে নিরেট গাধার মতো দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি লাইন কেটে দিলেন। কী কারণে আমি খাসা আছি এবং কে-ই বা মাঝরাতে কিঞ্চিৎ রসস্থ অবস্থায় আমাকে সেজন্যে অভিনন্দন জানালেন—এসব কোনো প্রশ্নেরই কোনো উত্তর আর পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

মার্কিনী গৃহস্থের মতো দৈনিক ৮৯টি ডাকে আমাকে সাড়া দিতে হয় না, কিন্তু আমাদের এই কলকাতা টেলিফোনের আর একটি পরম রমণীয়তা আছে। এই আনন্দ পৃথিবীর আর কুত্রাপি এভাবে বিদ্যমান বলে আমার মনে হয় না। সে হল রং নাম্বারের দিবা-রাত্রির কাব্য।

ভোর পাঁচটায় আমাকে জানাতে হয়েছে যে, দুন এক্সপ্রেস আজকে লেটে আসবে কিনা জানি না, কারণ এটা হাওড়া স্টেশন নয়; আর একজনকে সবিনয়ে নিবেদন করেছি, তাঁকে অবিলম্বে দুই গাড়ি বালি এবং ছ'বস্তা চুন পৌঁছে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না; তৃতীয় জনকে বলতে হয়েছে, আমার কোনো লন্ড্রী নেই, সেখান থেকে তাঁর কোনো কোট খোয়া যায়নি; একজন ধমকে বলেছেন, 'এই জগু, শীগ্‌গির বাবুকে ডেকে দাও'—অচেনা জগুর বিনীত কণ্ঠস্বরে তাঁকে জ্ঞাপন করেছি : 'এজ্ঞে, বাবু তো ঘুমিয়ে রইচেন!'

সবাই সহজে ছাড়েন না। যতই বলি রং নাম্বার, ততই একজন ব্যবসায়ী সকাতরে জানতে থাকেন : 'বুলা দিজিয়ে না—গণপতি মঞ্জিল্‌সে কিষিনলালকো বুলা দিজিয়ে না।' অর্থাৎ ফোনের পয়সাটা তাঁর যখন গেছেই, তখন আমিও নাহয় কিঞ্চিৎ খরচ করে কলকাতার আর এক প্রান্ত থেকে কিষিনলালকে ডেকে আনি!

না—আমরা কার্ডোজার মতো হিংস্র নই। কিন্তু ওই লোকটি যদি আমাদের মতো আরো কটা রং-নাম্বার পেত? সে বিভীষিকা অভাবনীয়—ও দেশে তো কথায় কথায় রিভলভার চলে!

২৯/১/১৯৬৬

চাঁদ

যে বৈজ্ঞানিক চাঁদের ওপর থেকে স্বপ্ন আর কল্পনা সব আবরণ দিয়ে তার নিষ্প্রাণ শূন্যতার পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন, খুব সম্ভব ক্ষুব্ধক্ষিপ্ত শেলীই প্রাণ খুলে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন তাঁকে। আজকের পৃথিবীতে এমন কড়া রোমান্টিক হয়তো সংখ্যায় খুব বেশি নেই। কিন্তু লুনা-প্রমুখাৎ একটির পর একটি ফোটোর মারফত 'সোনার চাঁদের' যে বস্তুস্বরূপ আজ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল, তাতে বৈজ্ঞানিকরা এবং 'গোল্ড-রাশে'র ট্রাডিশনবহ মার্কিনীরা যতই পুলকিত হয়ে উঠুন—পৃথিবীজোড়া একটি বিপুল দীর্ঘনিঃশ্বাস কিছুতেই চাপা থাকছে না। আমাদের পত্র-পত্রিকাও সেইসঙ্গে সমভাবে নিশ্বসিত—রইল না, এই স্থূল জীবনটার বাইরে কোনো রহস্যালোকের স্বপ্ন-মাধুর্য অবশিষ্ট রইল না আমাদের জন্য।

যেসব দূরান্বয়ী কবিতা প্রতিমুহূর্তে আমাদের বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করে, তারা নয়; যেখানে কবি তাঁর গোষ্ঠী (Tribu)-র জন্য নিজস্ব ভাষা তৈরি করে না, সেখানেও নয়; যাঁরা শরীর আর মাটির গান করেন, যাঁরা তির্যক অর্ধমগ্ন রূপকল্পের অন্বেষ্টা—তাঁরাও নন। এ-সব ছাড়াও অন্য কবিতা আছে—অন্য কবি আছেন। সেইসব কবি আর কবিতার ছোঁয়ায় আমরা দেখি গীর্জার দীর্ঘ চূড়ার ওপর হলুদ রঙের আশ্চর্য চাঁদ, প্রিয়া-

www.pathagar.com

বিরহিত নিঃসঙ্গ কবির সামনে বিষণ্ণ রাত্রির হ্রদ আর পাইনের বন চাঁদের মায়ায় ছায়ায় অপরূপ; জানি, চাঁদ না থাকলে নিশিরাত্রের পাখিটার ডাক একেবারেই অর্থহীন। 'মুন' না থাকলে ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার বিমর্ষ অন্ধকার—'লা ল্যুন'-এর ঝঙ্কার না থাকলে ফরাসী কবিতায় তেমন করে সুরই বাজে না। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়েই দিই, কিসের আলোতে বিহ্বল হয়ে অন্য বাঙালী কবিই বা বলবেন : 'মরি যদি সে-ও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান?'

এ-সব রোমান্টিক আকুতিও থাকে। চাঁদ না থাকলে 'চন্দ্রাহত' হওয়া যাবে কী করে? রসিক লেখক ব্যঙ্গ করে আর কেন বলবেন, 'চাঁদে গিয়ে দেখা গেল মাত্র আধখানা আছে—বাকী আধখানা দুনিয়ার তাবৎ মেয়েরা মগজের মধ্যে পুরে বসে আছে?' ইংরেজী অভিধান থেকে 'লুনাটিক' শব্দটাকে খারিজ করতে হবে, কারণ, আমরা যদি 'জাপানগ্রস্ত', 'পাঞ্জাবগ্রস্ত' না হই, তাহলে 'চন্দ্রগ্রস্ত'ই বা হতে যাব কোন অধিকারে? স্পষ্ট চন্দ্র যে 'নষ্টচন্দ্রে'র দুর্দিন ঘনিয়ে আনল, সে-ও তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু মিথ্যেই ভেবে মরছি। চাঁদের রহস্য যদি বৈজ্ঞানিকের নিষ্ঠুরতায় ছিন্নভিন্ন হয়েও যায়, আমরা কি কল্পনাকেও সেইসঙ্গে কবরে পাঠাব? তখন আমাদের যাত্রা চলবে চন্দ্রতর জগতের দিকে। যে-কালে সামনের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়টাকে পেরিয়ে যাওয়ার শক্তি আমাদের ছিল না—তাকেও আমরা পৃথিবীর শেষ সীমা বলে কল্পনা করতুম, যে-কালে আমাদের পায়ের কাছে ক্ষ্যাপা সমুদ্রটা হিংস্র মৃত্যুর মতো প্রতিমুহূর্তে তর্জন করত—সেদিনও পাহাড়ের ওপারে আমাদের কল্পনা ড্রাগনের রাজত্বে এগিয়ে যেত—সমুদ্র ছাড়িয়ে রূপকথার রাজ্য গড়ত। আজও হিমালয়ের তুষাররহস্যে নিহিত 'শ্যাংগ্রিলা' আমাদের আকুল করে—এখনো অ্যামাজনের অরণ্য নিয়ে আমাদের বিস্ময়-রচনার সমাপ্তি নেই।

সুতরাং চাঁদ যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে—মহাশূন্য আছে। লক্ষ লক্ষ বছরেও তার অনন্ত রহস্য থাকবে অনুদ্‌ঘাটিত, আমাদের যে-উত্তরাধিকারীরা মঙ্গলগ্রহে বসতি গড়বে—আরো দূরে দূরান্তে এগিয়ে যাবে, তাদের জন্য আমাদের মতোই মেলা থাকবে মহাকাশ। সেদিনের শিশুকে টীপ দেবার জন্য চাঁদের ডাক পড়বে না, কিন্তু চন্দ্রতর কাউকে নতুন করে আবাহন জানানো হবে; সেদিন নতুন এইচ জি ওয়েলস নতুন উৎকল্পনায় 'ওয়ার অফ দি ওয়ার্লডস্' লিখবেন—তবে আক্রমণটা আর মঙ্গল থেকে আসবে না। আসবে মঙ্গলতর কোনো মহাগ্রহ থেকে। আমার তো মনে হয়, মহাশূন্যে এই পদক্ষেপ মানুষের কল্পনায় আঘাত হানল না—তাকে মহত্তর ক্ষেত্রে মুক্তি দিল।

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে পড়া একটি ইংরেজি গল্পের কথা মনে এল। 'স্পেসে'র উপর ভিত্তি করে কোনো সুদূর ভবিষ্যতের কাহিনী। সমুদ্রে নাবিক যেমন একা ভাসতে ভাসতে কোনো নির্জন দ্বীপে গিয়ে পৌঁছোয়, তেমনি করে একজন পথভ্রষ্ট 'কজমোনট' গিয়ে হাজির হল মহাশূন্যের ছোট্ট অপরূপ একটি জগতে। সেখানে সূর্যোদয়ের মায়া মিলিয়ে যেতে-না-যেতে সূর্যাস্তের মোহ লাগে, রঙে-গন্ধে দেহে-মনে অদ্ভুত নেশা ধরে যায়। আর তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অপূর্ব একটি নারীর মূর্তি—যে কী বিচিত্র

www.pathagar.com

এক নৈসর্গিক কারণে তারই কামনা থেকে বেরিয়ে বাইরের আলোয় বাতাসে প্রক্ষেপিত হয়েছে।

গল্পটি হাতের কাছে নেই, স্মৃতি থেকে লিখছি, তবু মোটামুটি তার বক্তব্য এই। আর ভবিষ্যতে যদি এইভাবে মহাশূন্য নিয়ে গল্প লেখা চলতে থাকে, তা হলে কল্পনার অপমৃত্যু ঘটছে—এমন কথা কে বলবে! এই গল্প পড়লে পার্সি বিশী শেলী যে তাঁর অভিসম্পাত ফিরিয়ে নিতেন, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।

এখন আমাদের ধ্যান একটি সবিতায় নয়, লক্ষ-কোটি সবিতৃমণ্ডলে প্রসারিত হয়ে যাবে; এখন দান্তের অনন্তচারী কল্পনায় আরো প্রবল 'ভিতা নুভা' শক্তি সঞ্চার করবে; এখন আর প্রশান্ত সমুদ্রের দ্বীপে দ্বীপে নায়িকার সন্ধান করতে হবে না—মহাশূন্যেই সে রূপমূর্তি লাভ করবে।

না—কল্পনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। তা উজ্জ্বলতম।

তা হলে চাঁদের কী হবে?

রকেটের ঘাঁটি। নতুন প্রতিযোগিতা। আর তার স্বর্ণসম্ভার।

অতঃপর আগামীকালের ব্রেটহার্ট নতুন করে 'বোরিং ক্যাম্প'-এর গল্প লিখবেন। চাঁদের পটভূমিতে নতুন 'গোল্ড-রাশ' নিয়ে নতুন ছবি তুলবেন ভবিষ্যতের কোনো চার্লি চ্যাপলিন। উপন্যাস লিখবার জন্য অনাগত কালের সিনক্লেয়ার লুইসের ডাক পড়বে।

আর কবিতাই বা নয় কেন? মায়াকোভস্কি কি আর ফিরে আসবেন না?

কবিতা থেকে চাঁদের যদি বিদায় ঘটে থাকে, তা হলে ঘাত-মুখর নতুন উপন্যাস তাকে অমর করে দেবে।

৪/২/১৯৬৬

ইন্দ্রলোক-ফেরত

তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল অনেকদিন আগে।

বোধ হয় কলেজ থেকে সবে বেরিয়েছেন তখন। একটা ছোটখাটো সাহিত্য-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজে কিছু লিখতেন না, কিন্তু সাহিত্য ভালোবাসতেন, সাহিত্যিকদের ভালোবাসতেন। নানাধরনের পড়াশুনা ছিল, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মন ছিল, তর্কে উৎসাহ ছিল, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সুখ ছিল। দীর্ঘ দীপ্ত চেহারা এই তরুণটি ছিলেন আধুনিকতার একজন সুনিশ্চিত প্রতিনিধি।

বহুকাল পরে হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে। বয়েস বেড়েছে, পাতলা হয়ে এসেছে মাথার চুল, গায়ের ঝকঝকে রঙে ছায়া পড়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, এখন তিনি অভিজ্ঞ এবং ক্লান্ত—বিদেশী তরুণ কবির সর্বশেষ কাব্যের জন্য এখন আর তিনি দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়ান না।

www.pathagar.com

আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন একটা দক্ষিণী রেস্তোরাঁয়। কফি আনালেন এবং কিছু খাবার। তারপর জানালেন, কী একটা পড়াশুনোর সূত্রে ইউরোপে গিয়েছিলেন, বেশ কয়েক বছর সেখানে ছিলেন, ফিরেছেন—তা-ও তিন-চার বছর হল। মোটামুটি একটা ভালো চাকরিও করেন, কিন্তু—

'কিন্তু কী?'

'টায়ার্ড—ফেড্ আপ।'

বাস করা যায় না এখানে। নানা ট্রাব্‌ল। ফুড ক্রাইসিস। মব-ভায়োলেন্স। পোলিস-এক্‌সেস। দারিদ্র্য। বাইরে যাওয়ার আগে যা দেখেছিলেন, তার চাইতেও দশগুণ খারাপ।

বললুম, 'তা হলে তো এখনই আপনাদের কাজ। খারাপ অবস্থাকে ভালো করুন। জনতাকে বলুন—ট্রাম-বাস-ট্রেন পুড়িয়ে আন্দোলন সার্থক হয় না—জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করা আর নিজের ঘর পোড়ানো একই কথা। পুলিশকে বলুন লাঠি-বন্দুক হাতে থাকলেই আঙুল চিড়বিড়িয়ে ওঠা মারাত্মক—ওতে শুধু আগুনকে আরো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সবদিকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে—সমস্যা বুঝে—'

আমাকে থামিয়ে দিলেন তিনি। সংক্ষেপে জানালেন, 'অ্যায়াম্ নট্ এ পলিটিশন।'

অর্থাৎ দেশের দায়িত্ব শুধু পলিটিশনদের। আমাদের কিছুই করণীয় নেই।

আসল কথা, এই অভিশপ্ত ভারতবর্ষ ছেড়ে তিনি আবার ইউরোপে চলে যেতে চান। 'ডিসেন্ট পিপ্‌ল অ্যারাউন্ড ইউ।' মাইনে এখানে মন্দ পান না, কিন্তু ওখানে এর অর্ধেক কাজ করে তিন-চারগুণ বেশি পেতেন। 'কী স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং।' না—এখানে থাকা যায় না। 'এই তো আমার বন্ধু দাশগুপ্ত, এখানে ফিরে এসেই এক বছর পরে আবার সরে পড়ল—ভেরি হ্যাপি ওভার দেয়ার—আর আসবে না। এই দেশ? কিছু হবে না এর। কোনোদিন না।'

দেশ আমাকেও কি বিচলিত করে না? আমারও কি যন্ত্রণা অসহ্য হয় না কখনো কখনো? কিছু করতে যে পারি না—তাও ঠিক। আমিও তো পলিটিশন নই। কিন্তু এই দুঃখ-যন্ত্রণা-বেদনার অংশ না নিয়ে চোখ বুজে ছুটে পালাব—একথা তো কল্পনাও করতে পারি না।

বিলেতে আজ ভারতীয়রা কী সুখে আছে, তার বিবরণ কাগজে রোজ পড়ি। সে-কথাও আমি ভাবছি না। যারা কিছুকাল বিদেশে কাটিয়ে অন্য জীবন, অন্য স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেয়েছেন, তাঁদের মনস্তত্ত্বও আমি বুঝতে পারি। হাজার দুয়েক টাকা মাইনে, নিজের গাড়ি, টেলিভিশন, আরো অগণিত সুখ-সুবিধের পর পাঁচ-সাতশো টাকা মাইনে, একটা যেমন-তেমন ফ্ল্যাট—ট্রামে-বাসে অফিসযাত্রা, এ নেই—সে নেই—মন খারাপ হতেই পারে, হওয়াও উচিত। ফলে ডাক্তার ছুটছেন ঘানায়, ইঞ্জিনিয়ার চললেন আমেরিকায়, ইকনমিস্ট ঘর বাঁধছেন ইংল্যান্ডে। স্বদেশ এখন পরদেশ! এর অভাব, দুঃখ, বিক্ষোভ নিয়ে—'ইট্‌স এ হোল'। এই

www.pathagar.com

মনস্তত্ত্ব ইংরেজ আমলেও ছিল না। তখন প্রবাসী ভারতীয় ইউরোপে বসে দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পরিকল্পনা নিতেন।

একজন বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে জানি, যিনি ভারতের বাইরে যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই ক্ষেপে যেতেন। বলতেন, 'হাফ-পোয়েট, ডেমি-প্রফেট'। তারপর বেশ কিছুকাল তাঁকে বাইরে কাটাতে হল। তখন হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন, তাঁর ইংরেজি-জ্ঞানের কোনো গুরুত্ব ও-সব জায়গায় নেই—তাঁকে পরিচয় দিতে হয় রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-নেহরুর দেশের মানুষ হিসেবে, তাঁর আত্মমর্যাদার ভিত্তি যদি কোথাও থাকে—সে তাঁর স্বদেশ, সে তাঁর ভারতবর্ষ। অগত্যা ওই 'হাফ-পোয়েট, ডেমি-প্রফেট'কেই তাঁর আশ্রয় করতে হল, ইন্ডিয়ান কালচারের ওপর বক্তৃতা দিতে হল, প্রমাণ করতে হল ভারতীয় হিসেবে তাঁরও কিছু গর্ব করবার আছে। এখন স্বদেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বোধ গভীরতর—বক্তব্যও বদলেছে।

নির্ঝঞ্ঝাট দিনযাত্রা, 'উইথ ডিসেন্ট পিপ্‌ল অ্যারাউন্ড' অপরিমিত স্বাচ্ছন্দ্য—কিন্তু কোন মূল্যে? এ-সবের প্রতি লোভ আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তার জন্য আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দেব? ডোমিসাইলডও নয় হওয়া গেল, কিন্তু চামড়ার রং ধুয়ে যাবে? একদিনের জন্যও বিদেশীরা ভুলতে পারবে : 'দে আর বেগারস—নিজের দেশে খেতে পায় না, তাই—'

গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ কি খুব সুখে ছিল? সেই হিটলারী বোমা-বৃষ্টি—সেই 'ওয়ার অব ইংল্যান্ডে'র দারুণতম দুঃস্বপ্নের ভেতর? অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ—মস্কো-অভিমুখী নাৎসী সৈন্য—রুশ জীবনযাত্রা তখন কি খুব মনোরম ছিল? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় যারা দেশত্যাগী, সেই ক'টি মুষ্টিমেয় মানুষ ছাড়া ক'টি ইংরেজ—ক'জন রুশ দুর্গত স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পালাবার কথা ভেবেছিল তখন?

এ যুগের মানুষ আন্তর্জাতিক হোক—এ প্রত্যাশা তো আমরা সকলেই করি। কিন্তু স্বদেশের কেন্দ্রে দাঁড়িয়েই সেই আন্তর্জাতিকতার বৃত্ত রচনা করতে হয়, কেন্দ্রচ্যুত মানুষের ঠাঁই কোথাও নেই। আমাদের বাইরের সম্মান-অপমান ভারতীয় রূপেই—আত্মবিলুপ্তির দীনতায় আমরা অবমাননারও অযোগ্য।

আমার সেই 'সিলেটী বাঙাল' ভট্‌চাযকে মনে পড়ছে।

লন্ডনের স্বাবলম্বী ভোজনাগারে লম্বা লাইন। দুটি অশিক্ষিত পাকিস্তানী সেই লাইনে। তাদের অসহায় বিব্রত মুখ আর ভীরু চাউনি দেখে ইংরেজি-রসিকতা উছলে উঠল। বেয়াড়া ধাক্কা এবং বিকট আদেশ 'গ্যাট্‌ গোয়িং—গ্যাট্‌ গোয়িং!' হঠাৎ পেছন থেকে সিংহ-গর্জন ভট্‌চাযের—'নিরীহ লোকগুলোকে অকারণে অপমান করছ—লজ্জা হয় না?'

বাসে পাঞ্জাবী-যাত্রী অশুদ্ধ উচ্চারণে বললে, 'বেরেড্‌ফোর্ড।' কন্ডাক্‌টার কুৎসিত মন্তব্য করল ভারতীয়দের সম্পর্কে। প্রতিবাদে লাফিয়ে উঠল ভট্‌চায। ইংরেজ কন্ডাক্‌টার ক্ষমা চাইল, কিন্তু পেছনে বসে হাসাহাসি করতে লাগল দুটি ভারতীয় ছাত্র : 'হো-হো দেখো, নয়া সুভাষ বোস আ গিয়া।'

www.pathagar.com

টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরেছে ভট্‌চায। কিন্তু আজও ভালো চাকরি তার জোটেনি। কিছুদিন আগে দেখেছিলুম সে বেকার।

'ট্রেনে ফেরি করব, দাদা, আমার লজ্জা নেই?'

ভট্‌চাযও ইন্দ্রলোক-ফেরত। কিন্তু সে ভারতীয়। সে জানে, এই মাটিতে তার দুঃখ, এই মাটিতেই তার মর্যাদা।

২/৪/১৯৬৬

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি নজরুলের আর একটি জন্মদিন উদ্‌যাপিত হল বাঙলাদেশে। আশা করছি বৃহত্তর বাঙলার পূর্বার্ধও কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার গৌরবের শরিক হয়েছেন—হিন্দু-মুসলমানের যে মিলিত হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত, সাময়িকতার কোনো বিভ্রান্তি সেই আসনকে স্পর্শ করতে পারে এমন চিন্তাও অশ্রদ্ধেয়।

ব্যাধির নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় যে কবি আজ চিরমৌনী—কী দুরন্ত বাণী-বন্যা নিয়েই একদিন তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। বুড়ী-বালামের ইতিহাস-স্পন্দিত বাঙলাদেশে সেদিন যেন মেসোপোটেমিয়ার কামানের আহ্বান বয়ে এনেছিলেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় স্বদেশপ্রেমের অভাব ছিল না, কর্মযোগী অরবিন্দকে শ্রদ্ধাদীপ্ত নমস্কার জানাতেও বিশ্বকবির দ্বিধা ছিল না, কিন্তু বাধা ছিল বিপ্লবীদের সমর্থন জানানোতে—রক্তের ঋণ যারা রক্ত দিয়েই পরিশোধ করতে চান, আত্মদীপন প্রত্যয়ী অক্রোধ রবীন্দ্রনাথ কোনোমতেই তাদের স্বীকৃতি দিতে পারেননি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভক্ত অনুচর নজরুল গুরুর কাছে থেকে বিপ্লববাদের মন্ত্র পাননি—কিন্তু দেশবন্ধুর আত্মদানের মধ্য দিয়েই হয়তো বুঝেছিলেন—'এসব দৈত্য নহে তেমন।' অহিংস-সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তরুণ বাঙালীর মানসিক বিরূপতা তারুণ্যদীপ্ত হাবিলদার কবিকে প্রাণিত করল বিষের বাঁশিতে, ভাঙার গানে, অগ্নি-বীণায়, ফণিমনসায়। 'সূতা দিয়ে স্বাধীনতা' চাওয়া তাঁর দুঃসহ মনে হল—'যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যের' তার 'তখ্‌ত' ফিরিয়ে দেওয়া যায়—সেই তরবারির বন্দনাই গাইলেন তিনি। 'অমর কবিত্বে'র স্থির-প্রশান্তিকে প্রবল কণ্ঠে অস্বীকার করে নজরুল নিজের ভূমিকা নিলেন ইতিহাসের ঝড়ে।

বিদ্রোহী—নিঃসন্দেহেই বিদ্রোহী। বাঁধভাঙা ছন্দ, বেপরোয়া ভাষায়, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রমথন কল্পনার পাগলামিতে—ওই একটি দুরন্ত স্বয়ংসিদ্ধ কবিতাতেই নজরুল বাংলাসাহিত্যে স্মরণীয় হতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদ-বঞ্চিত রুদ্রপন্থী বাঙালী একমুহূর্তে নজরুলকে চিনে নিলে, তারপর দীর্ঘকাল ধরে কীভাবে নজরুলের গান আর কবিতা কালবৈশাখীতে বজ্রধ্বনিত হল, তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে বাংলার জাতীয় আন্দোলনের পাতায়।

কিন্তু এই একটিমাত্র পরিচয়ই নজরুলের নয়। অগ্নি-বীণা—বিষের বাঁশি তিনি বাজিয়েছেন, কিন্তু সন্ধ্যায় ছায়ানটও তাঁর ছিল; ফণি-মনসার বনে কবি রক্তাক্ত

www.pathagar.com

হয়েছেন—তাই বলে দোলন-চাঁপার মঞ্জরীকেও তিনি ভুলে যাননি। প্রেম-কামনা-ব্যর্থতা-দীর্ঘশ্বাস-প্রকৃতি—একটি পরিপূর্ণ যৌবনের ধর্মে নজরুল তাদের সবকিছুই অঞ্জলিপুটে পান করেছেন। শুধু বিদ্রোহীই নন, তিনি কবি। তাঁর একদিকে 'বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর', অন্যদিকে ফুটে উঠছে : 'কাম-কণ্টকরণ মহুয়া কুঁড়ি', কখনো তিনি 'স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা' সাপটে ধরেন, কখনো আবার 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' বিচ্ছেদের শ্রান্ত বিষণ্নতায় তাঁকে স্তিমিত করে।

বাংলাসাহিত্যে নজরুল এসেছিলেন স্বখাত ধারায়, অনুবর্তনের শাখা-প্রবাহে নয়। তাঁর কাব্যের বাচনে, রূপচিন্তায়, অকুতোভয় ছন্দোবিস্তারে তিনি ছিলেন অনন্যতান্ত্রিক। বাংলা কবিতার কোনো ট্রাডিশনের মধ্যে তিনি সন্তর্পণে লালিত হননি; আঙ্গিকে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত, কল্পনায় অমিতাচারী। নজরুলের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল একখানেই—যে বৈশিষ্ট্য আমরা অন্যভাবে পাই হুইটম্যান কিংবা মায়াকোভস্কির কবিতায়।

দ্রোণাচার্য মোহিতলাল মজুমদার এই দুর্বিনীত ছাত্রটিকে বশে আনতে পারেননি। কিন্তু ছন্নছাড়া এই মানুষটিও নাগরিক কবিতার প্রভাব এড়াতে পারলেন না—স্বশিক্ষা ছেড়ে সুশিক্ষার পথে পা বাড়ালেন। ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে মোহিতলাল তাঁকে কতখানি পরিচিত করিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু অনিবার্যভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের আর্কষণের মধ্যে এসে পড়েছিলেন। সুনন্দর রসবোধ প্রামাণ্য নয়, তবু একথা বারবার আমার মনে হয়েছে—রবীন্দ্রপ্রভাবে নজরুল যতটা লাভবান হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার চাইতেও বেশি। চিন্তায়, কল্পনায় কিংবা শব্দ সঞ্চয়ে যেখানেই তিনি রবীন্দ্র-সন্নিহিত, সেখানেই তাঁকে দুর্বল এবং স্বস্থানচ্যুত মনে হয়। দুটি মানসিক-স্বাতন্ত্র্যই এই ট্যাজিডির মূলে—নজরুলের বেশকিছু প্রেমের কবিতায় এবং গানে (তাঁর নিজস্ব বিশেষ ধরনের গানগুলিতে নিশ্চয়ই নয়) এই ব্যর্থতার সকরুণ দৃষ্টান্ত দেখা যাবে।

নজরুল বাংলা-সাহিত্যে বিশিষ্ট-বিচ্ছিন্ন হয়েই এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর জোড় মেলেনি। কিন্তু কিছুটা পরিবেশ-প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর কাব্যশিল্পে এবং কবিকল্পনায় যাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ঘটেছিল, তিনি নিঃসন্দেহেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আশ্চর্য সাদৃশ্য দু'জনের ভেতরে। সত্যেন্দ্রনাথ অনেকটা শান্ত, অক্লান্ত গ্রন্থজীবী; কিন্তু তিনিও সাময়িকতার প্রতিটি তরঙ্গে উদ্বেল, রাবীন্দ্রিক প্রভাবে অপ্রভ, ছন্দে ধ্বনিতে কিশোরধর্মী আনন্দে উতরোল। মানস-লক্ষণে নজরুলের সঙ্গেই তাঁকে অনেকখানি মিলিয়ে নেওয়া চলে। 'গুল্মে পর্ণে/লতিকার কর্ণে/ঢল ঢল স্বর্ণে/ঝলমল দোলে দুল'—নজরুলের এই পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সাধর্ম্য খোঁজবার জন্য বেশিদূরে যেতে হয় না। 'আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি আস্‌মানী নীল-কাঁচুলি,/তারকার টিপ, বিজলীর হার, দ্বিতীয়া-চাঁদের হাঁসুলি।/ঝরা-বৃষ্টির ঝর্‌-ঝর্‌ আর পাপিয়া শ্যামার কূজনে/বাজে নহবত্‌ আকাশ ভুবনে—সই পাতিয়েছে দুজনে,—যে-কোনো পাঠক অসংকোচে এই লাইনগুলোকে সত্যেন্দ্রনাথের বলে রায় দিতে পারেন।

সবচেয়ে নিকট-সাদৃশ্য সেইখানেই—যেখানে দু'জনেই রাজটীকা পরিয়েছেন যৌবনের ললাটে।

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেও শেষপর্যন্ত নজরুল বাংলা-সাহিত্যের ট্রাডিশনে মিলিত হয়েছেন। ধূমকেতু-বিদ্রোহীর প্রচণ্ডতা স্বভাবতই আরো স্থির-গভীরতায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তখন নজরুল শুধু বিদ্রোহী নন—তিনি কবি। সেই কবির নিজত্ব সবচাইতে সত্য হয়ে উঠেছে তাঁর গানে। 'কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা ভোর গগনের দর-দালানে'—নজরুল না হলে এ গান আর কে লিখতেন?

আর ট্রাডিশনকে নতুন মননে পুনরালোকিত করা যদি সৎকবির একটা প্রধান দায়িত্ব হয় (যে-গৌরবে ভিক্তর ইয়ুগো সবচাইতে উজ্জ্বল) তা হলে নজরুলে তার আশ্চর্য সফলতা : 'উমা হল ভৈরবী আজ বরণ করে ভৈরবেরে/শিবের শিরে জাহ্নবী তাই শ্মশানে-মশানে ফেরে/অন্ন দিয়ে ত্রিজগতে/অন্নদা মোর বেড়ান পথে/ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজ-দুলালী—'।

এ শুধু শ্যামা-সঙ্গীত নয়, কবিতা এবং প্রথমশ্রেণীর কবিতা।

৪/৬/১৯৬৬

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞাতার্থে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা মহোৎসবে যে ভাঙনের লীলানন্দ চলে, সে-সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে বলেছিলুম, এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-উদ্ধারে উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আসছেন। একজন সহৃদয় পাঠক এই ব্যাপারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, আমার মন্তব্য সঠিক নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে দানছত্র খুলে দিয়েছেন—তাঁদের পাশ করানো আষাঢ়ের নবধারা বর্ষণের মতো অকৃপণ, তাদের ফার্স্টক্লাস বিতরণ শিলাবৃষ্টির মতো রোমাঞ্চকর।

ঠিক কথা, আমারই ভুল হয়েছিল। কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজের মতো কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে এক্ষেত্রে এখনো কনজার্ভেটিভ বলা যায়—ডিগ্রী-ডিপ্লোমা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ স্ক্রুপল্‌স্ এখনো তাঁদের অবশিষ্ট আছে। মনে পড়ছে, কয়েক বছর আগে একজন সর্বভারতীয় শিক্ষাবিদকে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দুঃখ করে জানানো হয়েছিল : 'পোস্ট-গ্রাজুয়েটের সব বিভাগে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সব সময়ে পাওয়া যায় না—'

শুনে সর্বভারতীয় ব্যক্তিটি বিস্ময়ে ভ্রুকুঞ্চিত করেছিলেন।

'বলো কী, ডক্টরেট পাও না! আরে ভাবনা কিসের, ওয়েল, ইম্‌পোর্ট দেম ফ্রম'—

তারপরেই দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। আমি আর সেগুলো পুনরুচ্চারণ করতে চাই না—কারণ মহামানবটি তো সবরকম ধরাছোঁয়ার বাইরে, মাঝখান থেকে আমিই মারা পড়ব।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর বাণী এবং পরিকল্পনা ছাড়া যা আমরা সবচাইতে বেশি পেয়েছি তা হল বিশ্ববিদ্যালয়। জলে, স্থলে, অনলে, নিলে—একটি করে বিশ্ববিদ্যার

www.pathagar.com

মহামন্দির। অত্যন্ত সৎকাজ শিক্ষাই হচ্ছে জাতি গঠনের ভিত—বিশ্ববিদ্যালয় সেই ভিতের ওপর স্কাই-স্ক্রেপার। 'এভ্‌রিথিং ক্যান ওয়েট বাট এডুকেশ্যন কান্‌'ট্‌'—!

আর বিশ্ববিদ্যালয়ই যদি হল, তা হবে, ডিগ্রী বিতরণ ছাড়া আর কোন মহৎ কর্তব্য তার থাকতে পারে! পাশ করানো তো আছেই, তা ছাড়া ফার্স্ট ক্লাসও দিতে হবে বরহস্তে—নইলে আমাদের ছাত্রেরা কলকাতা-দিল্লী-মাদ্রাজ-বোম্বাইয়ের ছাত্রদের পাশে দাঁড়াবে কী করে! 'গরীব পরবরেরা' স্রেফ বেঘোরে মারা যাবে যে!

তা হলে একটি ফার্স্ট ক্লাসের কাহিনী শুননু। একে 'গল্প হলেও সত্যি' কিংবা 'সত্যি হলেও গল্প' যা-খুশি নাম দিতে পারেন।

ধরুন, কলেজ তৈরি হল, বিদ্যার ঘটস্থাপন ঘটল, অধ্যাপকেরা এলেন, ছাত্ররাও এল। কিছুদিন পরে একটা জিনিস আবিষ্কার করা গেল, কলেজের চেয়ার-বেঞ্চি-টেবিলে যেন একটু একটু করে ঘাটতি পড়ছে। তারও পরে এক মনোরম বিকেলে, কলেজের ছুটি হয়ে গেলে এক অধ্যাপক চোখ কচলে দেখলেন, কলেজ-সন্নিহিত নিবিড় ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে দুলতে দুলতে দুটি টেবিল এগিয়ে যাচ্ছে দিগন্তের দেহাতের দিকে।

প্লাস্যাৎ-এর টেবিল অবশ্য নড়াচড়া করে, কারণ তার পেছনে ভৌতিক কাণ্ড থাকে। কিন্তু নিতান্তই কলেজের ক্লাসের টেবিল এই বিকেলবেলায় পাঞ্চভৌতিক যোগাযোগ ছাড়া ধানক্ষেতে ধাবমান হতে পারে না বলেই তাঁর মনে হল। অতএব 'পাকড়ো-পাকড়ো' রবে তিনি ছুটলেন, পেছনে বেয়ারা-দারোয়ান ছুটল এবং তাঁর পৌঁছুবার আগেই কয়েকটি ভক্তিমান ছাত্র মাঠে টেবিল ফেলে দিয়ে দেহাতের দূরান্তে বিলীন হল।

কর্তৃপক্ষে বোধ হয় ভাবলেন, কলেজকে জনপ্রিয় না করতে পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আজ চেয়ার-টেবিল রওনা হয়েছে, কাল হয়তো কলেজের বাড়িসুদ্ধুই উধাও হয়ে যাবে। অধ্যাপকেরা ভাবলেন, কলেজ উধাও হলে তাঁদের চাকরি থাকবে না, অতএব—

অতএব পরের পরীক্ষায় ম্যাজিক ঘটল।

উক্ত কলেজ থেকে এমন দুটি-ছাত্র—ধরুন অর্থনীতিতেই—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল—যারা অর্থনীতির বইয়ের ইংরেজিভাষা পর্যন্ত বুঝতে পারে কিনা সন্দেহ। নবজাতক এবং সর্বংসহ বিশ্ববিদ্যালয়েরও টনক নড়ল। তদন্ত হল এবং তাতে প্রকাশ পেল—পরীক্ষা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আইন অনুযায়ী খাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি, একদিন করে আটকে রাখা হয়েছে এবং সেই রহস্যময় দিনটিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র সহযোগে প্রতিটি খাতার জন্মান্তর ঘটে।

অতঃপর—

এরকম এক-আধটা ব্যাপার হয়তো সুনন্দর মতো দুর্জনের কানে আসে, অনেকদূর পর্যন্তও গড়ায়। কিন্তু এসব বাঁকা রাস্তায় না গিয়ে যেখানে মিউচ্যুয়্যাল

www.pathagar.com

বন্দোবস্ত? ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দ যোগাযোগ? 'আপনার ভাইপো? তাই বলুন। কত দিতে হবে?'

এসবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও যে সীজার-পত্নীর মতো মহিমান্বিতা, তা আমি বলছি না। তবু কিছু চক্ষুলজ্জা বোধ হয় সেখানে এখনো আছে। তা ছাড়া শত্রুপক্ষ আছে, খবরের কাগজগুলোর বিপজ্জনক অনুসন্ধিৎসাও রয়েছে। দুই দুইয়ে পাঁচ সবসময় সম্ভব হয় না।

ডক্টরেট? ভাবনার কী আছে? ফরাক্কাবাদ কিংবা আক্কেলনগরের হাট তিনদিন ঘুরে আসা যাক। নোট নেওয়া যাক—আলুওয়ালারা কী ভাষায় কথা বলে, টুকে রাখা যাক—মাছের বাজারে কী রীতিতে দরাদরি হয়ে থাকে। সেগুলো একসঙ্গে সাজিয়ে দিলেই থীসিস। লিঙ্গুরিস্টিকদের ওপর ডক্টরেট।

ফল? ভালোই হয়। চাকরি পাওয়া যায় দ্রুত বেগে। সরকারি নির্বাচন ডক্টরেট এবং ফার্স্ট ক্লাসের মহিমায় আপ্লুত হয়ে যায়। পাশের ধারাবর্ষণে শিক্ষিতের কুঞ্জবন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

আর সমুদ্রপারে এইভাবে তার ঢেউ গিয়ে পৌছোয় । বিলেতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইংরেজ ছাত্র নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলে ইংরেজ অধ্যাপক ধমক দিয়ে ওঠেন : 'ডোন্‌ট টক লাইক অ্যান ইন্ডিয়ান!'

তাতে অবশ্য আমাদের কিছু যায় আসে না। উচ্চশিক্ষা এগিয়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বজার মতো চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দল। তাতেই আমাদের তৃপ্তির সুখনিদ্রা ঘনিয়ে আসে।

সন্দেহ নেই, এসব ব্যাপারে কলকাতা এখনো পিছিয়ে আছে। 'অন্ধকার থেকে এখনো আলোকে' আর যথোচিত পদপাত ঘটেনি। সেই দিক থেকে তার যুগোচিত অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবার আরো অনেক টেবিল-চেয়ার-ফ্যান-নিয়নলাইট—টাইপরাইটার-বই-কাঠের পার্টিশান-জানালার শার্সি ধ্বংস করবার দরকার আছে। নিশ্চয় দরকার আছে।

২৫/৬/১৯৬৬

রসিকতার দুর্ভাগ্য

সেই ইরান কিংবা তুরান দেশের প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ—যাঁর দাপটে সিংহ এবং উট (বাঘ আর গরু ওসব দেশে অচল) এক ঘাটে জল খেয়ে থাকে, একদিন তাঁর আমদরবারে এক বিদেশী এসে হাজির হল। রেওয়াজমাফিক কুর্নিশ করে নিবেদন জানাল : 'আলা হজরবত, আমি একজন রসিক ব্যক্তি। বাদশাহের মেহেরবানি হলে আমি নানারকম রসিকতা করে তাঁকে খুশি করতে চাই।'

সকালেই বেগমের সঙ্গে একপশলা দাম্পত্যকলহের ফলে বাদশার মেজাজ ভালো ছিল না। ব্যাজার মনটাকে একটু সরস করবার জন্যে তিনি বিদেশীর আর্জি গ্রহণ

www.pathagar.com

করলেন। আমদরবার শেষ হলে তিনি বাছা বাছা উজীর-নাজীর-আমীরদের নিয়ে চলে এলেন খাসদরবারে। বেগমমহলেও খবর গেল, অসূর্যম্পশ্যারাও এসে আসন নিলেন ওপরের ঝরকার আড়ালে।

রসিকতা ভালোই জমল। হেসে কুটপাট হলেন সবাই। ফাঁকে ফাঁকে জলতরঙ্গের মিঠে আওয়াজের মতো সারেঙ্গীর টুংটাংয়ের মতো বেগমদের হাসিরও চাপা ঝঙ্কার ভেসে আসতে লাগল। তাতে বিদেশী রসিকের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে যখন সকলের চোখে জল এসে গেছে, চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে, পেটে খিল ধরেছে, তখন বাদশাহ বললেন, 'ব্যস্—খুব হয়েছে। আর দরকার নেই।'

শেষের দিকে কেউ লক্ষ করেননি, এমনকি উজীর-এ-আজম পর্যন্ত নন, যে বাদশাহ আর হাসছেন না। তাঁর মুখ ক্রমেই মেঘের মতো কালো আর ঝড়ের মতো থমথমে হয়ে উঠছে।

রসিক ব্যক্তিটি (আমাদের ছদ্মবেশী গোপাল ভাঁড়ই কি না কে জানে) তখন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে জবরদস্ত ইনামের আশায়। বাদশা বললেন, একে একশো মোহর দাও আর আচ্ছা করে একশো ঘা কোড়া লাগাও।

একশো ঘা কোড়া? বিদেশী হাউ হাউ করে বললে, হুজরত এটা কীরকম হল? এত করে হাসিয়েছি, খুশি করেছি, তার ফলে কিনা—

বাদশাহ বললেন, সেজন্যে তুমি মোহর পাচ্ছ। আর কোড়ার হুকুম কেন হল, তাও একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।

বিদেশী কিছু বলতে পারল না—কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উজীর-এ-আজম বললেন, হুজুর, হুকুম যখন হয়েছে, তখন তামিলও নিশ্চয় হবে। কিন্তু একটু সময় দেওয়া হোক। উজীরী করে আমার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, মাথায় টাক পড়েছে—কিন্তু হুকুমের মর্ম আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। যদি কৃপা করে—

সকলকে বিদায় করে দিয়ে বাদশাহ উজীরকে পাশে বসালেন। বললেন, তুমিও বুঝতে পারবে না, একথা আমি ভাবিনি। একটু চিন্তা করে দেখো—এই লোকটা আমাদের হাসাল কী দিয়ে? বোকা নবাব, বেকুব বাদ্শাহ, বুদ্ধু উজীর—তাদের যত গাধামো আছে, তাই নিয়ে সে মৌজ করল এতক্ষণ। আমরা হাসলুম বটে, কিন্তু সে যেন আমাদের প্রত্যেকের চেহারাই দেখিয়ে গেল। আড়াল থেকে খাস-বেগমের হাসি শুনেছ কি? আমি শুনেছি। পরিষ্কার মনে হল বোকা নবাব আর বুদ্ধু বাদশাহের সব গল্পগুলো তিনি আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। লোকটার এই বেয়াদবি আমি বরদাস্ত করব? ওর বুদ্ধির জন্যে আমি ইনাম দিয়েছি, কিন্তু বেয়াদবির জন্যে একশো কোড়া ওকে খেতেই হবে।

শুনে, উজীর দাড়ি এবং টাক চুলকোতে লাগলেন।

উজীরের টাক-দাড়ির পরিচর্যা চলতে থাকুক, সেই ফাঁকে সুনন্দরও দুটি একটি নিবেদন আছে। আমি কোনো দিকপাল হাস্যরসিক নই—ও ব্যাপারে খ্যাতিলাভের কোনো দুরাকাঙ্ক্ষাও পোষণ করি না। পাঠকদের জন্যে এক পাতায় দুঃখ-সুখের

www.pathagar.com

আসর সাজাই, অনেকে খুশি হন, হয়তো না-বুঝে কারো কারো মনঃপীড়াও ঘটিয়ে বসি। সম্প্রতি দেখছি, কোড়া প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটেছে।

একজন মর্মাহত হয়ে বললেন, 'শেষকালে আপনি আমার থীসিস নিয়ে ঠাট্টা করলেন? অথচ, আপনাকে আমি ভদ্রলোক বলে জানতুম।'

তারস্বরে জানালুম, 'কক্ষনো না মশাই, কক্ষনো না। আপনাকে আমি জ্ঞানী এবং পণ্ডিত বলে জানি, আপনার থীসিস চর্মচক্ষে কখনো দেখিনি, মানে, আপনার গা ছুঁয়ে বলছি—'

গা ছুঁতে দিলেন না—অভিমানে ছিটকে সরে গেলেন। বললেন, 'বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই বলছে, আর আপনি না করলেই বিশ্বাস করব? যান—যান মশাই, খুব হয়েছে—আপনাকে চিনতে আমার আর বাকী নেই।'

ঈশ্বরের কথা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিলুম, তাঁকে স্মরণ করে বললুম, 'হে প্রভু, তুমি তো জানো, আমার মনে কোনো পাপ ছিল না—এই ভদ্রলোককে ভুলেও আমি ব্যথা দিতে চাইনি। কিন্তু—'

কিন্তু হাসাতে গেলেই এ ট্র্যাজিডী যে অনিবার্য একথা আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। ঋষি রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিলেন—তাঁর একটি চরিত্র কৌতুকরচনা লিখে প্রতিবেশীর ক্রোধে ভিটে-ছাড়া হওয়ার দাখিল হয়েছিল। আমারও দেখছি সেই দশা!

নিজেকে নিয়ে যিনি হাসতে পারেন তিনি তো ব্রহ্মজ্ঞ—আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের হাসি পরের ওপর দিয়ে। কিন্তু সেই পর কীরকম? মনীষীরা বলেন, সবাই ভাববে ঠাট্টাটা আমাকে নয়, আমার পাশের লোকটিকে। এমনি করে পাশে সরতে সরতে শেষ পর্যন্ত নৈর্ব্যক্তিক শূন্যতায় মিলিয়ে যাওয়াই হল শ্রেষ্ঠ কৌতুক।

কিন্তু বিপদ এখানেও। বন্ধু-বান্ধব বলে পৃথিবীতে একশ্রেণীর জীব তৈরি হয়েছে, পর-হিতার্থে তাদের অবদান কতখানি জানি না, কিন্তু বিব্রত করবার কাজে তাদের নৈপুণ্য অসাধারণ। তাঁরা একটি বিশেষ ব্যক্তিকে যদি রসিকতার লক্ষ বলে নির্বাচন করেন, সেই উপলক্ষে তাঁকে সহানুভূতি জানাতে থাকেন, সহানুভূতিলব্ধের দল যদি ক্রমশ দলে ভারী হতে থাকেন, তা হলে পৃথিবীর যাবতীয় রসিককে আফ্রিকার জঙ্গলে আত্মগোপন করতে হয়। রসিকতার চাইতে সিংহের খপ্পরও ভালো!

ইতিমধ্যে উজীরের মাথা চুলকোনো শেষ হয়েছিল। তিনি বললেন, হুজুর, আপনি যা বললেন সবই খাঁটি কথা। হয়তো কেউ কেউ এইসব রসিকতার ভেতরে আপনার ছায়াও দেখতে পাবে; আপনি যা করেননি—তা-ও চাপাতে চাইবে আপনার ওপর। কিন্তু লাভের দিকটাও দেখুন। আপনি যা করেননি—অথচ ভবিষ্যতে করে ফেলতেও পারেন—তার জন্যে কি লোকটা আপনাকে হুঁশিয়ার করে দেয়নি? আপনি সে-ভুল কি কখনো করবেন আর?

রসিকের কোড়া মাফ হল। ইনাম জুটল দুশো মোহর।

মোহরের আশা সুনন্দ রাখে না। কোড়া মাফ হলেই যথেষ্ট।

৯/৭/১৯৬৬

www.pathagar.com

রিক্‌শা এবং আমরা

সন্ধ্যোবেলায়, ঘণ্টাখানেক দৌড়ঝাঁপ আর চ্যাঁচামেচি করে, খান চারেক খালি ট্যাক্সির দর্শন পেয়েছিলাম। একটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল, আমি এগিয়ে গিয়ে গন্তব্যস্থলের কথা বলতেই ঝট্ করে মিটারের ওপর একটি লাল পতাকা উঠে এল : 'ফর গ্যারাজ'। "গাড়ি খারাপ স্যার—যাবে না।" অনতিবিলম্বে ঝানু পাটোয়ারী চেহারার একজন দর্শন দিলেন, ট্যাক্সিওয়ালার কানে কানে কী কথা হল, একবার যেন অস্পষ্ট শোনা গেল "ঠিক হ্যায়, আউর দো রূপেয়া"—সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তুলে নিয়ে ট্যাক্সি উধাও হয়ে গেল। আমার পাপ মন—ঠিক গ্যারাজে যাচ্ছে, একথা ভাবতে পারলুম না।

দ্বিতীয়জন কাতরস্বরে বললেন, "বড্ড খিদে পেয়েছে স্যার, বাড়ি যাচ্ছি, খাব"—সেই ক্ষুধার্তকেও আমি চক্ষুলজ্জার খাতিরে আর অনুরোধ করতে পারলুম না। তৃতীয়জন "কোথায় যাবেন" প্রশ্নের উত্তর পাওয়ামাত্র ঝড়ের বেড়ে গাড়ি হাঁকালেন—আমাকে একটি কথা বলবারও সুযোগ দিলেন না। চতুর্থ সর্দারজী জলদমন্দ্রে বললেন, "উধর সে ভাড়া নেহি মিল্‌তা—নেহি যায়গা"—একটি সদুপদেশও পাওয়া গেল : "বাস্ তো হ্যায়—উস্‌মে যাইয়ে।"

বাস্ হ্যায়—নিশ্চয় হ্যায়। কিন্তু হায়, তা আসছে পঁচিশ মিনিট আধঘণ্টা পরে পরে। কিন্তু তার আপাদমস্তক ঝুলন্ত মানবতা ভেদ করতে পারে মাত্র দুটি প্রতিভা—একটি ভোজবাজি, অপরটি ভুজবল। আমি প্রোফেসার গণপতি নই, পালোয়ান শ্যামাকান্তও নই। অতএব ও-রকম দুশ্চেষ্টায় আমার সুবিধে হবে না।

অগত্যা হণ্টনই আরম্ভ করব নাকি?

কিন্তু পথ বোধ হয় দু মাইলের ওপরে, চশমার বিপর্যয়ে ক'দিন ধরে সন্ধ্যার পরে দৃষ্টিশক্তি বিশ্বাসঘাতক—সময়ের অভাবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আর সামনের সেই মনোহর রাস্তাটি। পচা খালের দুর্গন্ধ আছে, ধারে ধারে সঞ্চিত আবর্জনা আছে, বহুকাল কর্পোরেশনের স্পর্শসুখবঞ্চিত রাস্তায় পা-মচ্‌কানোর জন্যে গর্ত আছে, সেই গর্তে বর্ষার জল আছে এবং অর্ধেক জায়গাতে ফুটপাথ নেই। সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষে ঠিক উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হল না।

শেষপর্যন্ত রিক্‌শাওলারই শরণ নেওয়া গেল। বাজুক না হয় রাত দশটা—ঠিক পৌঁছে দেবে। কলকাতার রিক্‌শার অসাধ্য কিছু নেই। এক গলা জল হলেও তা স্টিমারের মতো এগিয়ে যায়।

ভাড়া চাইল, তিন টাকা।

ঠিক আছে, তিন টাকাই দেব। একজন গরীব মানুষ আমাকে কাঁধে করে দু মাইল বয়ে নিয়ে যাবে, খানা-খন্দলে হোঁচট খাবে, এক মুঠো ছাতু কিংবা দু'খানা রুটির জন্যে রক্তের বিন্দুগুলো ঘাসের ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরিয়ে দেবে—তিন টাকা কেন, পাঁচ টাকা চাইলেও আপত্তি করতুম না।

www.pathagar.com

টুন টুন করে রিক্‌শা চলল এবং মধ্যে মধ্যে একটা ঝাঁকুনির চমকে তত্ত্বচিন্তা ধাপে ধাপে উর্ধ্বায়িত হতে লাগল আমার।

দিনের কোনো কোনো বিশেষ সময়—অর্থাৎ যখন অফিসের ভিড় নেই কিংবা সান্ধ্য-সিনেমা আর প্রীতি-ভ্রমণের ব্যস্ততা নেই, তখন দু-একখানা ট্যাক্সিলাভের সৌভাগ্য ছাড়া, আমাদের মতো উদ্যমহীন মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরে। শুনেছিলুম, কিছুদিন আগে উদার হাতে ট্যাক্সির পারমিট বিতরণ করা হয়েছে, কিন্তু কলকাতার মরুভূমিতে তারা বারিবিন্দুর মতো বিলীন। আমাদের এখনো সেই আদি এবং অকৃত্রিম রিক্‌শাই ভরসা।

কলকাতার ট্রাফিক-বিপর্যয়ের প্রধান কারণই নাকি 'স্লো মুভিং ভেহিক্‌ল্‌স্'—অর্থাৎ রিক্‌শা, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটর-বিহারীরা এই দুটি যানকে দু চক্ষে দেখতে পারেন না—না পারুন, আমার কিছু যায় আসে না। আমি রিক্‌শায় চাপব, দরকার হলে ঠেলাগাড়িতেও উঠে বসতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করব না এবং আমরা সেই মন্থরযাত্রায় একখানা বিরাট বিদেশী মোটর যদি এক মিনিটের জন্যেও বাধ্য হয়ে থেমে দাঁড়ায়, তাতে দস্তুরমতো আত্মপ্রসাদ অনুভব করল।

মোটরচারী ভাগ্যবানদের জন্যে আমার সহানুভূতি নেই। আমি বিব্রত হয়ে উঠেছি মানব-প্রেমিকদের গঞ্জনায়। মানুষের পিঠে চড়া নাকি অপরাধ। একজন তো স্পষ্টই বললেন, 'তুমি তো বুদ্ধিমান লোক, রিক্‌শা চড়তে তোমার লজ্জা হয় না?'

'আমি বুদ্ধিমান'—এ খবরে পুলকিত হওয়া গেল। কিন্তু লজ্জিত কেন হব এইটে ঠিক বোঝা গেল না। হাতি-ঘোড়া-গরু-গাধা-উটের ওপরে যদি সোয়ার হতে পারি, তা হলে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের কাঁধে চাপতে পারা তো রীতিমতো ভাগ্যের কথা। দেবতাদের মধ্যে কুবের সবচাইতে বুদ্ধিমান (আমার চাইতে নিশ্চয়), তিনি তো খুঁজে পেতে মানুষকেই তার বাহন করে নিয়েছেন। এবং কুবেরের বরপুত্রেরা অতীতের মিশন থেকে সেদিনের বাংলাদেশ পর্যন্ত মানুষের কাঁধেই চড়াও হয়েছেন, কখনো পালকিতে, কখনো ডুলিতে, কখনো দোলায়। এখনো উৎসাহদীপ্ত হলে আমরা উপাস্য বীরদের সোজা কাঁধে তুলে ফেলি—ইলেকশনে জেতার পর, ফুটবল ম্যাচের শেষে, ক্রিকেটের রোমাঞ্চকর সেঞ্চুরির প্রেরণায়। দোষ হল রিক্‌শার বেলাতেই?

যিনি আমাকে লজ্জা দিতে চেয়েছিলেন, আর একটি জিজ্ঞাস্য ছিল তাঁকে। 'বেশ তো, মানবপ্রেমে বিচলিত হয়ে না-হয় আমরা রিক্‌শা চাপা বন্ধ করলুম, কিন্তু এই লোকগুলো কী খাবে? বিকল্প ব্যবস্থা করবেন? বর্ষার কলকাতা যখন দ্বীপপুঞ্জ, তখন নাহয় আমরা সাঁতারই দিলুম, হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নাহয় অ্যাম্বুলেন্সেই ফোন করা গেল, কিন্তু ওদের অন্ন-সংস্থান কোথায় হবে?

ওসব গুরুতর সামাজিক প্রশ্নও না-হয় থাকুক। আমি ভাবছি—পৃথিবীতে আসবার আগে স্নেহ-যন্ত্রণা-ভয় দিয়ে ঘিরে একজন মানুষ আমাকে বয়ে বেরিয়েছে—সে আমার মা; মাটিতে পা দিয়েও তো কতদিন কোলে কোলেই কাটল—সে ভার তো

www.pathagar.com

কারুর দুর্ভর বলে মনে হয়নি। আর যখন এই মাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে—সে কারা?

হার্স—সে আমাদের জিনিস নয়। সৎকার সমিতির গাড়ি—তাও কি মৃতের কাম্য, না, তার প্রিয়-পরিজনের চান? শেষ যাত্রাতেও মানুষ। জন্মের আলোতে যে বয়ে এনেছিল, মৃত্যুর তিমির-দুয়ারেও সে-ই পৌঁছে দেবে।

ট্যাক্সি আমাদের জন্যে নয়—আমরা তাদের ধরতে পারি না। আমাদের এই রিক্‌শাই ভালো। তাই আমাদের চিরকালের প্রতীক, আমাদের জন্মের বিস্ময়, মৃত্যুর বিরতি।

১৬/৭/১৯৬৬

ডলফিনের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি রুশ-বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে একটি আবেদন প্রচারিত হয়েছে পৃথিবীর কাছে। তাঁরা বলছেন, মানুষের স্বার্থে, তার নিজস্ব প্রয়োজনেই ডলফিন শিকার বন্ধ করা হোক। কৃষ্ণসাগরের ধীবরদের নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন—অন্যান্য দেশগুলিও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।

অতল নীল সমুদ্রের বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ ছাপিয়েও তার দুর্গম-গভীর মানুষের কল্পনাকে আকুল করেছে যুগে যুগে। গ্রীক পুরাণের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমুদ্রতলের রহস্যজগৎ তার বর্ণ-বিচিত্র প্রবাল, তার মুক্তার সম্ভার, তার অপূর্ব অপরিচিত প্রাণীদের নিয়ে মানুষের চোখে স্বপ্নের কাজল পরিয়েছে বারবার। ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি জাপানি গল্প, কিংসলির রূপকথা, হানস আন্দেরসনের অপরূপ রূপককাহিনী। আর এই রূপস্বপ্নকে নিবিড় করে তুলতে সবচাইতে সাহায্য করেছে এই ডলফিন।

ভয়ে ভরা অচেনা-সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে—চারদিকেই যখন মৃত্যু আর অনিশ্চয়তা—তখন স্বাভাবিক সংস্কারবশেই মানুষ জেনেছে—কালো পিঠ আর সাদা বুক নিয়ে এই যে একদল সামুদ্রিক প্রাণী তাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—তারা তাদের বন্ধু। মানুষ দেখলে তাদের আনন্দের সীমা নেই, প্রবল বেগে জলের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে সেই উল্লাস প্রকাশ করছে তারা—কখনোবা আনন্দের মাত্রাধিক্যে ডেকের ওপর এসে আছড়ে পড়ছে দু-একজন। তাদের আবির্ভাবের সংকেত থেকে মানুষ জেনেছে, সমুদ্রে ঝড় আসবে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়েছে; কম্পাসহীন রাডারহীন পালের জাহাজ তাদের ওপর লক্ষ রেখে বুঝেছে কূল কত দূরে—কোন দিকে কীভাবে চললে যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন। প্রাচীন নাবিকের কাছে তাই তারা শুভ-সম্ভাবনা, গ্রীকদের কল্পনায় তারা সমুদ্রের কল্যাণসত্তা। একের পর এক অদ্ভুত কাহিনী রচিত হয়েছে তাদের নিয়ে, মানুষের তারা সহমর্মী, মানুষের মতো

www.pathagar.com

সঙ্গীতমুগ্ধ—গ্রীক গল্পের আরিয়ন তাই বাঁশির সুরে ডলফিনকে বিমোহিত করে তার পিঠে চেপে সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধু গালগল্প নয়, আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরো অনেক রহস্যের দ্বার খুলেছে। ডলফিনেরা মানুষের মতোই দাম্পত্যজীবনের অনুরাগী—স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি তাদের অসীম মমতা; তাদের ভাষা আছে—সে ভাষায় তারা ভাব-বিনিময় করে, তারা হাসতে জানে—মানুষ ছাড়া এ শক্তি যে পৃথিবীতে আর কারো থাকতে পারে, এ কল্পনারও অতীত ছিল এতকাল; তাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি বানরের চাইতেও সে মস্তিষ্ক অনেক বেশি উর্বর।

"The dying dolphin's changing hues"—কবি গান গেয়েছেন। আজকের বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, 'ডলফিন শিকার বন্ধ করো।' তার মাংস যতই সুস্বাদু হোক—শিকারীর লোভে ক্রমক্ষীয়মাণ এই সামুদ্রিক প্রাণীটিকে এখনো যদি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা না যায়, তা হলে অতল সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের আত্মিক ঐক্য রচনা করবার যে অপূর্ব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা-ও চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। 'ডায়িং ডলফিন' নয়—জীবনের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করো তাকে। নিঃস্বার্থভাবেই যে মানুষের বন্ধু, মানুষকে দেখাবামাত্র যে আনন্দিত অভিনন্দন জানায়, তাকে এইভাবে নির্বিচারে হত্যা করার মতো নিষ্ঠুর কৃতঘ্নতা আর নেই। তাই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা দিকে দিকে তাঁদের আবেদন পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আজ মহাকাশের দূরতম প্রান্তে পাড়ি দিয়ে তার চিরকালীন অপরিচয়কে আবিষ্কার এবং অধিকার করবার জন্যেই মানুষের মত উতরোল। কিন্তু মাত্র কসমোনট নয়—হাইড্রোনটের সামনেও অতলের তেমনি রহস্যভরা আকুল আহ্বান। আকাশের নিঃসীমতায় মানুষ নিঃসঙ্গ যাত্রী—কিন্তু সমুদ্রের গভীরে মানুষের একটি বিশ্বস্ত সহযাত্রী আছে—সে ডলফিন।

আমরা যা জানি না, তা সে জানে। জানে তার প্রাণীদের খবরাখবর, তাদের রীতিনীতি। জানে হয়তো খাদ্যপ্রাণে ভরা অচেনা গুল্মের সংবাদ, ব্যাধিহর ওষধির বৃত্তান্ত; বলতে পারে—কোথায় ডেরিক বসিয়ে দিলে পৃথিবী-ভাসানো পেট্রোলিয়মের উৎস অবারিত হবে; জানে—কোথায় আছে মুক্তোর অনাবিষ্কৃত বিশাল ক্ষেত্র, কোথায় ছড়িয়ে আছে দামী-দুর্লভ ধাতু-রত্ন; বলতে পারে ঈজীয়ানের কোন নিভৃত নিলয়ে এখনো পড়ে আছে গ্রীক ভাস্কর্যের সব চিরন্তর উজ্জ্বলতা—অনেক ভেনু দ্য মিলো, অনেক দীপ্তমূর্তি ফিবাস আপোলো, অনেক মহিমান্বিত বজ্রধর জুপিতার।

জৈব-খাদ্য সংসারে অনেক আছে, ডলফিনের মাংস না হলেই তার খাদ্যাভাব ঘটবে—একথা সত্য নয়। তবু লোভ সামলানো যাবে? নগদ লাভের মায়া কাটাতে পারলে অনেক বড়ো লাভের সম্ভাবনা আছে ভবিষ্যতে, একথা বোঝানো যাবে সহজেই? তা যদি হত, তা হলে পৃথিবীর অনেক প্রাণীই চির-বিনষ্টির পথে থেকে বেঁচে যেত—জাদুঘরে তাদের ছবি আর কঙ্কাল ছাড়াও আরো অনেক কিছু অবশিষ্ট থাকত আমাদের জন্যে; রঙিন পালকের প্রয়োজনে, শৌখিন চামড়ার পোশাকের

www.pathagar.com

তাগিদে, উজ্জ্বল লোমের দস্তানা পরবার বিলাসিতায় এবং অকারণ হত্যার পুলকে একটির পর একটি প্রাণী-সংঘ এমনভাবে নিঃশেষ হয়ে যেত না। আফ্রিকার ক্ষতবিক্ষত অরণ্যসমাজে এখনো সেই হত্যার তাণ্ডব চলছে—বাংলাদেশের গণ্ডার আর হান্টিং লেপার্ডও তো এইভাবেই লুপ্ত হয়ে এল।

কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলছি কার জন্যে?

আসলে আমাদের রক্তে সেই বাইবেলীয় কেইনের উত্তরাধিকার। বনের প্রাণী, সমুদ্রের ডলফিন—এরা তো অনেক দূরের জিনিস। ভ্রাতৃহত্যার ছুরিতে শান দেওয়াই আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তের অনুচিন্তন। এই রীতিতেই আমরা অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রাচীনতম মানবধারাকে নিঃশেষ করছি : আফ্রিকার গ্রামে গ্রামে পাঠিয়েছি ব্লু-বিয়র্ড রেড-বিয়র্ড জাতীয় হিংস্রতম মানুষ-শিকারীদের; মায়া-সভ্যতার যারা জন্মদাতা—তাদের বন্দুকের লক্ষ্য করে ছুটে গেছি 'এল-দোরোদা'র সন্ধানে। শোষণের স্বর্ণ-সাম্রাজ্য যখন দায়ে পড়ে ছেড়ে গেছি—তখন উপহার দিয়ে গেছি বিষ-জর্জরিত ভারত-পাকিস্তান, রক্ত-কলঙ্কিত কঙ্গো, আজকের যন্ত্রণাবিদ্ধ ভিয়েতনাম। আমাদের অবদান 'মুলাটো', আমাদের অবদান আমেরিকান নিগ্রো, আমাদের অবদান ঔপনিবেশিক দেশে দেশে রাশি রাশি অপজাতক।

অতএব ডলফিন-শিকার আমরা বন্ধ করব না।

ছেলেবেলায় পড়া গলসওয়ার্দির একটা নাটকের কথা আমার মনে পড়ছে। নির্বিচার এবং অন্ধ ক্রোধে একদা যে-মানুষটিকে হত্যা করা হয়েছিল—পরে তারই মর্মর-মূর্তিকে টুপি নামিয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদনের পালা। ঠিক সেই কাজটিই আমরা করব ডলফিনের ক্ষেত্রেও। ভবিষ্যতের যাদুঘরে তার একটি বহুমূল্য মূর্তি চমৎকার করে সাজিয়ে রাখব আমরা, তার তলায় টীকা লিখব : 'এই সমুদ্র-প্রাণীটি একদা মানুষের পরম বন্ধু ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি লুপ্ত হয়ে গেছে।'

১/১০/১৯৬৬

গব্য-জিজ্ঞাসা

স্কুলে আমাকে কখনো গরুর ওপরে রচনা লিখতে হয়নি। তার কারণটা এখন বোধ হয় অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব ছেলেবেলায় যে মাস্টারমশাইরা আমার মতো ছাত্রদের চারণ করতেন, তাঁরা আমাদের হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছিলেন এবং আমাদের দিয়ে আত্মচরিত রচনা করানোকে সম্পূর্ণ বাহুল্য বলেই ভাবতেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য কখনো গরুর সঙ্গে আত্মীয়তা-স্বীকারে প্রস্তুত ছিলুম না—আমাদের সত্যদর্শী মাস্টারমশাইরা যা-ই বলুন। ছেলেবেলায় গরু সম্পর্কে রচনা লিখতে হলে তার আরম্ভে আমি নিশ্চয় লিখতুম : "গরু অতি হিংস্র জন্তু। সে মানুষের পরম শত্রু।" এই সিদ্ধান্ত আমার ভূয়োদর্শন থেকেই আহরিত। কারণ দু-দুবার আমি

www.pathagar.com

গরুর শিঙে উৎপাটিত হয়েছিলুম; আর একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে যখন পাকা আমড়ার লোভে বৃক্ষারোহণে ব্যাপৃত ছিলুম, তখন গরু এসে গাছের তলা থেকে আমার বইখাতা খেয়ে গিয়েছিল এবং তার পরিণামে যা ঘটেছিল তা যে শিঙের গুঁতোর চাইতে অনেক বেশি করুণ—আশা করি আপনারা তা অনুধাবন করতে পারছেন।

তারপর বড় হয়ে জীবনের গোয়ালে ঘাস-বিচুলি চর্বণ করতে করতে গরু নিয়ে আর কোনো গুরুতর তত্ত্বচিন্তার সুযোগ পাইনি। তবে গরুর যে শুধু গরুত্ব নয় গুরুত্বও আছে—কলকাতার রাস্তায় ষাঁড়ের স্ট্রীটস্টাইল সংগ্রাম দেখে সেটা উপলব্ধি করা গেছে; তাদের শিঙে সিন্দূর এবং গলকম্বলে বিলম্বিত মালা ইত্যাদি দেখে জেনেছি তারা বন্দনীয়; এক মুঠো ভাতের জন্যে যখন শহরে হাহাকার তখন কলকাতার অঞ্চলবিশেষে সের-পাঁচেক চালের নিবেদিত অর্ঘ্য ভোঁস-ভোঁস শব্দে ষাঁড়কে আত্মসাৎ করতে দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছি। ভেজিটেবিল ঘী এবং কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্কের যুগে গরুর সঙ্গে আর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনুভব করিনি—আমার চিন্তায় গরু ভয় বিস্ময় এবং ভক্তির এক সুদূর রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে গরুর দুর্জয় শক্তির এক দুর্বার প্রকাশ দেখা গেল। দেখা গেল, ছেলেবেলার সেই আমি তো অতি তুচ্ছ প্রাণী, সর্বশক্তিমান পুলিশের সর্বভারতীয় মহাপতি পর্যন্ত তার শৃঙ্গতাড়নে ভূপাতিত হলেন। একটু 'সেমসাইড' হল বোধ হয়, কিন্তু যে-কোনো 'ক্রান্তিকারী' ব্যাপারেই এ-সব অঘটন ঘটে থাকে। গৌ-মাতা কী জয়!

ধর্মের ব্যাপারে দন্তস্ফুট করবার সাহস রাখি না—এই পাপ-জিহ্বায় 'মরা' যে কখনো 'রাম' হবে সেরকম সম্ভাবনা নেই; রাজনীতি আমার কাছে সাধুভাষার সেই "ব্যালকুল-পরিষেবিত অরণ্যবৎ"—সহস্র যোজন দূরে থাকাই নিরাপদ বলে মনে হয়। তবুও 'কমনম্যান' সুনন্দর বিমূঢ় বিহ্বল চিত্তে দুটো-একটা জিজ্ঞাসা জাগে। নিবেদন করে ফেলি।

গো-রক্ষার জন্যে অকস্মাৎ এই তাণ্ডবের আয়োজন কেন? কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রে তো সে প্রশ্ন ওঠে না। (এবং ধর্মীয় এই নিষেধের অন্তরালেও কিছু বস্তুতান্ত্রিক কারণ আছে বলে যেন পণ্ডিতদের লেখায় পড়েছিলুম—অর্থাৎ গরু এতদ্দেশীয় প্রাণী নয়, আর্যেরা তাকে বাইরে থেকে এনেছিলেন এবং অতিরিক্ত গো-মাংসভক্ষণে যজ্ঞটজ্ঞের পঞ্চগব্যে টান পড়েছিল বলে—কিন্তু ও-সব থাক, আমি ভীমরুলের চাকে ঘা দিতে চাই না!) আর ধর্মই যদি এর প্রেরণা না হয়, তাহলে ইংরেজীতে 'ত্রিদণ্ড' অর্থাৎ ত্রিশূলধারী নাগা সন্ন্যাসীদের কেন এর মধ্যে আমদানি করতে হল? এই মহাপ্রভুরা দূর থেকেই প্রণম্য—এঁরা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হলে যে কী ঘটতে পারে, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সেই নিদারুণ স্ট্যাম্পিড থেকেই কি সে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিনি?

ধরা যাক এই মহামানবেরা স্বয়মাগত—কেউ তাঁদের বরণ করে আনেনি। আন্দোলনসংশ্লিষ্ট অনেকেই গলা খুলে বলেছেন এবং বলছেন—তাঁরা গো-হত্যা বন্ধ করতে চান সমাজকল্যাণের দিক থেকে—দেশে দধি-দুগ্ধ-ঘৃতের অমৃতধারা বইয়ে দেবেন বলে। আদর্শ অতি মহৎ কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আর রাস্তা কি এইটে?

www.pathagar.com

ইউরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে মাখন-দুধের যে প্রাচুর্য—তা কি এই নীতির আশ্রয়েই? গো-মাংস ভক্ষণে ওসব দেশে যে বিন্দুমাত্রও অরুচি জন্মেছে তার সংবাদ তো এ-পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আর ভারতবর্ষের কশাইখানায় গো-হত্যা কি তুলনামূলকভাবে ইউরোপ-আমেরিকার চাইতেও বেশি?

পৃথিবীর বাজারে গরুর চামড়া বিক্রি করে আমরা অনেক টাকা আমদানি করে থাকি; বিশেষজ্ঞরা বলেন এ আমাদের নাকের বদলে নরুণ-প্রাপ্তি; আমাদের রপ্তানির প্রতিটি চামড়াই 'পো দ্য শাগ্র্যা'—তাদের গায়ে অলক্ষ্য অক্ষরে অপচয়, অপুষ্টি, নির্বুদ্ধিতা, শিশু আর রুগ্‌ণ হত্যার কাহিনী লেখা : ভারতবর্ষের গো-হত্যার স্বরূপ দেখতে হলে যেতে হয় তার তৃণহীন গরুর দিকে তাকিয়ে। শহরের খাটালে খাটালে সেই গো-হত্যা অনিবার্য নৈঃশব্দ্যে চালিয়ে যায় গোয়ালার দল—যারা নিষ্ঠাবান হিন্দু, রাম নামে যাদের চোখে প্রেমাশ্রু ঝরে, গোপাষ্টমীর দিনে গো-বন্দনায় যাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় না : বিবিধ ইনজেকশনে, বিচিত্র ফুকায়, ক্ষুধায় মৃত বাছুরের চামড়ায় খড় পুরে—ধোঁকার টাটি তৈরি করে যারা আমাদের ঘরে ঘরে দুধের জোগান দেয়, তিন বছরের মধ্যেই স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল গাভীকে যারা কশাইখানার পথে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু অত কথা ভাববার কী আছে? 'গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে হবে'—এই সেন্টিমেন্টটুকই তো যথেষ্ট। তাতেই প্রাণ উতরোল হয়ে *ওঠে*—ধর্মের টিকি তৎক্ষণাৎ টুকটুক করে নড়ে *ওঠে*—নাগারা ত্রিশূল হাতে আসরে অবতীর্ণ হন, তারপর জ্বলন্ত ভাষার কিছু বক্তৃতা দিতে পারলেই আর দেখতে হয় না—অবিলম্বে প্রেত-তাণ্ডব শুরু হয়ে যেতে পারে।

সুনন্দ ধার্মিক নয়—রাজনীতিক হওয়ার বাসনাও তার নেই। কিন্তু দিল্লীর তাণ্ডব যে ধর্মকেই আঘাত করবে—রাজনীতিকে কলুষিত করবে—সাধারণ মানুষ হিসেবে এই সত্যটা তার কাছে অস্পষ্ট নয়; ভারতবর্ষের বুকে হয়তো অনেক যন্ত্রণাই জমেছে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার সুযোগ নিয়ে ইতিহাসের চাকাকে উল্‌টো মুখে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে? সত্যকে পাশ কাটিয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে আত্মঘাতী অগ্নিকাণ্ডে?

গো-হত্যা নিষেধ আন্দোলন চলতে থাকুক, আর সেই অবসরে ভারতবর্ষের প্রান্তে নিঃশব্দে—ধর্মসম্মতভাবে ব্যাপক গো-মেধ চলুক, কপালে ফোঁটাতিলক কেটে আমরা নির্বিকার হৃদয়ে চামড়া বিক্রির ডলার অর্জন করতে থাকি।

১৯/১১/১৯৬৬

তত্ত্ব এবং সত্য

বেশ উত্তেজিত আলোচনা চলছিল। যাঁরা তর্ক করছিলেন, তাঁরা সকলেই বুদ্ধিজীবী। সেই রাজহংসদলের একান্তে একটি বকের মতো আমিও সমাসীন ছিলুম।

www.pathagar.com

তর্কটা চলছিল বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে। উত্তাপের পারা চড়ে উঠলে ইংরেজির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল, ক্রোধের আধিক্য ঘটলে যেমন অবধারিতভাবে হিন্দী এসে পড়ে। আমি যথাসম্ভব বিতর্কটির বঙ্গানুবাদ করে দিচ্ছি।

শুরু হয়েছিল বেশ নিরীহভাবেই। একজন খানকয়েক চিঠি বিতরণ করেছিলেন আমাদের ভেতরে। তাঁর ছেলের উপনয়ন। চিঠিতে যথানিয়মে একটি দণ্ডধারী ব্রাহ্মণবটু চিত্রিত ছিল, লাল কালি দিয়ে আমাদের নাম লেখা হয়েছিল। আমন্ত্রণ-বাণীর নীচে বিজ্ঞপ্তি ছিল : 'অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে প্রীতিভোজের আয়োজন সীমায়িত।'

আমরা সকলেই ভদ্রতাসম্মত মৃদু হাসিতে চিঠিগুলো নিয়েছিলুম। কিন্তু বেসুরো গাইলেন একজন। হঠাৎ মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে আমন্ত্রণ-কর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি বিলেত থেকে ডক্‌টরেট্‌ পেয়েছিলেন, তাই না?'

প্রশ্নটা প্রথমে বেশ খাপছাড়া মনে হল। জিজ্ঞাসিত ভদ্রলোকটি টাক চুলকে বললেন, 'হাঁ—তা—ও-রকম একটা ঘটেছিল বটে।'

'যে বিষয়টি আপনি পড়ান, সেটি বোধ হয় বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে?'

'তা-ও পড়ে।'

'তা হলে এসব উপনয়ন-টুপনয়ন কেন? আপনি মানেন এগুলো? আপনি মনে করেন, আপনার ছেলে সারাজীবন গলায় পইতে রাখবে, সন্ধ্যে-আহ্নিক করবে, ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক জীবন যাপন করবে, মুরগি-পেঁয়াজের গন্ধে নাক টিপে ছুটে পালাবে?'

'খেপেছেন!'—ভাবী ব্রাহ্মণের পিতৃদেব হাসলেন : 'দিন তিনেক যদি গায়ত্রী জপ করে—'

'তাহলে এই প্রহসন কেন? কেন এসব অপচয়? কী হবে গায়ত্রী দিয়ে? আপনি যদি ভট্‌চার্য-বামুন হতেন, আমার কিছু বলবার ছিল না। আমি জানি, বিলেতে গিয়ে আপনি পরমানন্দে বীফ্‌ খেয়েছেন—আপনার ছেলে দুদিন বাদে এখানেই তা খাবে। দেন্‌ হোয়াই—'

ভদ্রলোক আবার টাক চুলকোলেন : 'মানে একটা সামাজিক প্রথা—মানে চিরকাল চলে আসছে—মানে আত্মীয়-টাত্মীয়—আচ্ছা, আমি উঠি, আমাকে আরো কয়েক জায়গায়—'

তিনি উঠলেন, অর্থাৎ সোজা বাংলায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। তারপরেই তর্কের ঝড় উঠল।

'সামাজিক প্রথা ! ওইটেই হচ্ছে চমৎকার একটা স্কেপ-গোট। অর্থাৎ আমরা নিজেরা কাপুরুষ, সত্যকে জানি, অথচ—'

'আপনিও তো মশাই শালগ্রাম-শিলার সামনে বিয়ে করেছিলেন।'—আর একজন ফোড়ন কাটলেন।

'নট্‌ মী। আমি সিভিল ম্যারেজ করেছিলুম।'

'কালীঘাটে পুজো দিতে যান?'

'নেভার।'

'আপনার স্ত্রী।'

www.pathagar.com

সত্যব্রতী ব্যক্তিটি থেমে গেলেন হঠাৎ। নেবা চুরুটটাকে ধরিয়ে নেবার জরুরী দরকারটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর।

কিন্তু আলোচনা থামল না। ব্রাহ্মণ-তত্ত্ব এগিয়ে গেল অ্যানথ্রোপলোজিতে—শুরু হল আর্যরক্তের বিশুদ্ধিতা নিয়ে গবেষণা। বাঙালীর কৌলীন্য-প্রথার ফলে কী পরিমাণ ভেজাল তার শিরায় এসে ঢুকেছে, সেটি নির্ধারিত হতেই ব্রাহ্মণত্ব হাওয়ায় উড়ে গেল।

তারপর তর্কের শাখা থেকে শাখায়, তা থেকে নানা প্রশাখায়।

'আসলে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় কনট্রাডিকশ্যন। আমরা বড়জোর স্কেপ্‌টিক হতে পারি—কিন্তু একটা অজ্ঞাত রহস্য সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল এবং বিশ্বাস কিছুতেই যায় না।'

'যেমন ভূত মানি না—অথচ গা ছমছম করলে ভালো লাগে।'

'ঠাট্টা নয়, ব্যাপারটা তাই। বাড়িতে সীরিয়াস অসুখ করলে বড়ো ডাক্তার ডাকি, আবার কালীবাড়ি পুজোও পাঠাই। বিলীভ্ ইট্ অর্ নট্—এম. ডি. ডাক্তার নিজের ছেলেকে জলপড়া খাইয়েছেন, এমন ঘটনাও আমি জানি।'

'কারো যদি ধর্মবিশ্বাস থাকে—'

'যদি থাকে, কালীবাড়িতেই পুজো দিক না—ডাক্তার কেন? নাহয় কবরেজই ডাকুক। কিন্তু চিকেন-স্যুপ খাওয়ায় কেন তার সঙ্গে? কেন খাওয়ায় সেই টনিক যাতে ষাঁড়ের লিভার থাকে।'

'আতুরে নিয়মো নাস্তি।'

'ছেঁদো কথা রেখে দিন, মশাই। আসলে এই হচ্ছে আমাদের চরিত্র। আমরা মেটিরিয়্যালিস্টিক ফিলসফিও পড়ব, আবার ঠনঠনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কপালে হাতও তুলব। কাউকেই আমরা ছাড়তে চাই না। কিসে কী হয় যখন জানা নেই, তখন সব দেবতার পায়েই নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া যাক। এই সুবিধেবাদী মনোবৃত্তির জন্যেই আমাদের কোনো ন্যাশনাল ক্যারাকটার গড়ে ওঠে না—এই ফাঁকিবাজির জন্যেই আমরা কোনোদিন দাঁড়াতে পারব না—এমনকি, দেশে সেন্ট পারসেন্ট লিটারেসি এলেও না।'

একজন মহিলা এতক্ষণ নিঃশব্দে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'ওরাও কি একেবারে সংস্কারমুক্ত? তেরোজন টেবিলে বসে? একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে তিনজন সিগ্রেট ধরায়? ক্রিস্‌ট্যাল গ্লোব নিয়ে যাঁরা ভবিষ্যৎ বলে দেন, তাঁরা কি অনাহারে থাকেন?'

'আহা, কিছু কিছু লোক তো থাকবেই। হাই তুলে তারা বুকে ক্রস আঁকবে, পাছে মুখের ভেতরে শয়তান ঢুকে যায়। কিন্তু আমাদের মতো—'

গলা শুকিয়ে গেলে আলোচনায় সাময়িক বিরতি পড়ল। চা এল আর এক প্রস্থ। ঠিক সেই সময় আমরা দেখলুম, ঘরের এককোনায় আমাদেরই এক বন্ধু আর একজনের হাত টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগে ভাগ্যরেখা পরীক্ষা করছেন।

আমরা কী করলুম? কেন, প্রত্যেকেই সেদিকে নিজেদের হাতগুলো বাড়িয়ে দিলুম। না—বিশ্বাস আমরা কেউই করি না, তবুও।

১/৪/১৯৬৭

www.pathagar.com

চিরকালীন

বক্তৃতা শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল। উদ্বোধকের পর প্রধান অতিথি, প্রধান অতিথির পরে বিশেষ অতিথি এবং বিশেষ অতিথির পরে স্থানীয় বিশিষ্ট বক্তা যখন মাত্র দু কথা বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমি সভা থেকে বেরিয়ে এলুম। এর পরে গানের আসর বসবে—সেইটে শুরু হলেই ফেরা যাবে যথাস্থানে। তার আগে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে নেওয়া যাক।

জায়গাটি কিন্তু মনোরম। যেখানে 'রবীন্দ্র জন্মোৎসবে'র সভা চলছে, তার সামনেই একটি মাঠ। সেই মাঠের খানিকটা পর্যন্ত আলোর রেখা আর মানুষের আনাগোনা—তারপর একরাশ তরল অন্ধকার কয়েকটি গাছের ছায়ায় এখানে-ওখানে ঘন হয়ে শান্ত নির্জনতায় এগিয়ে গেছে গঙ্গার দিকে। মাইক-মন্দ্রিত বক্তৃতা যদিও পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছিল, তবু এই নির্জনতা, নিরালোক গঙ্গা আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আমার শরীর মন জুড়িয়ে দিলে। গঙ্গার দিকে চোখ মেলে দিয়ে আমি ঘাসের ওপর বসে পড়লুম—মাথার ওপর দুলতে লাগল গাছের ডাল।

হঠাৎ পাশ থেকে শোনা গেল : 'মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়—'

চমকে চেয়ে দেখি, রবীন্দ্রনাথ নিজেই। আমার কাছ থেকে হাত তিনেক দূরে জোড়াসনে বসে আছেন। কখন এসেছেন জানিনা, অথবা হয়তো বসেই ছিলেন, আমি দেখতে পাইনি। আবছা অন্ধকারে তাঁকে চিনতে আমার এতটুকুও অসুবিধে হয় না। উঠে গিয়ে আমি তাঁকে প্রণাম করলুম।

বললেন, 'বোসো।'

আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লুম। জীবনে এই দুর্লভ সুযোগ কোনোদিন পাইনি, কিন্তু মনে মনে ঠিক জানতুম একদিন এমনি একান্ত করে তাঁর কাছে গিয়ে আমি ঠিক বসতে পারব। তিনি সকলের, তিনি আমারও। আমার অনেক নিদ্রাহীন রাত, অনেক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তিনি তাঁর সঙ্গ দিয়ে পূর্ণ করেছেন—জানতুম, কখনো-না-কখনো এইভাবে তাঁকে আমি পাবই।

কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে বসে রইলেন রবীন্দ্রনাথ, আমি চেয়ে রইলুম তাঁর দিকে। তারপর একটা মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলুম তাঁর। বললেন, 'উঠে এলে যে সভা থেকে?'

'ভালো লাগল না।'

'কী ভালো লাগল না? রবি ঠাকুরকে?'

বললুম, 'না। আমরা যে-কালে বড়ো হয়ে উঠেছি, তখন আপনি আমাদের সবকিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। বাতাসের মতো, জলের মতো আপনি আমাদের লালন করেছেন। যারা প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে পায়নি, তারা কী ভাবে জানি না, কিন্তু আপনাকে ভালো না-লাগার মতো মন আমাদের তৈরি হয়নি।'

'তারা মানে, "কর্তার ভূত" তোমার ঘাড় থেকে এখনো নামে নি।'

www.pathagar.com

'ওভাবে কথাটা বলবেন না। বরং বলুন, গৃহদেবতাকে বসিয়ে রেখেছি যথাস্থানে, তাকে বিসর্জন দেবার কথা ভাবতে পারি না।'

'তার মানে রবি ঠাকুরের অন্ধভক্ত?'

'আমার চপলতা ক্ষমা করবেন। ভক্তি অন্ধ হলে সেটা ভণ্ডামি। দেবতাকে ভক্তি করব, সমালোচনা করব, রাগও করব। ভক্তিটা তাতেই সত্য হয়ে উঠবে।'

রবীন্দ্রনাথ আমার দিকে তাকালেন। ছায়ায়-অন্ধকারে তাঁর চোখ আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু অনুভব করলুম প্রসন্নতা এবং স্নিগ্ধ কৌতুক ঝরে পড়ছে তা থেকে।

'তা হলে উঠে এলে কেন সভা থেকে? ওখানে তো ভক্তি আর সমালোচনা দুই-ই একসঙ্গে চলছিল। এখনো চলছে। একটু কান পাতলেই শুনতে পাবে।'

যিনি 'দুটো কথা' বলবার জন্যে উঠেছিলেন, তাঁর স্বর এখন পর্দায় পর্দায় চড়ছে। সবই শুনতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু সামনে রবীন্দ্রনাথ—বক্তার কথাগুলো তাঁর সেই ব্যক্তিত্বের কাছে এসে অর্থহীন শূন্যতার মধ্যে আছড়ে পড়ছিল। আমি বললুম, 'সেজন্যে উঠে আসিনি। দেখলুম, বক্তারা তাঁদের সুবিধেমতন আপনাকে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে কেউ বুঝতে চান না—বোঝাতেও চান না।'

'তুমিই যে সত্যি করে বুঝেছ তা কী করে জানলে? আত্মবিশ্বাস তো খুব।'

থমকে যেতে হল। আমার একটি অবচেতন অহমিকায় ঘা দিয়েছেন। চুপ করে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর বলুম, 'কিন্তু যা সহজ, যা প্রত্যক্ষ, তাকে ছেড়ে—'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বলছিলে, তুমি আমার ভক্ত। কিন্তু সত্যিই কি তুমি মনে করো যে আমি এত সহজ, এত প্রত্যক্ষ যে আমার সম্পর্কে সব কথা বলা হয়ে গেছে? নতুন করে কিছু আর বলার নেই? তা হলে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের তো কোনো অর্থই হয় না। আমি যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকি, তবে হারিয়েও গেছি। আজ যদি কেউ আমাকে অশ্রদ্ধা করে, অবিশ্বাস করে, তা হলে তুমি তো তার ওপরে রাগ করতে পারো না।'

আমি কিছু বলতে চাইলুম, রবীন্দ্রনাথ হাত তুলে বাধা দিলেন। বললেন, 'তোমরা আমায় কবিগুরু বলেছ, বিশ্বকবির শিরোপা দিয়েছ। আমি আস্তিক—সারাজীবন ধরে মহাবিশ্বের মহাকবির সৃষ্টিকে আমি দেখেছি। তাঁর সূর্যোদয়, তাঁর রাত্রি, তাঁর সমুদ্র, তাঁর মানুষ—এসব আমি যতবার করে দেখেছি, ততবার তারা নতুন অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রূপনারাণের কূলে অপরূপের সীমা আমি কখনো খুঁজে পাইনি। আমি তো তাঁরই কবিশিষ্য—আমার রচনায় যদি মনে মনে কালে কালে আমাকে নতুন করে না পাও, তা হলে তোমাদের এ যুগে আমি কেউ নই, এখন আমার বিশ্রাম ইতিহাসের ভেতরে।'

'কিন্তু আপনার ওপরে যেসব জিনিস আরোপ করা হয়—'

'আরোপ তুমি কাকে বলো? আমি কি নিজেকেই চিনেছি কোনোদিন? কী আমি চেয়েছিলাম, কী আমি পেয়েছি, কী আমি তোমাদের দিতে পেরেছি—তাই কি আমি

www.pathagar.com

জানি? প্রাণের দরজা খুলে দিয়ে যে মানুষ—যে পৃথিবীকে নিজের মধ্যে আমি ডাক দিয়েছি, তারা কোন চিহ্ন, কোন পরিচয় আমার মধ্যে রেখে গেছে, তার হিসেব যদি আজও শেষ না হয়ে থাকে, তা হলে আমি তো তারই মধ্যে বেঁচে আছি। আমার লেখায়, আমার ছবিতে আমারই অচেনা-অজানা আমাকে যত বেশি করে পাবে, ততই আমি তোমাদের কাছে কাছে থাকব, ততই রবিঠাকুর বারে বারে তোমাদের কাছে নতুন হয়ে দেখা দেবে।'

আমি আবার কী বলতে যাচ্ছিলুম, রবীন্দ্রনাথ হাত তুললেন : 'আজ যদি আমার সম্পর্কে কোনো নতুন তথ্য, কোনো নতুন ব্যাখ্যা তোমার ভালো না লাগে, তা হলে তোমার কাছে আমি মৃত। আমি বলছি, তা হলে আর একটা কঙ্কালকে আঁকড়ে থেকো না—কোনো জীবন্ত নবীন কবিকেই তুমি খুঁজে নাও।'

চটকা ভেঙে গেল। সম্মুখের মঞ্চে সমবেত গীতি শুরু হয়েছে : "হে মহাজীবন, হে মহামরণ।" প্রধান অতিথির বক্তৃতা শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

১৩/৫/১৯৬৭

নতুন অচলায়তন

পূর্ব পাকিস্তান বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ। কারণ, তাতে হিন্দু-সংস্কৃতির গন্ধ আছে। বিহার থেকে ইংরেজির বিদায়। কারণ ইংরেজির মধ্যে দাসত্বের অপমান আছে। আসলে দুটোর মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। চিন্তার অন্ধতা আর মানসিক অপরিণতি প্রায়ই এভাবে উলটো গাধায় চড়বার প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। আমরা কেবল ইতিহাসের দেবতাকে ডাক দিয়ে বলব : 'প্রভু, এদের ক্ষমা করিয়ো, কারণ এরা জানে না এরা কী করিতেছে।'

জানতে ইচ্ছে করছিল, পর পর দুটো মহাযুদ্ধের বিষাক্ত-বিদ্বেষে ইংরেজ গোয়টের মহাকাব্য নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে কি না; জার্মান অপেরা, ভাগ্‌নারবাখের নামে ফরাসীরা চমকে ওঠে কি না; শেকস্‌পীয়রকে জার্মানরা গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে কি না; রাশিয়ান ব্যালের কথা শুনতে হান্‌স-গ্রেট্‌চেনদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায় কি না।

মানুষের ইতিহাস, অন্তত সভ্য মানুষের ইতিহাস—সংস্কৃতির সংকোচন নয়, বিস্তার। আত্মীয়করণের শক্তিতেই সাহিত্য বড়ো হয়, মানুষের মুক্তি ঘটে, মজা-নদীর খাতে বহু দেশ, বহু জাতির সঞ্চিত চিন্তার গ্লেশিয়ার থেকে প্লাবন নামে। প্যাগানসভ্যতার অলিম্পিক মশাল থেকে ইউরোপের সাহিত্যে দীপালি জ্বলে ওঠে; ক্যাথলিক চার্চের শিল্পকলা থেকে পাঠ নেবার জন্যে প্রোটেস্টান্ট্‌ পাগল হয়ে ছুটে যায়; নেপোলেয়ঁর জন্যে ফরাসী জাতির যতই দীর্ঘশ্বাস পড়ুক—সেই মহাপ্রস্থানের পরেও ইংরেজি সাহিত্য থেকে স্বচ্ছন্দে অনুবাদ করতে ফরাসীর বাধে না—সে ডি-কুইন্‌সির গদ্যই হোক আর টমাস হুডের কবিতাই হোক।

www.pathagar.com

কিন্তু এক-এক সময় ঘড়ির কাঁটা উল্‌টো দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে, স্বাভাবিক বয়স্ক মানুষকে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটাবার মহতী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে, নানা দেশে এক-একটি বা একগুচ্ছ অলৌকিক প্রতিভার জন্ম হয়। মনে পড়ছে, অমিতকীর্তি হিটলারকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে (অবশ্য অনুপ্রাণিত তিনি ছিলেনই—কেবল বোমার ফিউজে আগুন ধরিয়ে দেবার কাজে) তাঁকে ঘিরে একদল সংস্কৃতিবিদ উপস্থিত হয়েছিলেন—যাঁরা পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তাবৎ লাল রক্ত ঝরিয়ে দিয়ে নীল রক্তের জোয়ার আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রিশ্চিয়নিটির মানবতাবাদের ভেজাল মিশে এই নীল রক্ত যাতে আবার বেগুনী-টেগুনী না হয়ে যায়, সেজন্যে আরো মহৎ প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই সুখী অভিজাত-সন্তান গোয়েরিং। তিনি চেয়েছিলেন—জার্মান জাতি আবার তার সুপ্রাচীন ধর্ম এবং দেবদেবীর উপাসনায় ফিরে যাক। আবার ব্রোকেন-হার্জ পর্বতের আনাচ-কানাচ খুঁজে জার্মানিক সংস্কৃতির লুপ্ত রত্নগুলো কুড়িয়ে এনে সিঁদুর-চন্দন দিয়ে তাদের পূজা করতে থাকুক।

সেইসব লুপ্ত-রত্ন উদ্ধার হয়েছিল কি না, বিধ্বস্ত চ্যান্‌সেলরির ভেতর থেকে তার কোনো উত্তর মেলেনি। কিন্তু হার্জ পর্বত থেকে সেই আকুল আহ্বানে স্বয়ং লুসিফার এবং তাঁর ডাকিনীর দল এসে যে এই প্রতিভাবানদের মগজ অধিকার করেছিলেন, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তাদের নখের আঁচড়ে মনুষ্যত্বের ইতিহাস ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রক্ত ঝরেছে, সেটা বড়ো কথা নয়—সে তো যুদ্ধের হবিসেচন। কিন্তু যত গীর্জা ধ্বংস হয়েছে, চূর্ণ হয়েছে যত মিউজিয়াম, যত চিত্রশালা পুড়ে ছাই হয়েছে, যত লাইব্রেরীর চিতা জ্বলেছে, ততই লুসিফারকে ঘিরে ঘিরে ডাকিনী-নৃত্য জমাট বেঁধেছে। গোয়টের মহকাব্যেও এই ডাকিনী উৎসবের বিবরণ আছে আর একভাবে, কিন্তু সেদিন পৃথিবী জুড়ে এই আনন্দ-মন্থন দেখে, ভাইমারে...তাঁর আত্মা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল—খুব সম্ভব এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু তারও পরে ইতিহাস থামেনি। সে তার রায় দিয়েছে।

একালের কোনো আত্মসচেতন দেশ কল্পনাও করতে পারে, অন্য সংস্কৃতি—অন্য সাহিত্য এসে তাকে আচ্ছন্ন করবে, তার ঐতিহ্যকে আঘাত হানবে? সর্বধর্ম, সমস্ত জাতীয়তার উর্ধ্বে যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ভাষাই যে দুই বাংলার প্রাণের ভাষা—একথাও নাহয় ছেড়ে দেওয়া গেল। কিন্তু বাইরের আক্রমণ থেকে এ-ভাবে ঘর বাঁচাতে গেলে তো শুধু রবীন্দ্রনাথে এসেই থামলে চলবে না। ওই একই লজিকের জোরে সোফোক্লেস-ইউরিপিদিস থেকে কোনো শর্মাই পরিত্রাণ পাবেন না। তখন সব আলো—সব দরজা বন্ধ করে—বেশ নিশ্চিন্ত প্যাঁচার মতো অন্ধকারের সুখনিদ্রা। তখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখা যাবে—এই কোটরটাই পৃথিবী, তার বাইরে আর কিছুই নেই—কেউ নেই।

অথবা বিদ্বেষটা কেবল রবীন্দ্রনাথের ওপরেই? এবং যেখানে তাঁর মহিমা—সেইটেই কারো-কারো কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে?

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ জাতি-ধর্ম-ন্যাশানালিজ্‌ম্—সবকিছুর সংকীর্ণ হিংস্রতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন—এইটেই কি তাঁকে নিষিদ্ধ করবার মূল কারণ? ধর্মের গোঁড়ামি দিয়ে যদি দেশসুদ্ধ মানুষের চোখে ঠুলি পরাতে হয়, তা হলে যিনি সবধর্মান্ধতার বিরোধী, তাঁকেই 'এনিমি নাম্বার ওয়ান' বলে চিহ্নিত করতে হয়—এই কারণেই 'অল কোয়ায়েটে'র বহ্ন্যুৎসব করতে হয়েছিল হিটলারকে; একান্ত বিদ্বেষের দর্শনকেই যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল থিয়োরি হিসেবে দাঁড় করাতে হয়, তা হলে যিনি মানবপ্রীতির বাণীবহ—তাঁকেই সর্বাগ্রে বিতাড়িত করবার প্রয়োজন পড়ে; ন্যাশানালিজ্‌মের যুযুধান দানব-মূর্তির উদ্দেশে যাঁর ধিক্কার সমুদ্যত—উগ্র জাতীয়তাকে মাতিয়ে তুলে সাধারণ মানুষকে 'কামানের খাদ্য' করতে হলে—তাঁকেই বিষধর সাপের মতো বর্জন করতে হয়।

তাই যদি হয়, তা হলে দুঃখ করবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও এই অভিজ্ঞতা নতুন নয়। 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' বইটি লিখবার পরে তাঁকে কী সম্বর্ধনা নানা দেশে লাভ করতে হয়েছিল সে আমরা জানি। আমরা জানি, একদা কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত কীভাবে চীৎকার করে বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিবাদী দর্শন আমাদের মাটি করবে—আমরা আমাদের শৌর্য-বীর্যের সগৌরব উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলব!'

কিন্তু দরজা বন্ধ করলেও কি সূর্য উঠবে না? পদ্মার স্রোত কি উল্‌টো মুখে বইতে থাকবে?

লিখতে লিখতে আজকের কাগজ এল। 'বেতার রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করায় ঢাকায় প্রতিবাদ-মিছিল—পুলিশের লাঠি চালনা—পূর্ববঙ্গ উতরোল—'

না—ইতিহাসের গতি বন্ধ হয় না। পদ্মার স্রোতও কখনো উজানে বইবে না।

৮/৭/১৯৬৭

ফ্যাশান

'সাজের নমুনাটা একবার দেখেছেন?'—থলি থেকে ইলিশমাছের ল্যাজ বেরিয়ে ছিল, কুমড়ো শাক দেখা যাচ্ছিল; বাজারের ইউনিফর্ম—অর্থাৎ রঙ-ওঠা হলদে লুঙ্গি আর ময়লা ফতুয়া পরা, সকালে দাড়ি না-কামানো ভদ্রলোকটি ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্নটা আমাকেই নিক্ষেপ করলেন।

সংক্ষেপে বললুম, 'দেখেছি।'

'বাঙালীর মেয়ের এই মূর্তি! গা জ্বালা করে না?'

'আপনার আমার গা জ্বালা করলে কী আসে যায়? ওরা শুনবে নাকি আমাদের কথা?'

'হুঁ, তা বটে। ফ্যাশানের নিকুচি করেছে মশাই। দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেল।'

ফ্যাশানের জন্যে দেশ উচ্ছন্নে যায় না—ওই মহৎ কাজটি সুসম্পন্ন করবার জন্যে আরো অনেক ভালো ভালো উপায় আছে। নতুন ফ্যাশান অনভ্যস্ত চোখকে পীড়া

www.pathagar.com

দেয়—কখনো কখনো তার সুস্পষ্ট ঔদ্ধত্য আমরা সহ্য করতে পারি না—কিন্তু কী করা যাবে! দুদিন পরেই দেখতে দেখতে সব সহজ হয়ে যায়, তখন একদা যে সাজ-পোশাক নিয়ে প্রচুর উত্তেজিত হওয়া গেছে, নিজের বাড়িতেই তার নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। অতঃপর নতুনতর ফ্যাশানের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে চলি।

ফ্যাশান বস্তুটাই ডাইনামিক—স্থির-স্থবিরতায় তার মৃত্যু। অতএব নিজের নিয়মেই তাকে বারে বারে ইনভেনশন আশ্রয় করতে হয়, বদলাতে হয়, কখনো কখনো বেয়াড়া হতে হয়, কখনো এলিজাবেথীয় যুগের কাপড়-জামা ফিরিয়ে আনতে হয়, কখনো ইতালীয় 'স্কারামুশ' সাজতে হয়, কখনো সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচদের ফ্যাশানে চুল রাখতে হয়, কখনোবা আদিম ইংল্যান্ডের 'দ্রুয়িদ'-দের মতো সর্বাঙ্গে উল্‌কি এঁকে প্রাক্-রোমীয় যুগে ফিরে যেতে হয়। ফ্যাশানের মর্মকথাই হল 'চরৈবেতি'।

ফ্যাশানের সঙ্গে রুচির কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না। আর রুচি বস্তুটা তো আপেক্ষিক। 'আজকালকার টেস্‌টই এই'—এটাও স্রেফ বাজে কথা। রুচির সঙ্গে ব্যক্তিগত রসগত রসবোধ জড়িয়ে আছে—তার একটা ভালো-মন্দের নিজস্ব 'ঈস্‌থেটিক সেন্‌স' মিশে আছে। কিন্তু ফ্যাশান একটা সামগ্রিক ব্যাপার। নিজের যেমনই লাগুক, অন্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নিজের ভালো-মন্দ লাগাকে শিকেয় তুলে রাখতে হয়। তিন ইঞ্চি পাইপের মতো ট্রাউজারকে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করতে গিয়ে যদি প্রাণান্তিক পরিশ্রম করতে হয়, যদি তীক্ষ্ণতম মজুতোর চাপে পায়ের আঙুলগুলো সমস্বরে আর্তনাদ করতে থাকে, যদি প্রচণ্ড গরমে ঝাঁকড়া চুল আর নিবিড় দাড়ি ঘামে আর কুট্‌কুটুনিতে জীবন দুঃসহ করে তোলে, যদি আয়নার সামনে আচমকা নিজের পরমাশ্চর্য মুখচ্ছবি দেখে আঁতকে উঠতে হয়—তবু ফ্যাশানের দুঃসাধ্য সাধনকে বর্জন করা চলে না। কেশ-সম্ভারকে একটি নিপুণ বার্মিজ প্যাগোডায় পরিণত করাবার জন্যে যদি ঘণ্টা আড়াই ব্যয় করতে হয় এবং ফলে খাওয়াদাওয়ার সময়টুকুও বাদ দিতে হয়—তবু উপায় নেই, কালের সঙ্গে চলতেই হবে যে করে হোক। না—ফ্যাশান রুচির ব্যাপার নয়—বরং একদিক থেকে সে একটা দুর্দান্ত 'স্যাক্রিফাইস'।

ফ্যাশানের জন্ম আদিম মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে—এ আমরা অনুমান করে নিতে পারি। কোনো প্রথম 'কেভ্‌ ম্যান' কপালে হয়তো খানিকটা লাল গুঁড়ো মেখে ফেলেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি হলেন ডিস্‌টিংটিভ্‌; কোনো 'বুশ্‌ ম্যানে'র চুলে অসতর্কভাবে একটা সোনালী লতা জড়িয়ে গিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে তিনি হলেন অনুকরণীয়; কোনো 'লেক ম্যান' একটা মাছের কাঁটা হয়তো গলায় ঝুলিয়ে নিলেন—তাই দেখে বিমুগ্ধ হলেন সুন্দরী 'লেক লেডী'রা এবং তারপর থেকে সব তরুণেরা মাছের কাঁটায় বিভূষিত হতে থাকলেন। এইভাবেই ফ্যাশানের জন্ম। ইনভেনশন এবং অনুকরণ—নতুনতর ইনভেনশন এবং নবতর অনুসরণ—চিরকালের ইতিহাস এইভাবেই চলে আসছে। কালিদাসের কালেও বিশ্বসেন-বসুভূতি এবং মালবিকা-চিত্রলেখারা ফ্যাশানেব্‌ল ছিলেন—আজকের

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েরাও ফ্যাশানের ডাইনামিজ্‌মে বিবর্তিত হচ্ছেন। আজ যে বাঁকা সিঁথিধারী এবং লম্বিত কোঁচা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ঝাঁকড়া চুল আর কাউ-বয় পোশাক দেখে অন্তর্জ্বালা বোধ করছেন—তিনিই সোজা সিঁথি কাটেননি এবং কোঁচা দুলিয়েছে বলে একদা পণ্ডিত মশাইয়ের কর্ণমর্দন সহ্য করেছিলেন—একথা আর তাঁর মনেও পড়ে না।

নিজেকে সুন্দরতর করা যাক—কোনো কালে এইটেই হয়তো ফ্যাশানের ইন্‌স্‌পিরেশন ছিল। তারপরে সুন্দর হওয়ার ধারণাই গেল বদলে। ওটাও তো আপেক্ষিক। ম্যান্‌গ্রোভের বিষাক্ত কাঁটায় পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে সেখানে কতগুলো কদাকার মাংসপিণ্ড গজিয়ে তোলা কারো পক্ষে সৌন্দর্যের চরম, লোহার জুতো পরিয়ে মেয়েদের পা-দুটোকে কতটা বিকৃত করা যায়—কারো কারো সেইটেই ছিল সৌন্দর্যের মাপকাঠি। সুতরাং সৌন্দর্যের প্রশ্ন আর রইল না—মনে আকুলতা জাগল, কী করে অদ্বিতীয় হওয়া যায়।

কিন্তু ফ্যাশানের মুশকিল এই যে, কখনোই অদ্বিতীয় থাকা যায় না। অচিরাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং 'আরো অনেক' এসে দাঁড়িয়ে যায়। ইন্‌ডিভিড্যুয়াল কলেক্‌টিভ্‌ হয়ে উঠে। ফ্যাশানের সিংহাসনের কেউ অসপত্ন থাকতে পারে না।

লিখতে লিখতে মনে পড়ল, ফ্যাশানের মূলে শুধু ইনভেন্‌শন নেই,—অ্যাক্‌সিডেন্টও আছে। আর কে না জানে—অ্যাক্‌সিডেন্ট থেকে কত মহৎ ব্যাপারের জন্ম চিরকাল ঘটে আসছে।

একবার কোনো মেডিক্যাল হোস্টেলের একটি শৌখিন ছাত্র—খুব সম্ভব খুশকির জ্বালাতেই—মাথাটা সম্পূর্ণ ন্যাড়া করে ফেলেছিল। অন্যান্য উদ্যোগী ছাত্ররা ভাবল নিশ্চয় এটা কোনো নিদারুণ ফ্যাশান—অতএব পাইকারী হারে হোস্টেলসুদ্ধ ছেলে ন্যাড়া হয়ে গেল। প্রোফেসারেরা প্রথমে সমবেদনায় বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন—এতগুলো ছেলের একসঙ্গে গুরুদশা? ছাত্রেরা অভয় দিয়ে বলে, 'কষ্ট পাবেন না স্যার—ও-সব কিছু নয়, এইটেই লেটেস্ট!'

লেটেস্ট সেই বাঙালী ঘরের জার্মান বধূটিরও—যাঁর খাওয়ার টেবিলে খুড়শ্বশুরের নামাবলীটি পরম যত্নে বিছানো রয়েছে।

ধার্মিক ব্রাহ্মণ খুড়ো ক'দিনের জন্যে ভাইপোর কাছে বেড়াতে এসেছিলেন। ফেরার সময় ভুল করে নামাবলীটি ফেলে এলেন। ভাইপোর জার্মান স্ত্রী। নামাবলী চেনেন না—ভাবলেন লাভ্‌লি ডিজাইনের চমৎকার টেবিল-ক্লথ—পত্রপাঠ সেটিকে ডাইনিং টেবিলে বিছিয়ে ফেললেন। অতঃপর নীচে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এবং উপর যাবতীয় নিষিদ্ধ মাংস এবং অশাস্ত্রীয় পানীয়—। ভাইপো প্রথমে চমকে উঠেছিলেন, তারপরে ভাবলেন কী আর হবে—নামাবলীর জাত তো গেছেই।

এখন বম্বের বাজারে সেই জার্মান-বধূর বান্ধবীরা এই লেটেস্ট ফ্যাশনের টেবিলক্লথটি প্রাণপণে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

৫/৮/১৯৬৭

www.pathagar.com

জনৈক বাঙালী প্রসঙ্গে

'দেশ'-এর পাতায় একটি বাংলা ছায়াচিত্রের সমালোচনা পড়ে ছাড়া-ছাড়া কতগুলো চিন্তা মনে জাগল। ছবিটি আমি এখনো দেখিনি। তবে একই বিষয় নিয়ে একটি মঞ্চসফল নাটক দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। ছবি এবং নাটকের গুণাগুণ নিয়ে বিচার-বিতর্ক করুন চিত্র আর মঞ্চরসিকেরা, আমি অন্য কথা ভাবছি।

বাংলা নাটকের কিংবা ফিল্‌মে ইউরোপীয় চরিত্রের আমদানি হলেই আমার কেমন বিষম লাগে। তাদের বেশ-বাসের ঐতিহাসিকতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—সে তো ড্রেসার আর প্রোডাকশ্যান ম্যানেজারের অবদান। উনিশ শতাব্দীর ইংরেজি কোট-প্যান্ট, এস-বেল্‌ট, ক্রেপের খানিকটা লাল চুল আর হাতে-মুখে মোটামুটি একপ্রস্থ সাদা পেন্ট চাপাতে পারলেই আমাদের কল্পনাকে অবলীলাক্রমে পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া চলে। আমাদের ভাবনায় পর্তুগীজ ভাস্কো-দা-গামা, স্প্যানীয় ফার্দিনান্দ, ফরাসী লালী, ইংরেজ ক্লাইভ—সবাই-ই সাহেব, অতএব একই 'মেক-আপে' 'নীলদর্পণে'র রোগ সাহেব আর সেনাপতি কার্ভালোর কাজ চলে যায়—বাড়তির মধ্যে কার্ভালোকে একখানা তলোয়ার ঝুলিয়ে নিতে হয়।

তা হোক—সেজন্যে আমাদের মনঃক্ষোভ নেই। অভিনয় উত্তেজক হলেই আমরা সোৎসাহে করতালি দিয়ে থাকি, পুলকিত চিত্তে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু ইউরোপীয় চরিত্রের মুখের 'হাম-টোম', 'কেয়া বোল্‌টা হ্যায়', 'মাই গড', 'জলডি কেল্লাকো ডেস্ট্রয় করো'—এইসব শুনলেই আমার মাথার ভেতর কীরকম তালগোল পাকিয়ে যায়। মনে করুন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে পর্তুগীজেরা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতবর্ষে এসে হানা দিয়েছিল, তারা কোন অনৈসর্গিক উপায়ে ভাঙা ইংরেজি বলতে থাকবে—হিন্দীই বা বলতে থাকবে কোন ঐশ্বরিক শক্তিতে এবং কী কারণে? তার ওপরে 'ট বর্গ'? ওটি উচ্চারণ করবার জন্যে লাতিন-গোষ্ঠীর লালী-কার্ভালোকে সারাজীবন ধরেই জিভে শান দিতে হবে যে। ইউরোপীয় মাত্রেই যে ইংরেজ নয়—এ কাণ্ডজ্ঞান আমাদের জন্মাবে কবে?

কিন্তু এসব পণ্ডিতী থাক। বাংলাদেশ আর বাঙালীর খুব আপনজন এন্টুনি কবিয়ালের কথাই ধরুন না। এই জল-মাটিরই একজন হয়ে গিয়ে, প্রাণখোলা গলায় কবিগান গেয়ে 'কৃষ্টে আর খ্রীস্টে' ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে এন্টুনি আমাদের সাহিত্যে আর ইতিহাসে জায়গা করে দিয়েছেন।

এন্টুনির পরিচয় কিংবদন্তী আর লোকশ্রুতির ওপরে নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জাতে পর্তুগীজ। রাজনারায়ণ বসু তাঁকে ফরাসী বলেছেন, কিন্তু বোধ হয় তা নয়—তা হলে নামটা আঁতোয়ান গোছের কিছু হত। যতদূর জানা যাচ্ছে, তাঁরা অন্তত তিনপুরুষ ধরে বাংলাদেশবাসী : তাঁর ঠাকুরর্দা ছিলেন সাবর্ণ-চৌধুরীদের কর্মচারী। একবার লালদীঘিতে সাবর্ণ-চৌধুরীদের দোলের সময় কেল্লার একদল ইংরেজসৈন্য এসে

www.pathagar.com

যখন হামলা আরম্ভ করে—তখন এন্টুনির ঠাকুর্দা লাঠিপেটা করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে কাহিনীও আমরা পড়েছি। তা হলে এন্টুনিরা তিনপুরুষ ধরে বাঙালীঘেঁষা, বাংলাদেশের ভাষা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সংযোগ।

ভারতবর্ষে পর্তুগীজ উপনিবেশের ইতিহাস সামান্য আলোচনা করলেই তার কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—যার সঙ্গে অন্যান্য বিদেশীদের মিলবে না। সূত্রটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন কালিকটের সেই বিচক্ষণ শাসনকর্তা আল্‌বুকার্ক। তাঁর সমগ্র নীতির সার্থকতা ব্যর্থতা যাই থাক, আল্‌বুকার্ক বুঝেছিলেন—এদেশে স্থায়ী হতে গেলে পর্তুগীজদের ভারতীয় হতে হবে, বিয়ে-থা করে পাকাপাকি ঘর-সংসার করতে হবে এখানে। ইংরেজ কলনিস্ট, ব্যবসায়ী বা রাজপুরুষদের মতো ক্ষণবিলাসের সঙ্গিনী জুটিয়ে, কতগুলো অপজাতকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে, এদেশের নদীতে-সমুদ্রে পায়ের কাদা মুছে, জাহাজে ওঠা ঠিক তাদের কল্পনায় ছিল না।

তাদের বাস্তু-বাঁধবার স্বপ্ন কতটা সফল হয়েছিল, তার প্রমাণের জন্যে গোয়া পর্যন্ত দৌড়োতে হবে না, নিম্ন বাংলার বরিশাল-নোয়াখালিতে আজও বাঙালী পর্তুগীজদের দেখা মিলবে। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেসের মতো দুর্ধর্ষ হার্মাদের বংশধরেরাও আজ নিরীহ মেষশাবক হয়ে পূর্ববাংলায় লাঙ্গল ঠেলছে, নির্ভুল বাঙাল-ভাষায় কথা বলছে। অর্থাৎ ক্রীশ্চান ধর্মপ্রচারের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশকে আপন করে নেওয়ার একটা সহজ প্রবণতা তাদের ছিলই—ইংরেজের মতো ছুঁৎমার্গ আর উন্নাসিকতা (অবশ্য কেরী-হেয়ার-অ্যাডাম-লংকে আমরা নিশ্চয় ভুলব না) তারা পোষণ করত না।

অতএব কবিওলা এন্টুনি ফিরিঙ্গিকে আমরা আকস্মিকভাবে পাই না। তাঁর কথা মনে হলেই দেখি, ঠাকুর্দার সঙ্গে তিনি ছেলেবেলায় বাঙালীর পুজো-মণ্ডপে ঘুরছেন, বাংলার উৎসব-অনুষ্ঠান দেখছেন, বাংলায় কথা বলছেন (সাবর্ণ-চৌধুরীদের কর্মচারীও নিশ্চয়ই ভালো বাংলাই বলতেন); বাঙালীর ভালো-মন্দ একই সঙ্গে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। এই দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যেমন কবিগানে গলা মিলিয়েছেন, তেমনি গাঁজার কলকেতেও টান দিয়েছেন। আর—খুব সম্ভব 'ঠাক্‌রে সিংয়ের বাপের জামাই' হওয়ার আগেই 'কুর্তি-টুপি'ও বিদায় করেছেন।

একটি বাঙালী বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন—এমন অনেক বিধবাই তো হিন্দুসমাজের বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্তি এবং মর্যাদা পেয়েছিলেন সেদিন। পর্তুগীজ মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তা তো স্বাভাবিক বটেই, এ ব্যাপারে পরম নির্বিকার হিন্দুসমাজের কোনো পেয়ালাতেও বিশেষ তুফান উঠেছিল কিনা সন্দেহ। আসলে এন্টুনি বাঙালী ছিলেন, বাঙালী বিয়ে করেছিলেন, প্রাণ খুলে বাংলাভাষায় গান গেয়েছিলেন। যে বাংলাদেশে সত্যনারায়ণ অতি সহজে সত্যপীর হয়ে যেতে পারেন, শ্যাম-শ্যামার ব্যবধান যে মাটিতে লুপ্ত হয়ে যায়, যেখানে বৈষ্ণবমতে দুর্গাপুজো হতে পারে—সেই সমদৃষ্টির দেশে এন্টুনিও স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় সংকীর্ণতার সীমা পেরিয়ে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমার আপত্তি এন্টুনির ভাঙা-বাংলা বলাতে, তাঁকে আধখানা 'সাহেব' সাজানোতে, একটু ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে দেখানোতে। একজন বিদেশী কেমন করে নিজের অভ্যাস-পরিবেশ ছেড়ে ক্রমশ আমাদের আত্মীয় হয়ে উঠছেন, নাটকে কিংবা চলচ্চিত্রে এই ব্যাপারটি দেখলে আমাদের বাঙালী সেন্টিমেন্ট উৎসাহিত হয়, আমাদের ভ্যানিটি স্ফীত হয়ে ওঠে। এ আত্মশ্লাঘা ভালোই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, যিনি স্বভাবতই বাঙালী তাকে নতুন করে বাঙালীত্ব দেবার কোনো সার্থকতা আছে কি? এবং সে কাজটাকে কি ঐতিহাসিক বলা উচিত?

২৮/১০/১৯৬৭

মাতৃভাষা

'ওঁর বাড়ির ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতে পারে না।'

'পারে না বুঝি? ওঁরা বাঙালী নন—না?'

'কে বললে বাঙালী নন? পদবী দেখছেন না?

আমি বললুম, 'পদবী থেকে কিছু বোঝা যায় না। আমি এক মিস্টার দত্তকে জানি—যিনি আদি অকৃত্রিম পাঞ্জাবী। অসমীয় ভট্টাচার্য যদি বাংলা বলতে না পারেন তাতে অপরাধের কিছু নেই। সেদিন এক বিজয়কুমার গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হল, কথা বলতে গিয়ে দেখি তিনি মোরাদাবাদের লোক। আর একবার—'

ভদ্রলোক আমাকে আর তথ্য পরিবেষণ করতে দিলেন না। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আরে না মশাই, ওসব কিছু নয়, আমি ওঁদের জানি, আমাদেরই রাণাঘাট সাইডের লোক। অনেকদিন বিলেতে ছিলেন, মেমসাহেব বিয়ে করেছেন, তাই—'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল এতক্ষণে। ম্যাট্রিয়ার্কাল ব্যাপার—মাতৃগোত্র আয়ত্ত করছে ছেলেমেয়েরা। পিতার দিক থেকেও প্রভূত অনুপ্রেরণা আছে নিশ্চয়ই—হয়তো মায়ের চাইতে বেশিই আছে, সেই 'গুড্‌ ওল্‌ড্‌ অ্যালবিয়ানে'র জন্যে আত্মার আকুল আর্তনাদ। কিন্তু তার জন্যে মাতৃভাষা ভুলতে হবে নাকি? ইতালী তো একদা ইউরোপীয় শিল্পের তীর্থভূমি ছিল—সেজন্যে ইউরোপের শিল্পীরা কি ইতালীয় কিংবা লাতিন ছাড়া কথা কইতেন না? ফ্রান্সে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন ডিকেন্‌স্‌—ভুল ফরাসীতে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরের উপন্যাসগুলো তো তিনি ইংরেজিতেই লিখেছিলেন। মালার্মের ইংরেজি-প্রীতি সুবিদিত—অশুদ্ধ ইংরেজি তিনি লিখতেন—কিন্তু ফ্রান্সের ভাগ্য ভালো, মালার্মে ইংরেজ কবি হওয়ার চেষ্টা করেননি। অধ্যাপক এলিয়ট তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য দিয়ে দু-একটি ফরাসী কবিতা লিখেছেন, কিন্তু সেসব কবিতা সম্পর্কে ফরাসীদের মতামত না-শোনাই ভালো। আরো জানতে ইচ্ছে করল কোনো জার্মান যদি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেন, তা হলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা মার্টিন লুথার-গোয়েটের ভাষাকে প্রাণপণে ভোলবার চেষ্টা করেন না?

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের কথা আলাদা।

ইতিহাসের একটা প্যারাডাক্স্ মনে এল ছাত্রজীবনের দূরান্ত থেকে। 'রোম জয় করল আথেন্সকে, আথেন্স জয় করে নিলে রোমকে।' রোমান সিসেরো থেকে হোরেস পর্যন্ত সকলেই কণ্ঠে আথেন্সের মুগ্ধ বন্দনা—গ্রীসের মাটিতে প্রতিটি রোমানের আনন্দিত তীর্থ-চারণা। আমরাও ইংরেজকে বিদায় করে আজ তিনগুণ বেগে তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছি। পার্থক্য কেবল মনস্তত্ত্বে—একটা প্রজ্ঞা আর সংস্কৃতির প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধায়, আর এটা অপরূপ হীনম্মন্যতায়—নাকি বলব অহম্মন্যতায়?

আমি, সুনন্দ নামে একজন 'কমন ম্যান'—যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজি লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে এখনো জীবনের নিশ্বাস ফেলতে পারি, সেই আমি—উত্তরভারতীয় পদ্ধতিতে কিংবা বিহারের হাজীপুরী লাঠির সাহায্যে ইংরেজি তাড়ানোর আগে আত্মহত্যার কথা ভাবব।

কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যম যে উচ্চতর শিক্ষার বাহন হতে পারে না, উঁচুদরের পণ্ডিতী বই বাংলায় লিখলেই যে জাত যাবে, বাংলা মাধ্যমে স্কুলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো যে-কোনো নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তদেরই নিরুপায় প্রয়োজন—উচ্চবিত্তের পক্ষে সেটা ডিগনিটির বাইরে—এইসব ভাবনাকে কোনোমতেই উদরস্থ করতে পারছি না। এবং যাঁরা আন্-কমন—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ থেকে সুনীতি চাটুয্যে-সত্যেন বসু পর্যন্ত—তাঁরাও পারেন না দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য মাতৃভাষার মহিমা নিয়ে সভা-সমিতিতে আমরা নিয়মিত বক্তৃতা করে যাচ্ছি, বাংলা কাগজে ভালো ভালো প্রবন্ধও লিখছি। কিন্তু অর্থভাগ্য থাকলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা সেইসব স্কুলেই ধর্না দেব—যেখানে একটি ছাত্র-ছাত্রীর মাসিক খরচ যে-কোনো মাঝারি করণিকের মাসমাইনের সমান। টাকার জৌলুশেই তো বিদ্যা ঝকমক করে ওঠে।

এইরকম একটি দুর্ধর্ষ স্কুলের প্রবেশপথে একটি ইংরেজি নিষেধবাণী চোখে পড়ল। যার বঙ্গানুবাদ হল এই : 'মাতা-পিতা এবং কুকুরের প্রবেশ নিষেধ!'

'ইন্ডিয়ান্স্ অ্যান্ড ডগস্ প্রহিবিটেড্' লেখা থাকলে এককালে আমাদের রক্ত তেতে উঠত, এখন আর ওঠে না। আমরা অনেক উদার আর সহিষ্ণু হয়ে গেছি। কিন্তু লেখাটা সিম্বলিক। 'চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট্'—মা-বাপকে দিয়ে শুরু হবে প্রথমটায়, তারপর মাতৃভাষা, স্বদেশ, সংস্কৃতি অ্যান্ড্ ডগ্স্ (অবশ্যই আল্সেশিয়ান-ডালমেশিয়ান নয়) প্রহিবিটেড্!

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন (রিপ্লি থেকে আওড়াচ্ছি না), কিছুদিন আগেই লন্ডনের এক রেস্তোরাঁয় কোনও ভারতীয় ছাত্র তাঁর ইংরেজ বন্ধুকে বোঝাচ্ছিলেন : 'স্যান্স্ক্রীট? আসলে ওটা ভারতীয় ভাষাই নয়—ইংরেজির প্রভাবেই ওর জন্ম।' এবং এই যদি সংস্কৃতের ইতিহাস হয় তা হলে আর বাঙালীর ছেলে বাংলা পড়তে যাবে কোন দুঃখে?

www.pathagar.com

লিখতে লিখতে চোখ তুলেছি। সামনের দেওয়ালে ক্যালেন্ডার। একটা আসন্ন তারিখ হঠাৎ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল তার থেকে। একুশে ফেব্রুয়ারি।

একুশে ফেব্রুয়ারি!

রক্ত ঝনঝন করে উঠল। হঠাৎ মনে হল প্রলাপ বকে যাচ্ছি এতক্ষণ। এসব কিছুই লেখার দরকার ছিল না। ওই তারিখটা আমার সব চিন্তার জবাব দিয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি—পূর্ববাংলা! ঢাকা-বরিশাল-ফরিদপুর-রাজশাহী! মাতৃভাষার সম্মান রাখবার জন্যে সর্বাত্মক হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল, ছাত্র-শোভাযাত্রা, লাঠি, গুলি, রক্তস্নান। কিন্তু কোনো শক্তিই তো বাঙালীর মাতৃভাষাকে কেড়ে নিতে পারল না। আমরা অহোরাত্রি রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করছি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বই লিখছি, অথচ রবীন্দ্রনাথের সম্মান তো ওরাই রাখল। বাঙালীর প্রয়োজনে একখানা বাংলা চিঠিও যাদের সরকার লিখতে পারে না—তাদের ডি-ল্যাক্স 'রবীন্দ্র-সদনের' চাইতে পূর্ববাংলার অস্থায়ী ওই শহীদস্তম্ভগুলো অনেক বেশি মূল্যবান।

একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণ-সভা হয়তো কলকাতাতেও হবে। কিন্তু উপাদেয় 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' না থাকলে বাংলাপ্রেমিক ক'জন তাতে যোগ দেবেন, জানি না।
১৭/২/১৯৬৮

একজন মহত্তর ম্যালকম এক্স

তার প্রথম অভিজ্ঞতার বয়স বোধ হয় পাঁচ-ছয়ের বেশি নয়।

সমবয়সী কিংবা আর একটু ছোট একটি সাদা মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, একটু বন্ধুত্বও হয়তোবা—সব শিশুর মধ্যেই যে-ধরনের বন্ধুত্ব হয়।

একদিন স্কুল থেকে সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে বাড়ি ফিরেছিল। আর দরজায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকিনীর মতো তাকে অভ্যর্থনা করল তার মা।

প্রহার—নিদারুণ প্রহার। সেইসঙ্গে মা-র চিৎকার, কান্না, মাথার চুল ছেঁড়া, গালাগালি।

'ওরে হতভাগা, তুই সাদা মেয়েটার সঙ্গে মিশছিলি, কথা বলতে বলতে আসছিলি ওর সঙ্গে! তোর জন্যে যে আমরা সবাই মারা পড়ব—ওরা আমাদের সকলকে খুন করবে, বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

প্রহার, আবার প্রহার। আর সেইদিনই সে জেনেছিল, লিংকন-জেফারসন আর লিবার্টির আকাশছোঁয়া মূর্তির দেশে কালো শিশু হয়ে জন্মানো কী ভয়ঙ্কর অপরাধ!

আমি জার্নাল লিখতে বসি এক সপ্তাহ পরে—আক্ষরিক অর্থে এ লেখা দিনলিপি বা 'জুর্নাল' নয়। তাই আজ যখন লিখছি, তখন ডক্টর মার্টিন লুথার কিং-এর মৃত্যুর সংবাদ পুরনো হয়ে গেছে, বিস্মিত বেদনার চমকটা সারা পৃথিবী অনেকখানি সামলে নিয়েছে, লুথার কিং-এর অন্ত্যেষ্টি সমাপ্ত হয়েছে, আর সাদা-কালোর কুৎসিত

www.pathagar.com

সংঘর্ষের আগুন ধিকি-ধিকি করে জ্বলছে আমেরিকার শহরে শহরে। লুথার কিং আজ মৃত, কিন্তু লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে সরব এবং নীরব গর্জ্জন : 'মার্টিন লুথার কিং অমর'।

গান্ধীজীর তিরোধানে বার্নার্ড শ বলেছিলেন, 'এ থেকে প্রমাণিত হল, খুব ভালো লোক হওয়াটা কী বিপজ্জনক।' কিন্তু ভালো নিগ্রো হতে পারা যে আরো কত বিপজ্জনক সেকথা বলবার সুযোগ শ সেদিন পাননি। এবং আমেরিকায় ভালো নিগ্রো হতে চাওয়া যে আরও কত সাংঘাতিক—তার উদাহরণের জন্যে লুথার কিং-এর মতো আন্তর্জাতিক মানবতারও দরকার হয় না।

রিচার্ড রাইট, এরস্কিন কল্‌ডওয়েল কিংবা চার্লস হোয়াইটের লেখার কথাও ভাবছি না। আমার মনে আসছে অল্প কিছুদিন আগে পড়া একটি বইয়ের কথা : 'অনামা ম্যালকমের (Malcolm X) আত্মরচিত'। যে অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে শুরু করেছি, তা সেই ম্যালকমেরই আত্মজীবনীর অংশ—অথবা আমেরিকার আরো লক্ষ লক্ষ নিগ্রো এক্‌স্‌-ওয়াই-জেডের জীবন-ভূমিকা।

আরো অনেকের মতোই যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যালাভের পর ম্যালকমকে নামতে হয়েছিল জীবিকায়। সেই জীবিকা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল নার্কোটিক বিক্রিতে, তারপর কদর্যতার ধাপে ধাপে। আরো দু পা বাড়াবার পর শুরু হল চুরির ব্যবসা—বলা বাহুল্য, সঙ্গী-সঙ্গিনীরও অভাব হল না।

একটা চোরাই ঘড়ি বেচতে গিয়ে ধরা পড়ল ম্যালকম—যেতে হল জেলে। কিন্তু জেলে এসে নরকের জন্যে আরো ভালো প্রস্তুতিপর্ব ঘটবার আগেই আর এক দিগন্ত-বিভাতি দেখা দিল ম্যালকম এক্স-এর সামনে। এলিজা মহম্মদের 'ব্ল্যাক-মুসলিম' আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল তার। এল কোরান, এল আরও ধর্মগ্রন্থ। অচেনা অক্ষর, অচেনা ভাষা। কিন্তু অসীম ধৈর্য আর শিক্ষার্থীর অক্লান্ত অনুরাগ নিয়ে পাতার পর পাতা আবিষ্কার করতে লাগল ম্যালকম—চোখের সামনে তার দেখা দিতে লাগল সূর্যোদয়।

জেলে বসেই এলিজা মহম্মদের চিঠি পেল সে। আরো জানল, যে দেশ থেকে তার পিতৃপুরুষের দলকে সাদা দস্যুরা ক্রীতদাসরূপে ছিনিয়ে এনেছিল, সে-দেশের হৃদপিণ্ড দলে-পিষে দেওয়া হয়েছিল 'কাঁটামারা বুটের তলায়'—সে দেশের আদিধর্ম ছিল ইসলাম। সেখানে মানুষে মানুষে, চামড়ার রঙে রঙে কোনো পার্থক্য ছিল না। সেখানে সমাজ ছিল, ধর্ম ছিল, নীতি ছিল, মনুষ্যত্বের অধিকার ছিল। 'সে দেশ থেকে আজ আমরা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু ধর্মে, মনুষ্যত্বে, সৎ কাজে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এই নতুন মাতৃভূমিতেই পুরনো পিতৃভূমির উদ্বোধন ঘটাতে হবে।'

যে উজ্জ্বল জীবনের আহ্বানে ক্যাসিয়াস ক্লে মহম্মদ আলিতে নবজন্ম লাভ করেছেন, সেই জীবনের ডাক ম্যালকম এক্স-ও শুনল। বেরিয়ে এল জেল থেকে। ছেড়ে দিলে নেশাভাং, বিকৃত কদাকার দিনচর্যা। ধর্মপ্রচারক হল সে। বলতে লাগল : 'এক হও, সৎ হও, শিক্ষিত হও। নেশা ছেড়ে দাও, বর্জন করো

www.pathagar.com

হিংসা-বিদ্বেষ, সরে আসো সব দুর্নীতির পথ থেকে। প্রতিষ্ঠা করো মসজিদ, গ্রহণ করো ঈশ্বরের নির্দেশ—'

যতক্ষণ কালো নিগার অন্ধকারের যাত্রী ছিল, ততক্ষণ কারো কোনো বক্তব্য ছিল না। এই তো তার করণীয় কাজ। কিন্তু যে-মুহূর্তেই তার সৎ এবং মহৎ হওয়ার চেষ্টা দেখা দিলে, তখনই সাদা মুখগুলো কালো ঘৃণায় কদাকার হয়ে উঠল : "Tryin t' be smart, hey, Nigger?"

অতএব একটি সংক্ষিপ্ত ফুটনোটে ম্যালকম এক্স-এর আত্মজীবনী খণ্ডিত। তাতে জানানো হয়েছে, একটি জনসভায় সে-যখন তার বক্তব্য নিবেদন করছিল, তখন কোনো অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে সে নিহত হয়।

বইটি হাতের কাছে নেই, স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে লিখছি। আশা করছি, মূল কথাগুলো স্মরণে রাখতে পেরেছি। কিন্তু ভালো হওয়ার চেষ্টারই যদি এই পরিণতি ঘটে, তা হলে মানুষ হিসেবে অনেক বড়ো আর অনেক মহৎ হয়ে, ডক্টর লুথার কিং অনেক বেশিদিন বেঁচেছিলেন—এতদিন বাঁচবার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই ছিল না।

স্বয়ং সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় চোখে পড়ল, তাঁরা মানুষের মনে দুটি চেম্বারকে পাশাপাশি দেখেছেন। একদিকে বিজ্ঞান-টেক্‌নলজির চূড়ান্ত প্রকর্ষ; আর একদিকে এখনো আদিম অন্ধকার থমথম করছে—তার মধ্যে উঁকি দিচ্ছে সেই বন্য মুখটা—যার হাতে কাঠের মুগুর, যার দাঁত থেকে গড়িয়ে পড়ছে কাঁচা রক্ত। এই দ্বিতীয় উত্তরাধিকার থেকে আমাদের পরিত্রাণ কবে—কত দিনে?

রোডিশিয়ার সেই হিংস্র মুগুর উঠছে-পড়ছে; লুথার কিং-এর রক্ত এখনো শুকোয়নি।

একমুঠো বেলফুলের গন্ধ এল হাওয়ায়। মনে পড়ে গেল, বাংলা নববর্ষ আসছে।

কোন আশা, কোন বিশ্বাস নিয়ে সেই নববর্ষকে বন্দনা করব? এই প্রভাতের 'সূর্য ওঠা' সফল হবে কোন্ জীবনে? কার হৃদয়ের মধ্যে কে মালা গাঁথছে আজকে? 'দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি'—কোথায় মঙ্গল-শঙ্খ বাজবে, কে বাড়িয়ে দেবে দক্ষিণ পাণি?

সেই অন্ধকার দ্বিতীয় চেম্বারটা থেকে আলো এল তবুও—এল শঙ্খের ধ্বনি—এগিয়ে এল দক্ষিণ বাহু। তলস্তয়-গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথ-লেনিন-লিংকন-কেনেডি-ডক্টর মার্টির লুথার কিং।

১৩/৪/১৯৬৮

বিরাটের মুখোমুখি

যাত্রীবাহী বিমান নয়, বাঁধা পথেও উড়ছিল না। বাঁয়ে হিমালয় আর বনভূমি, ডাইনে সমতলের নদী-ধানক্ষেত-জলাভূমির একটানা একঘেয়ে রেখার জটিলতা। আমি ডানদিকের জানালায় বসে বসে দেখছিলুম, পড়ন্ত রোদে নীচে দিয়ে আমারই

www.pathagar.com

বিমানের ছায়াটা ছোট একটা ফড়িঙের মতো মাটি ছুঁয়ে চলে আসছে—পার হচ্ছে নদী, ডুব দিয়ে উঠছে বনের ভেতর থেকে।

হঠাৎ চোখের দৃষ্টি আমার চমকে উঠল। বেলাশেষের আলোয় অপূর্ব খানিকটা তুষারশীর্ষ সোনা হয়ে ফুটে উঠেছে হিমালয়ের কৃষ্ণ ধূসরতার ওপর। কাঞ্চনজঙ্ঘা? না—সে আমার শিশুকাল থেকে চেনা, শত লক্ষবার তাকে দেখেছি, তার প্রতিটি রেখা আমার জানা। তবে কে এ? গ্রীক গল্পের জিউসের বৃষভমূর্তির কে অমন করে আকাশ ছেয়ে দাঁড়িয়ে?

বুঝতে দেরি হল না। এভারেস্ট। আর মনে পড়ল, আমাদের ছেলেবেলায় এই পথ ধরেই তো লর্ড ক্লাইভসডেল প্রথম এভারেস্টের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বিমানটিকে, এবং তাঁকেও দেখবার দুর্লভ সুযোগ আমার ঘটেছিল।

এভারেস্ট। দিনান্তিক সোনালী আলোতে স্বর্ণ-বৃষভ জিউসের মূর্তি। যেন আর একটু লক্ষ করলে ইউরোপকেও আমি দেখতে পাব। মুগ্ধ চোখ মেলে চেয়ে রইলুম—প্লেনের গতিতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আর দূরত্বে মিলিয়ে গেল এভারেস্ট। ঘোর ভাঙল অনেক পরে—যখন পায়ের নীচের দমদমের রানওয়ে তার আমন্ত্রণের দীপালি মেলে ধরেছে।

এমনি করেই চকিতে আমরা বিরাটকে দেখি। সেই দেখার বিস্ময় আমাদের সমস্ত জীবনকে আলোকিত করে, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতার ওপর মহিমাচ্ছত্র মেলে ধরে। এই পঁচিশে বৈশাখের প্রাক্কালে আমার চোখের সামনে ওই স্বর্ণচূড়ার মতোই ভেসে উঠছে প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণরত রবীন্দ্রনাথের সেই অনন্য রঙিন ছবিটি—গগনেন্দ্রনাথের আঁকা।

আর একটি বিরাটের স্মৃতি আর নিবিড় বেদনায় মনের ভেতরে ফুটে উঠল।

এক বন্ধু নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সামনে বসে তাঁর গান শুনবেন—চলুন।'

সামনে বসে গান শোনা! তাঁকে তো চোখেই দেখিনি এর আগে। রেডিয়োতে, গ্রামোফোন রেকর্ডে কিংবা জলসার রিলেতে (আগে কলকাতায় সংগীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান নিয়মিত রিলে করা হত। শুনেছি তাঁর মধুঝরা কণ্ঠের বিস্তার। জানি, সারা ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ গুণী তিনি, শুনেছি—বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা, এখানে গান গেয়ে তিনি সবচাইতে খুশি হন। মুখোমুখি বসে সেই মানুষটির গান শুনতে পাব? এমন সৌভাগ্য কে কল্পনা করেছিল!

দক্ষিণ কলকাতার একটি বাড়িতে বসেছিল সেই আসর। গৃহস্বামীর কিছু আত্মপরিজন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর সংগীত-জগতের ক'জন বিশিষ্ট নরনারী এবং আমরা দু'জন। ছোট এবং অন্তরঙ্গ আসর।

তাঁকে সেই আমার প্রথম দেখা।

কালো শেরওয়ানী, মাথায় গোল টুপি, সাদা চোস্ত-পাজামা। মুখে মোটা গোঁফ সুদর্শন তিনি আদৌ নন। মধ্যবয়সের মেদে ভারাক্রান্ত শরীর। গালের একদিকে বড়ো একটা মাংসপিণ্ড। সব মিলে প্রথম দর্শনেই স্বপ্নভঙ্গ হয়।

www.pathagar.com

আমার স্ত্রী হতাশভাবে আমার কানে কানে বললে, 'উনিই?'

বললুম, 'হ্যাঁ, উনিই।'

বোধ হয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না। হতাশভাবে চেয়ে রইল।

তাঁর পেছনে তানপুরা হাতে একটি তরুণ, তাঁরই ছেলে। প্রিয়দর্শন, সুদেহী—দু'জনকে পিতা-পুত্র বলে ভাবতেই কষ্ট হয়। তাঁর হাতের কাছে গ্রীক-বীণার মতো বিচিত্র ধরনের একটি বাদ্যযন্ত্র—তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব ওটিও।

কিছুক্ষণ খুচরো গল্প—পরিচিতদের সঙ্গে এক-আধ টুকরো কৌতুক। তারপর শুরু হল তাঁর গান। তানপুরা ধরে সুর রেখে চলল তাঁর ছেলে।

কী গান দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন মনে নেই। হয়তো সেই বিখ্যাত গানটির : "ক্যা করুঁ সজনী, আয়ে ন বালম।" সেই প্রৌঢ়, কুদর্শন মানুষটির, গলায় ঝরে পড়ল কিশোর-কণ্ঠের অম্লান মাধুর্য—সুরে ভরে উঠল ঘর।

আমার স্ত্রী আবার চমকে উঠল : 'উনিই গাইছেন?'—বিশ্বাস করতে পারছিল না—এই চেহারার মানুষ এমন করে অমৃত-বৃষ্টি করতে পারেন।

আমি ফিসফিস করে ধমক দিয়ে বললুম, 'চুপ করো—কী পাগলামি হচ্ছে! উনি ছাড়া আর কে গাইবেন!'

'শাপমোচনে'র অরুণেশ্বর কী মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়? কমলিকার রূপের মোহ চমকে উঠেছিল কাকে দেখে? রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টি কি এইরকম কাউকেই প্রত্যক্ষ করেছিল সেদিন? বলতে পারি না। দেখতে দেখতে তিনি শরীরের সীমা ছাড়িয়ে গেলেন, সুর হয়ে উঠলেন, ছোট আসরটি সেই সুরের গভীরে তলিয়ে গেল। আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু—বিখ্যাত সংগীতশিল্পী তিনি—থেকে থেকে আবেগে 'আহা—আহা' করে উঠছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর সেই উচ্ছ্বাসও যেন বেরসিকের মতো মনে হচ্ছিল আমাদের।

সবশেষে ধরলেন তাঁর সেই আশ্চর্য গান—সেই "হরি ওম্"। যে গানের পরে আর গান নেই—যে সুরের পর আর সমুন্নতি নেই। সব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সব যুক্তিতর্ক ছাড়িয়ে যে গান হিমালয়ের স্বর্ণাভ নিঃসঙ্গ শিখরে আমাদের নিয়ে যায়, যে গান আমাদের মহাবলীপুরমের স্মৃতিশ্বসিত সমুদ্রের তীরে স্তব্ধ করে, যে গান স্তবের মতো উঠে সমস্ত ঘরটিকে আকাশছোঁয়া মন্দিরে পরিণত করে, যে গানের গায়ককে দৈবী-আবির্ভাবের মতো মনে হয়, যে গানে আমাদের সব ইন্দ্রিয়গুলো পঞ্চপ্রদীপের মতো জ্বলে ওঠে।

গান থামল। অর্ধেক শ্রোতা-শ্রোত্রী তখন লুটিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছেন তিনি।

সেই আমি আর একবার বিরাটকে দেখেছিলুম। বেলাশেষের আলোয় স্বর্ণ-বৃষভের মতো ফুটে-ওঠা হঠাৎ সেই এভারেস্ট-শৃঙ্গের মতো, সেই এক নির্জন রাত্রিতে পাহাড়ের কোল আর তালবনের বেলাভূমিতে আছড়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সমুদ্রের মতো, গগনেন্দ্রনাথের আঁকা প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সেই ছবিটির মতো।

কিন্তু ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ আর 'হরি ওম্' গাইবেন না। কোনোদিনই না।

৪/৫/১৯৬৮

www.pathagar.com

স্বদেশ

তোমাকে কিন্তু এবার আসতেই হবে আমাদের 'প্রীতি-সম্মেলনে'।

বললুম, 'গিয়ে কী করব?'

বুড়ো ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন একটু। 'কেন, দেশের সব লোকজন আসবে, দেখা হবে তাদের সঙ্গে।'

'তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তো মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। সম্মেলনের কী দরকার?'

ভদ্রলোকের সরল চোখদুটোতে বেদনার ছায়া পড়ল।

'কেন, দেশের কথা নিয়ে একটা আলাপ-আলোচনা হবে—সে কি তোমার ভালো লাগবে না?'

না, লাগবে না। যে দেশকে পর করে দিয়েছি, যার পদ্মা-মেঘনা-মধুমতী-আড়িয়াল খাঁ—ইলশা-কালাবদর এখন স্বপ্নের নদী, যার মাইলের পর মাইল সুপুরিবনের মাথার ওপর বর্ষার মেঘ নুয়ে পড়েছে, সে এখন রূপকথা। কী হবে সেই স্মৃতিচর্চায়—যা শুধু দুঃখই দেবে?

তবু বললুম, 'আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করব।'

'করো।'—একটু বিরক্ত হয়েই ভদ্রলোক চলে গেছেন।

আমার আর একজনকে মনে পড়ল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'মশাই—একেই বলে অদৃষ্টের রসিকতা।'

'কিরকম?'

'পাসপোর্ট নিয়ে গেছি ইস্টবেঙ্গলে। স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছি—সেই ধানের ক্ষেত, সেই গাছপালার সবুজ, সেই ছোট ছোট গ্রাম। হঠাৎ পাশ থেকে এক পাঞ্জাবী মুসলিম ভদ্রলোক আমায় কী জিজ্ঞেস করলেন, জানেন? বললেন, হাউ ডু ইয়ু লাইক মাই কানট্রি? বুঝুন একবার। আমি এই দেশের ছেলে মশাই, আর একজন পাঞ্জাবী আমাকে—'

বলতে বলতে গলাটা তাঁর ধরে এসেছিল।

আমাদের এখনো ব্যথা বাজে—তা ঠিক। হয়তো মৃত্যুর আগেও ভাবব, এখানকার কোনো শ্মশানে ছাই হয়ে মিলিয়ে না গিয়ে—দেশের 'ভিটেবাড়ি'র সেই পুকুরের পাড়ে যেখানে পূর্বপুরুষদের চিতার ওপর সারি সারি মাঠ, সেখানে যদি কেউ আমার শেষ স্মৃতিটুকু রেখে দিত! কিন্তু এ তো সেন্টিমেন্ট! আমাদেরই শুধু এক একটা দিন-রাত্রি বেদনায় ম্লান হয়ে যায়, আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে তো পূর্ববাংলার সঙ্গে নাইজেরিয়া কিংবা আলাস্কার ভূগোলে কোনো তফাত নেই। পূর্ব পাকিস্তানকে তারা পোলিটিক্যালি জানে, ইমোশন্যালি আর অনুভব করে না—করবার কোনো কারণই নেই।

কারণ নেই—তা ঠিক। তবু আমাদের এই চেতনার স্পন্দন কি আমরা নিঃশব্দে রেখে যাই না উত্তরাধিকারীর রক্তে? প্রাগৈতিহাসিক কোন দুর্লক্ষ্য ধূসরতায়

www.pathagar.com

যাযাবরী-বৃত্তির ওপরে আমাদের বিরাম-যতি পড়েছিল; তারপর থেকে কিছু মাটি, কিছু জল, কিছু পাহাড়, কিছু অরণ্য—তাই দিয়ে গড়ে উঠল আমাদের স্বদেশ-বৃত্ত। সেই দেশের ভৌগোলিক রূপ সঞ্চারিত হল আমাদের ধ্যানে, কল্পনায়, জন্মগত অধিকারের প্রত্যয়ে। আদিম বৃত্তির মতো সেই স্বদেশ-সংস্কারকে আমরা কি আর রক্ততরঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি—দেশকে কখনো না দেখেও কি তার স্পন্দনকে ভুলতে পারে আমাদের উত্তরাধিকারীরা?

তা যদি না হয়, তা হলে তিনশ বছর আগে যারা চলে গিয়েছিল আমেরিকায়, তাদের উত্তরপুরুষের চেতনা কেন মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে সেই সমারসেটশায়ারে 'ঈস্ট ককার' গ্রামের স্মৃতিতে—কেন চারশ বছর আগেকার স্যার টমাস এলিয়টের রাঁন্যাসাস-সম্ভূত প্রত্যয়ের জন্যে একালের টি. এস. এলিয়টের নিশ্বাস পড়ে? ঈস্ট ককারের দার্শনিক পূর্বপুরুষ মিথ্যা বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের ভবিষ্যৎকে দেখেছিলেন—এলিয়েট তা জানেন। কিন্তু আজকের তিক্ত জ্ঞানবৃক্ষের ফলের চাইতে অনেক মধুর ছিল ঈস্ট ককারের সেই ভ্রান্তি—বুদ্ধিবাদী কবি সেই নস্টালজিয়াকে তো অস্বীকার করতে পারেননি।

দেখছি, এই রক্ততরঙ্গের দোলাতে মার্কিন লেখকও পুরো আমেরিকান হতে পারছেন না। গল্প লিখছেন ওয়াইডম্যান—কিন্তু চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে নিউইয়র্ক, স্কাই-স্ক্রেপারের ম্যানহাটান—দেখা দিচ্ছে পিতৃপুরুষের সুদূর অস্ট্রিয়া, তার প্রকৃতি, তার পরিবেশ। শুধু 'ওয়ান্ডারিং জু' নয়—সমস্ত ইহুদী জাতিই তো অভিশপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াল পৃথিবীময়, তবু কি ভুলতে পারল তার প্যালেস্টাইনকে, তার পিতৃভূমিকে? স্বয়ং আইনস্টাইন পর্যন্ত যে ভুলতে পারেননি, তার পরিচয় তো তাঁর আত্মজীবনীতেই রয়েছে।

না—সেই আদিম আহ্বানকে ভোলা যায় না। তাই মার্কিনী কালো মানুষেরাও অপমানিত মানবতার সব গ্লানির ভেতরে থেকে থেকে চকিত হয়, তার কানে আসে অপার অরণ্য থেকে ঢাকের শব্দ, তার বন্য পিতৃপুরুষের শিকারের কলরোল, শুনতে পায় তৃণভূমিতে আকাশফাটা সিংহের গর্জন—সেই গর্জনের সঙ্গে মিশে যায় ঝাম্বেসি-প্রপাতের বজ্রধ্বনি, তার মাথার ভেতরে হিসহিস করে ব্ল্যাক-মাম্বা। তখন আমেরিকার আকাশেও আফ্রিকার কালো মেঘ বিদ্যুৎ চমকায়।

তাই প্রেসিডেন্ট কেনেডিও যখন ইংল্যান্ডে এলেন, তখন—

কেনেডি! আর একটা বজ্রধ্বনি এই মুহূর্তে বেজে উঠল বেতারে। মারাত্মক আহত রবার্ট কেনেডি শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন।

মার্টিন লুথার কিং-এর পর আর এক নরবলি। আবার সেই অন্ধ হিংসার নখদন্ত। প্রতিটি সত্যাশ্রয়ী মানুষের বিরুদ্ধে উন্মত্ত বর্বরতা।

রবার্ট কেনেডিও তাঁর স্বদেশকে ভালোবেসেছিলেন। কিছু গ্লানি, কিছু পাপ মোচন করতে চেয়েছিলেন তাঁর। তাই তাঁকে চলে যেতে হল।

সৎ, সহৃদয় মানুষের স্বদেশ কি কোথাও নেই?

www.pathagar.com

ছেলেবেলায় শ-র 'সেন্ট জোয়ান' নাটকটি পড়েছিলুম। তার কাহিনী-বৃত্ত এখন ঝাপসা। তবু জোয়ানের মরণোত্তর জিজ্ঞাসা আজও শুনতে পাই : 'তোমার পৃথিবী মহামানবদের বরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হবে কবে, হে ঈশ্বর কতদিনে?'

রবার্ট কেনেডি সেন্ট ছিলেন না। আমি আজ আমার পিতৃভূমির জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, কিন্তু একটি সহৃদয় সৎ মানুষের জন্যেও পৃথিবী কেন—মাতৃভূমিই কি তৈরি হয়েছে এখনো?

১৫/৬/১৯৬৮

আত্মপরিচয়

পাশের বাড়িতে নতুন প্রতিবেশীর আবির্ভাব ঘটেছে। একগাদা জিনিসপত্র নিয়ে তাঁরা অত্যন্ত বিব্রত। স্বভাবতই এ বাড়ির স্বামী-স্ত্রী তাঁদের কিছু সাহায্য করাটাকে নৈতিক দায়িত্ব বলে অনুভব করলেন। তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন তাঁরা, স্বামী লাগলেন চেয়ার-টেবিল টানাটানিতে, স্ত্রী গেলেন নতুন গিন্নীর রান্নাঘর গুছিয়ে নিতে। এই নিঃস্বার্থ হিতৈষণায় তাঁরা কেবল নবাগতদের যে আন্তরিক ধন্যবাদই পেলেন তা নয়, পরদিন ডিনারের আমন্ত্রণও লাভ করলেন।

সেই ডিনারে যাওয়ার দু ঘন্টা আগে থেকে স্ত্রী বসে গেলেন রূপচর্চায়। শিল্পীর নিপুণতায় ভুরু আঁকলেন, গাল লালিম করলেন, ঠোঁট রাঙালেন এবং আর যা যা করণীয়, সব করলেন। তারপর আরো একঘন্টা ধরে পোশাক নির্বাচন এবং পরিধান-পর্ব শেষ হলে পরিতৃপ্ত মুখে বললেন, 'হুঁ, আজ ওরা দেখতে পাবে, আমার আসল চেহারা কী রকম।'

একটি বিদেশী পত্রিকা থেকে আহরিত একটি হিউমার। মেয়েদের সম্পর্কে একটু কটাক্ষও যে এতে নেই তা নয়।

আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা আদৌ হাস্যরসাত্মক কিনা। আসলে মানুষের কোন চেহারাটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক আমরা কেউ কি তা জোর করে বলতে পারি? তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় একটু গূঢ় অনুপ্রবেশ করলেই দেখতে পাবেন, জৈবিক উপাদানে আমরা—আদিমের সন্তান-সন্ততিরা সকলেই এক, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্বজনীন ঐক্য বিধৃত। আদিম মানসিকতাগুলোও একই ছিল। কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল এক হলেও সুনন্দ রায় "মি. ইউনিভার্স" নয়—কারণ উক্ত ভদ্রলোক পেশীচর্চা করে এক প্রলয়ঙ্কর বিশালতা লাভ করেছেন। এবং দু এক আউন্স গ্রে-ম্যাটার থাকা সত্ত্বেও সুনন্দ রায়ের ব্রেনের সঙ্গে আইনস্টাইনের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সেটা অনুমান করা খুবই কঠিন ব্যাপার নয়। মিস্টার ইউনিভার্স আর আলবার্ট আইনস্টাইনের আসল পরিচয় তা হলে কেবল অ্যানাটমির অথবা স্বাভাবিক বৃত্তির সর্বজনীন উত্তরাধিকারে নেই—তাঁরা স্বরূপে ফুটে উঠেছেন দেহচর্চায়, মস্তিষ্কের সাধনায়।

www.pathagar.com

কিন্তু এসব দুর্ভাবনা থাক। আরো সহজ কথায় বলা যেতে পারে, মেয়েদের পোশাক আর প্রসাধনও তো সেই উৎকর্ষ সাধনা—সেখানে তারা নিজেদের ইম্‌প্রুভ করছে—নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় ফুটিয়ে তুলছে। আমার যে ভাগনীর বাড়িতে ডাকনাম 'বুড়ী' এবং আধময়লা শাড়ি পরে যে সকালবেলায় মধ্যবিত্ত সংসারের রান্নাঘরে মাছ কুটছে, সন্ধ্যেবেলায় সে যখন সুতনুকা রীতা চট্টোপাধ্যায় হয়ে মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতালিতে অভিনন্দিত হতে থাকে—তখন কোন পরিচয়টা তার সত্যি? জ্যান্ত ট্যাংরা মাছের কাঁটা খেয়ে যে 'বুড়ী' ভবানীপুরের রান্নাঘরে মুখ বাঁকিয়ে বসে আছে, আর যে সুহাসিনীর তানপুরায় হাতের আঙুল জেগে আছে চাঁপার কলির মতো, গলা থেকে একেবারে মধুবৃষ্টি হচ্ছে যার—তাদের কাকে আপনি বলবেন বস্তু, কেই-বা মায়া?

তা হলে সেই মেয়েটি আর কী দোষ করেছিল, সেজেগুজে খুশি হয়ে যে বলেছিল, "আজ ওরা বুঝতে পারবে আমার আসল চেহারাটা কী রকম?"

আমাদের রাজুদার কথাই ভাবা যাক। তিনি রেলস্টেশনে টিকিট-কালেক্টর। তাঁর রেল-মার্কা কোট-প্যান্ট, তাঁর টুপি, গেটে তাঁর সেই তীক্ষ্ণ চোখ এবং প্রসারিত হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকা—ডান হাতে টিকিট নিতে নিতে বাঁ-হাতে কখনো দু'চার আনা পকেটে ফেলে-দেওয়া—এই মূর্তিতেই রাজুদাকে চিরদিন দেখে আসছি। অর্থাৎ রাজুদা মানেই *স্টেশন*, *স্টেশন* মানেই রেলগাড়ি আর ঘণ্টির শব্দ, আর ঘণ্টির শব্দ মানেই "সাত নম্বর শান্তিপুর লোক্যাল চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে"—আর চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম মানেই গেট—আর সেই গেটের সামনে কঠিন মুখ, শ্যেনদৃষ্টি, দুটি হাত সমভাবে কর্মতৎপর : আমাদের রাজুদা। টিকিট-কালেক্টর ছাড়া রাজুদার কোনো এগজিসটেনস্ নেই, *স্টেশন* ছাড়া রাজুদার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই।

সেই রাজুদাকে যখন আমি *স্টেশন*পাড়ার পুজোমণ্ডপে মালকোঁচা এঁটে কাপড় পরে, হাতাকাটা গেঞ্জি চড়িয়ে দুটো ধুনুচি হাতে নিয়ে তাণ্ডব তালে নৃত্য করতে দেখলুম, তখন সমস্ত ব্যাপারটাই আমার অত্যন্ত অবাস্তব বোধ হল। আর অস্বস্তিটা প্রকাশ করতে-না-করতে জনকয়েক আমাকে তেড়ে এল—প্রায় মারে আর কি!

'কী বলছেন মশাই আপনি! রাজুদা তো নাচেরই আর্টিস্ট!'

আর্টিস্ট। নিঃসন্দেহ। না-না, ভরতনাট্যম, মণিপুরী, কথাকলি, কত্থক—এসব গোলমেলে ব্যাপারে তিনি নেই। রাজুদা পুজোর আরতি-নৃত্য, কালীপুজোর ভয়াল-নৃত্য, লক্ষ্মীপুজোর কমনীয়-নৃত্য, বিসর্জনের লরীতে হুলাহুলা-টুইস্ট-চা-চা আর তাণ্ডবের সিন্‌থিটিক নৃত্য—রেলপাড়ায় এই নটরাজরূপেই তিনি বিকশিত। যে রাজুদা টিকিট-কালেক্টর, তিনি আমার কাছে সত্য—যিনি নটনাথ, তিনি রেল-কলোনীতে সত্য। আর যিনি একটা ভাঙা কাপে বুরুশ ডুবিয়ে দাড়ি কামান, ঘুমুলেই যিনি নাক ডাকান, বাজার-ফেরত যাঁর থলেতে পালংশাকের ডগা আর চিংড়ি মাছের শুঁড় দেখা যায়—তিনি একটা বস্তু মাত্র, সত্তা নন।

www.pathagar.com

বাজারের কথায় মনে পড়ল। সেই যে কাল বালকদের কিছু জ্ঞানদান করার জন্যে আমি অধ্যাপনায় ঢুকেছিলুম এবং অচিরেই ছাত্রদের সুখবর্ধন ও নিজের আয়ুবর্ধনের প্রয়োজনে সেখান থেকে পলায়ন করেছিলুম—সেই যুগে আমাকে লাউয়ের টুকরো আর কুচো চিংড়ি আহরণে বিব্রত দেখে একটি ছাত্র—যাকে বলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। যে অধ্যাপক তার কাছে নিছক বাণীমূর্তি এবং বিবিধ ধ্বনিতে অভিনন্দিত হওয়ার উপকরণ মাত্র, সে যে লাউ খায়—কুচো চিংড়ির প্রতি তার যে আকর্ষণ থাকতে পারে—এইটে হৃদয়ঙ্গম করতে নিরীহ ছাত্রটির মুখ প্রাজ্ঞ বায়সের মতো বিবৃত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং কোন আমি সত্য? কোনটা আমার রিয়্যাল সেল্‌ফ?

দেখলুম আমার চেনা অ্যাড্‌ভোকেট জ্যোতির্ময়বাবুকে। এবংবিধ আত্মজিজ্ঞাসার চমৎকার সমাধান করে ফেলেছেন।

তাঁর স্ত্রী বলছিলেন, 'মেয়ের বিয়ে দেবার কোনো গরজ তোমার নেই দেখছি। বেশ, তোমায় কিছু করতে হবে না—বিয়ে আমিই ঠিক করব।'

আইনের বই থেকে উগ্র চোখ তুলে জ্যোতির্ময়বাবু বললেন, 'তুমি বিয়ে দেবে মানে? তোমার একার রাইট? মেয়ে জয়েন্ট প্রপার্টি। তোমার অংশে যদি কিছু করতে চাও, তাহলে আগে লীগ্যাল পার্টিশ্যন করে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই রিয়্যাল সেল্‌ফ। একেবারে পরিপূর্ণ সমন্বয় যাকে বলে।

১৬/১১/১৯৬৮

বাংলার এম. এ. ও টিপসহিগণ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনটির সামনে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। কিছুদিন ধরে ট্রামে চাপবার একটা আকুলতা আমায় পেয়ে বসেছে। এখন আর ট্রামেই সেই সর্বজনীন উদারতা নেই, ট্রাম মানেই বেশি পয়সা আর বেশি পয়সা মানেই আভিজাত্য। অর্থাৎ বাসের গলদ্‌ঘর্ম ঝুলন্ত যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে এখন আমি অনুকম্পার স্মিত হাস্য করতে পারি, একটা খবর শোনাবার মতো ভঙ্গিতে বলতে পারি : 'ট্রামেই এলুম—বাসে কি আর ভদ্রলোকে চড়তে পারে হে!'

এখানে 'ভদ্রলোক' কথাটার তাৎপর্য অন্যবিধ। অর্থাৎ অকুতোভয়ে কন্‌ডাক্‌টারকে ঝাঁ করে কুড়ি পয়সা বার করে দেবার মতো মেজাজ।

অতএব 'ভদ্রোচিত' ভাবে আমি ট্রামের জন্যে প্রতীক্ষা করছি, তখন একটি ঘোষণা কানে এল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শতবর্ষ ভবনটি তো সম্প্রতি ঘোষণারই পীঠস্থান, প্রতিদিনই এখানে বিবিধ উদ্‌ঘোষণ-এর সামনের পথটি তো স্বনামধন্য রণরঙ্গভূমি। কাজেই চমকাবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই ঘোষণাটি রাজনৈতিক নয়, ছাত্র-আন্দোলনকেন্দ্রিক নয়, এ তিন-চারটি তরুণকণ্ঠে 'কর্মখালি'র উদার বিজ্ঞাপন। এই দারুণ সময়েও চেঁচিয়ে চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে হয়? স্বপ্ন দেখছি নাকি?

www.pathagar.com

ঘোষণাটি এই :

'কর্পোরেশনের জন্য কিছু সুইপার প্রয়োজন। বাংলার এম. এ. টিপসহিগণ আবেদন করুন।'

একটু সন্দেহ হল এবার। রসিকতা নাকি? তরুণ ক'টির দিকে চেয়ে দেখলুম। বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র মনে হল। খুব সম্ভব বাংলারই উদীয়মান এম. এ., অন্য কোনো বিভাগের ছাত্র হলে কৌতুকটি নিশ্চয় হাতাহাতিতে পৌঁছোত, কারণ জায়গাটি নিজ মাহাত্ম্যেই ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপিত।

কিন্তু কানে খুব ভালো ঠেকল না। রসিকতাটার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা যেন অনুভব করা গেল।

বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলার এম. এ. নিয়ে অল্পবিস্তর লেখালেখি কাগজে চোখে পড়ছে। কোন এক বাংলার অধ্যাপক নাকি তাঁর সহধর্মীকে নিজের বই দেখিয়ে বলেছেন, 'এই বই আপনি বুঝবেন না—বুঝবেন ইংরেজির অধ্যাপক।' অর্থাৎ বাংলা শিক্ষক হয়েও নিজেদের সম্পর্কে তাঁর অবজ্ঞা এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই অধ্যাপক কে, আমি জানি না। কিন্তু যেহেতু বাঙালী হিসেবে বাঙালীর জীবন আর সমাজের মধ্যে আমাকে বাস করতে হয়, সে-কারণে কিছু কিছু বাংলার এম. এ.-কে নিশ্চয় জানি। জানি, বাংলার এম. এ. পাশ করলে স্কুলের দরজা সভয়ে বন্ধ হয়ে যায় : 'না-না মশাই, আর আমাদের দরকার নেই, আমাদের দপ্তরীও এবার প্রাইভেটে বাংলায় এম. এ. দিচ্ছেন।' জানি, কলেজে বাংলায় একটি লেক্চারের পদ খালি হলে সাড়ে সাতশো দরখাস্ত পড়ে, একশো সাতান্নজনকে ইন্টারভিউ দেওয়া হয় এবং অনেকক্ষেত্রেই চাকরিটা পান সেক্রেটারির ভাইপো বা ভাগনে—যিনি ইন্টারভিউ দেন না। এও জানি, কখনো কখনো বাংলার এম.এ. ডিসকোয়ালিফিকেশ্যন—ওটা চেপে গিয়ে শুধু গ্র্যাজুয়েট বলে দরখাস্ত লিখতে হয়। ব্যাংকে, মার্কেন্টাইল ফার্মে কিংবা সরকারি চাকরিতে 'এগ্জিক্যুটিভ্' হওয়া বাংলার এম. এ.-র কাছে 'দিল্লী হনুজ্ দূর অস্ত্'। জানি, বাংলার ডিগ্রী পাওয়ার পরে একদল ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাণপণে ইংরেজি অর্থনীতি বা ইতিহাসে পরীক্ষা দিয়ে জাতে ওঠবার চেষ্টা করতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ব্যাঘ্র-পুরুষ আশুতোষ—যিনি একদা বাংলার এম. এ. প্রবর্তন করেছিলেন, গণিতের ছাত্র হয়েও এবং সম্ভবত যিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে—দ্বারভাঙা বিল্ডিঙের সোপানশীর্ষের তাঁর মর্মরমূর্তিটি আজ কী ভাবছে আমার জানতে ইচ্ছে করে। এবং প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে বিদ্যাসাগরকে : 'কেন আপনি বাংলার শক্তি আবিষ্কার করতে গেলেন?' দাবি করা যায় মধুসূদনের কাছে : 'আপনার মতো ঘোর ইংরেজিনবীশ কী কারণে, বাংলার ভাণ্ডারে বিবিধ রতন আবিষ্কার করলেন?' 'রাজমোহন্স্ ওয়াইফ্' লিখতে লিখতে বঙ্কিমচন্দ্র কেন 'দুর্গেশনন্দিনী'র পথে অশ্ব ছোটালেন—আজকে তাঁর সেজন্যে জবাবদিহি করা দরকার। আর সবচেয়ে বেশি অপরাধী রবীন্দ্রনাথ : কেন তিনি এমন আশ্চর্য সৃষ্টি করলেন বাংলাভাষায়—কেন এমনভাবে সোনার মন্দিরের দ্বার খুলে দিলেন বাঙালীর সামনে?

www.pathagar.com

আজ বাংলার এম.এ.-রা এঁদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা বাংলাভাষাকে—অর্থাৎ মাতৃভাষায় এম. এ. পাশ করেছেন—তাঁদের অপরাধ, এই ভাষাকে তাঁরা ভালোবেসেছেন। সুতরাং তাঁরা বাংলাদেশে অশ্রদ্ধেয়, অপাঙ্‌ক্তেয় এবং 'হরিজন!' না—হরিজন কথাটা ঠিক হল না, কারণ স্বয়ং গান্ধীজী হরিজনদের মধ্যেই আসন বিছিয়েছিলেন—বাংলার এম.এ.-কে ত্রাণ করবার জন্যে তো কোনো মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটেনি!

হালের কমলাকান্ত শর্মা তাঁর অভ্যস্ত রসিকতায় তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাঙালীর ছেলে বাংলায় পাশ করবে না তো, পাশ করবে কি হিব্রু ভাষায়?' কিন্তু কমলাকান্ত কি জানেন না বাংলাদেশে—ইংরেজির কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি—হিব্রুর সার্টিফিকেট থাকলেও বাংলার এম. এ.-র চাইতে তার পদমর্যাদা বেশি, হিন্দি-কোবিদ হলেও সেটা সগর্বে ঘোষণা করবার মতো? শুধু বাংলার ডিগ্রিই লজ্জায় ম্রিয়মাণ—তাকে কোনা খুঁজতে হয় মুখ লুকোবার প্রয়োজনে।

জানি, বাংলার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন কেউ কেউ। কিন্তু হালের কলেজী শিক্ষায় কোন্ বিষয়ে মান কতটা উঠেছে, একথা জানতে ইচ্ছে করে। বাংলার ছেলেরা কারো চাইতে কম পড়েন না, তাঁদের পাঠক্রম তো দিনের পর দিন হিমালয়ের চাইতেও সমুচ্চ হয়ে উঠছে। কিন্তু তবু বাংলা বাংলাই—সে শতধৌত অঙ্গারের সঙ্গে উপমিত।

কলেজে পড়বার সময় দেখেছি ইংরেজির অধ্যাপককে ইংরেজি জানলেই চলে; আর্থনীতিক, ঐতিহাসিক তাঁর স্ববৃত্তেই পরিতুষ্ট। কিন্তু বাংলার অধ্যাপককে সর্ববিদ্যাবিশারদ হতে হয়। একটি ইংরেজি উদ্ধৃতি থাকলে তার আপাদমস্তক আহরণের চেষ্টায় তাঁর প্রাণান্ত, সংস্কৃত শ্লোক পেলে তিনি পুঁথি ঘাঁটতে বসে যান, এমনকি একটি কবিরাজী রেফারেন্স্ থাকলেও তাঁকে কবিরাজ সেজে বসতে হয়। ইংরেজির অধ্যাপক কীটসের বিখ্যাত কবিতাটি পড়াতে গিয়ে অসংকোচে উচ্চারণ করতে পারে : 'লা বেলে ডেম্ স্যান্স মেরসি'—তাঁর ওটা সংশোধন করবারও প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু বাংলার অধ্যাপক একটা ইংরেজি উচ্চারণ ভুল করলেই নিন্দের বান ডাকে!

সেই হঠভাষী অধ্যাপককে দোষ দিই না। তিনি এই নিদারুণ হীনম্মন্যতা থেকেই বাঁচতে চেয়েছিলেন, ইংরেজি জানেন এইটির ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন কেবল।

'কর্পোরেশনের সুইপার চাই—অতএব বাংলার এম. এ. এবং টিপসহিগণ আবেদন করুন।' নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের দেশে আর কী প্রত্যাশা করা চলে এ ছাড়া? বাংলার এম.এ. কুড়ি পয়সার ট্রামের যাত্রী, আর 'টিপসহিগণ' বাসে ঝুলছে—এই তফাৎ!

১৮/১/১৯৬৯

পাঁচ মাথার অশ্বারোহী

আধুনিক শিল্পী তাঁর নিজস্ব রীতিতে একটি পোর্ট্রেট আঁকলেন, তলায় ক্যাপশন রইল 'মাই ওয়াইফ'। এ-কালের শিল্পীর কাছে কোনো বিমূঢ় ব্যক্তিই অ্যানাটমি জাতীয়

www.pathagar.com

ছেলেমানুষি প্রত্যাশা করতে পারেন না, সুতরাং একরাশ ধ্যাবড়া কালো রঙের ভেতরে কিছু রেখার গোলোকধাঁধা, কোদালের মতো কয়েকটা দাঁতের সাজেস্‌শন্ ক্যানভাস-ছড়ানো একটি—একটি মাত্রই মেদুসা-বিনিন্দিত নয়ন—এই যদি নিজের স্ত্রীর ভাবমূর্তি বলে আর্টিস্টের মনে হয়ে থাকে, তা হলে সংশ্লিষ্ট ভদ্রমহিলা ছাড়া ও-ব্যাপারে কারো কোনো প্রতিবাদ থাকতে পারে না। এবং কখনো কখনো নিজের এই প্রতিকৃতি দেখবার পরে নারীটি যদি বাগান-ছাঁটা কাঁচি কিংবা সস্‌প্যান হাতে করে শিল্পীকে তাড়া করেন, তা হলে সেটা নিতান্তই দাম্পত্য-ঘটিত, আপনার আমার তাতে কোনো বক্তব্য নেই।

কিন্তু স্ট্যাটিউ—বাংলা মতে, স্ট্যাচু, পরিভাষায় যা প্রতিমূর্তি—তার একটা আভিধানিক সংজ্ঞা আছে। তাতে বলা আছে মূর্তিটি মার্বেল কিংবা ব্রোন্‌জ্ যাতেই তৈরি হোক, সেটি জীবন্তবৎ হওয়া দরকার। জীবন্তবৎ কথাটি অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। আমি জনৈক পরিচিত ব্যক্তিকে দেখলেই খ্যাঁকশেয়ালের কথা ভাবি—সুতরাং আমি যদি কখনো ভাস্কর হয়ে তাঁর মূর্তি গড়তুম, তা হলে শেয়ালরূপেই তিনি জীবন্ত হয়ে উঠতেন। তৃতীয় একজন আমাকে জানিয়েছেন—সেই ব্যক্তিটি নাকি আমাকে বিশুদ্ধ রাসভ ছাড়া আর কোনো মূর্তিতে কল্পনা করতে পারেন না; সুতরাং তিনি যদি কখনো আমাকে ভাস্কর্যে বিধৃত করতেন—না মশাই কুলোকের মন্তব্যে কান দিতে নেই।

আসল কথা হল, স্ট্যাটিউ তৈরির ক্ষেত্রে—বিশেষভাবে কোনো মহামানবের মূর্তি রচনায়—তাঁকে একটা সর্বজনীন ভাবের মধ্যে রূপ নিতে হয়—সেটা রদ্যাঁর রীতিতেই হোক আর এপস্টাইনের পদ্ধতিতেই হোক। সাহিত্যিক হোন, বিজ্ঞানী হোন, রাজনীতিক-দার্শনিক-বীরপুরুষ যাই হোন, তাঁর বিশেষ সেই সত্তাটিই প্রতিমূর্তির মধ্যে ফুটে উঠবে। স্পিনোজা হয়তো খুশি হয়েই স্পাগেটি খেতেন এবং শেক্‌স্‌পীয়র বোধ হয় থিয়েটারের বাইরের অভিজাতদের ঘোড়া-টোড়া সামলাতেন—কিন্তু স্পিনোজার ভোজনের ইম্‌প্রেশ্যন নিয়ে কেউ তাঁর মূর্তি গড়বেন না এবং ঘোড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়রের কোনো মূর্তি কোথাও নেই। তাঁদের স্ট্যাটিউ অনন্য দার্শনিকের, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের।

বলা নিষ্প্রয়োজন একালের শিল্পীরা এই বাধাবাধিতে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা সর্বজনীনতার ভাল্‌গারিটির কাছে নতি-স্বীকারে বাধ্য নন—তাঁরা ব্যক্তিক। মনে পড়ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কোনো ইংরেজ ভাস্কর উইনস্টন চার্চিলের একটি মূর্তি গড়েছিলেন; যে দুর্ধর্ষ চার্চিল ইন্‌ভেজন অব ইংল্যান্ডের ঘোর দুর্দিনেও অকুতোভয়—সে মূর্তি দেখে সেই বজ্রপুরুষেরও হৃৎকম্প জেগেছিল। একজন বঙ্গীয় কর্মবীরের কথাও এইসঙ্গে মনে এল। তাঁর কর্মশালায় যেদিন তাঁর মূর্তিটি স্থাপিত হল, তার তিন-চারদিন (সামান্য কিছু বেশি হতেও পারে) পরেই ইহলোক থেকে তিনি প্রস্থান করলেন। হয়তো কাকতালীয়, কিন্তু এমন অনুমান অসম্ভব নয় যে নিজের সেই ভাবরূপটি তাঁর সহনশক্তির মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

একেবারে সমাসন্ন, এই গণতান্ত্রিক অন্তর্বর্তী নির্বাচনের নিদারুণলগ্নে, গজদন্তমিনার-বিলাসী এক আহাম্মকের মতো আমি শিল্পতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন, এ নিয়ে আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক তাপমানের শেষাঙ্ক যখন ছুঁই-ছুঁই তখন কেন এইসব অবান্তর চিন্তা! চিন্তাটা আমার জাগত না যদি-না একই নির্বাচনের রণ-দামামার মধ্যে হঠাৎ শ্যামবাজারের পঞ্চমুণ্ডীতে নেতাজী অশ্বারোহী মূর্তিতে আবির্ভূত হতেন এবং খবরের কাগজ আর জনমতে কিঞ্চিৎ আলোড়ন দেখা দিত!

যাঁরা শিল্পরসিক, তাঁরা প্রাজ্ঞের নীতিতে কোনো মতামত দেননি; যিনি ভাস্কর তিনি সাধ্যমতো ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং একটি ম্লান হাসি হেসে বলেছেন : 'কেউ কি সবাইকেই খুশি করতে পারে?' আর—জনসাধারণ চটেছেন বলে সন্দেহ হচ্ছে; যে কীর্তিমানদের অমিত শ্রম এবং ভাবনার মূর্তিটি স্থাপিত হল, সেই সপ্তদশ (অশ্বারূঢ় নেতাজীর প্রতিষ্ঠা করলেও কেউই তাঁরা অশ্বারোহী নন) নামের ফলকটি পথচারীর বিদ্রূপে অভিনন্দিত হচ্ছে। আশা করি, তাঁরা ব্যথিত হচ্ছেন না—কারণ মহৎকার্যের পুরস্কার প্রায়শ এরকমই হয়ে থাকে।

ঘোড়াই দৃশ্যমান—নেতাজী প্রায় নেপথ্যে? মাথাটিকে জোর করে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে? মুখের ভাব গ্রেসলেস? ঘোড়ার ল্যাজ কামড়ে ধরে একটা কুমীরছানা শূন্যে উড়ছে? জেনারেল আউটরামের প্যারডি? ঘোড়া এগোচ্ছে না—বরং তাকে ব্যাক-গীয়ার দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?

যাঁরা শিল্প বোঝেন না, তার ব্যঞ্জনায় যাঁদের অনুপ্রবেশ নেই, এসব স্থূল সমালোচনা তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই—আমার ধারণা, তাঁরা ব্যাপারটা সুচারুভাবে বুঝতে পারবেন। দু-চার লাইনে আমি তাঁদের আলোচিত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

আন্দাজ করুন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই কতকাল দেশছাড়া। বহুদিন পরে তাঁর মনে হয়েছে, ভারতবর্ষ তো স্বাধীনতার পরে প্রায় দু-যুগ কাটাল—তার অগ্রগতি কতখানি সাধিত হয়েছে একবার সেটা দেখে আসা যাক। অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন না—এখানকার ট্রাফিক রুল্‌স্‌ সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন—ভোলাই স্বাভাবিক। সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় ঢুকতেই সামনে পুলিশের খাড়া পাহারা! তৎক্ষণাৎ মনে পড়েছে, তাই তো—মাউন্টেড পুলিশ আর শোভাযাত্রা-টাত্রায় পারমিশন ছাড়া তো কলকাতায় ঘোড়ায় চলে বেড়ানো বে-আইনি! তৎক্ষণাৎ থতমত খেয়ে রাশ টেনেছেন—বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, মুখ মাথাটা ঘুরে গেছে অস্বাভাবিকভাবে, বোধ হয় ভাবছেন—নম্বর নেবে নাকি? তাঁর ঘোড়া—আরাকানের সেইসব জঙ্গলে পাহাড়ে বেড়ানো যার অভ্যাস, সে তো পাঁচমাথায় ট্রাফিক দেখে আগেই ঘাবড়ে গিয়েছিল, এখন একেবারে হতভম্ব—এগোবে না পিছোবে ঠাহর করতে না পেরে তটস্থ—আতঙ্কে তার ল্যাজ একদম খাড়া! স-অশ্ব নেতাজীর এই বিভ্রান্তিই হচ্ছে মূর্তিটির আসল তাৎপর্য। ঘোড়াটি যে এত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তার কারণ বেশ

www.pathagar.com

জাঁদরেল একটি অশ্বে চড়ে কেউ বেরুলে ঘোড়াই তো লোকের আগে চোখে পড়ে—ঘোড়সওয়ার নয়।

আমি জানি, আপনারা যারা ফিলিস্টাইন, এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তাঁরা মানবেন না। তা হলে অপেক্ষাই করুন। পাঁচমাথার প্রতিমূর্তি সার্থক বা ব্যর্থ যাই হোক—কলকাতার আরও দশটা স্ট্যাটিউর মতো নেতাজীকেও আপনারা অচিরে ভুলবেন। মূর্তির মাথায় কাক-চিল বসে তাদের যা করণীয় করবে, বেদীর গায়ে হাতের চুণ মোছা হবে, পানের পিক ফেলা হবে, ফলকের 'সপ্তদশ' অনেকেই ইলেকশন ইত্যাদি মহৎকর্মে ব্যাপৃত থাকবেন, তেইশে জানুয়ারিতে একছড়া মালা পরিয়ে—একটু সাফ-সুফ করে—কয়েকটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে—

এর বেশিই বা আমাদের কী করবার আছে—বলুন?

৮/২/১৯৬৯

আমার রাশিফল

অন্যান্য যে-কোনো যুক্তিবাদীর মতো হাত-দেখানো, কোষ্ঠীবিচার, ভৃখণ্ড, হোরা বিজ্ঞান ইত্যাদি—যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বাইরে আমি প্রভূত অনুকম্পা এবং উপেক্ষা দেখিয়ে থাকি। লক্ষ কোটি মাইল দূরে থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রেরা কোন এক জৈব-কণিকা সুনন্দ রায়ের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে আসছে, এরকম একটা উদ্ভট কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে যাব এই স্পেসকংকোয়েস্টের যুগে?

তবু একেবারে উচ্চ উচ্চ শিক্ষিত—মানে, পি আর এস, পি-এইচ ডি, ডি এস-সি ইত্যাদি উপাধিওলা অতীব জ্ঞানী ব্যক্তিদের আসরেও কখনো কখনো প্রয়োজনের তাগিদে আমাকে বসতে হয়। তাঁরা তুচ্ছ মাছের দর, বাংলা ফিল্ম—এইসব থেকে শুরু করে বিশ্বের বিবিধ জ্ঞানের জগতে উত্তীর্ণ হয়, আমি মুগ্ধ কাকের মতো হাঁ করে সেই আলোচনাগুলো শুনে থাকি। এরই মধ্যে হঠাৎ অঘটন ঘটে। হয়তো কোনো এক বিদেশী পি-এইচডি—জগতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিচয় যাঁর নখদর্পণে—তিনিই হঠাৎ আর একজনের হাত টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করেন। তারপরেই বিশ্বজ্ঞান সাময়িকভাবে স্থগিত—উক্ত ভদ্রলোককে ঘিরে প্রসারিত হস্তের অরণ্য? আমিও তার ভেতরে হাতটা গুঁজে দেবার চেষ্টা করি। আর সমবেতভাবে মুখে ফুটিয়ে রাখি একটা সকৌতুক হাসির রেখা—ভাবটা : 'সবই তো বাজে, তবু মজাটা দেখাই যাক না একবার'!

কিন্তু মনের অগোচর তো পাপ নেই। যে-কোনো বাঙালী মধ্যবিত্তের মতো জীবনযুদ্ধে যতই বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎটা যতই অতীতে পর্যবসিত হচ্ছে, ততই নিজের ভাগ্যফল জানবার জন্যে আকুল হয়ে উঠছি। আমার জন্মকালে, যে-কোনো বিশ্বাসী হিন্দু-পরিবারের মতো আমারও একটি রাশিচক্র তৈরি হয়েছিল

www.pathagar.com

শুনেছি। কিন্তু পাকিস্তানের বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেটিও অবলুপ্ত—সুতরাং গ্রহ-নক্ষত্রেরা আমার জন্য কোন ভাগ্য তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা আর জানবার উপায় নেই। শুনেছি, জন্মদিন থেকে রাশিচক্র তৈরি করে দেন জ্যোতিষীরা, কিন্তু আমার আর সাহসে কুলোয় না—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কোন কেউটে সাপ বেরিয়ে আসবে কে জানে।

অতএব রবিবারের বাংলা খবরের কাগজে খুলে আমার প্রথম দ্রষ্টব্য : 'রাশিফল'।

কিন্তু সমস্যা হল, আমার কোন রাশি?

মেষ, বৃষ, মিথুন থেকে কুম্ভ, মীন পর্যন্ত সবগুলো অনুধাবন করলুম। বৃষ? উহুঁহু—না মিলছে চেহারায়—না শৃঙ্গধারী পৌরুষে। মিথুন? কিসের মিথুন? গৃহিণী সপ্তাহে চারদিন করে জানাচ্ছেন যে, পৃথিবীর সবচাইতে অপদার্থ লোকটির পাল্লায় পড়েছেন তিনি। কর্কট? আরে ছ্যা—। বৃশ্চিক? নেভার। সিংহ? বাপরে—ওরকম শৌর্যবীর্য কোথায়? ধনু? তা ওইরকমই বেঁকে আছি বটে—কিন্তু তীর-টীর ছুঁড়তে পারি না। কন্যা? অসম্ভব—স্ত্রীজাতি হতে চাই না। তুলা? শেষে দাড়িপাল্লা হব? ইম্‌পসিবল। মকর—মানে কুমীর? না—আমি কারুর ঠ্যাং ধরে তলিয়ে নিতে চাই না। কুম্ভ? ওইরকম হয়ে বসে আছি বটে—কিন্তু কলসী হতে কে চায়—আরো যখন ওতে করে নিজের চেহারার ওপরে রিফ্লেকশন আসে! মীন? আরে রামো—মাছ হতে যাব কোন দুঃখে? বিশেষ করে ইংরেজি 'মীন' শব্দটার একটা বাজে অর্থ আছে যখন।

সুতরাং—বাই ল অভ এলিমেনেশন—মেষটাই পছন্দ করা যাক। বেশ নিরীহ, শান্ত একটি বঙ্গীয় মেষশাবক। লড়াইয়ে মেড়া নয়—ও-রকম দুর্ধর্ষ গোঁ আমার নেই—আমি ইংরেজি নার্সারি রাইমের 'মেরী হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব'-এর সেই ভেড়ার শিশুটি। দ্বিজেন্দ্রলালের জ্বলন্ত ধিক্কার আমাকে লজ্জা দেয় না : 'মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।' আমি বরং 'আমরা'র পরের কমাটাকে 'নহি তো'র পাশে তুলে এনে—আমার দিক থেকেই, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাই : 'মানুষ আমরা নহি তো, মেষ।'

অতএব আমার রাশি আমি আবিষ্কার করেছি।

বেশ ছিলুম—প্রত্যেক রবিবারে রাশিফল দেখে যাচ্ছিলুম বাড়ির বাংলা কাগজটিতে। 'ব্যয়াধিক্যে কষ্ট পাবেন, কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায় না, শত্রুতা বৃদ্ধি হতে পারে, শেষের দিকে আর্থিক উন্নতি হবে—' ইত্যাদি দেখে কখনো পুলকিত, কখনো রোমহর্ষিত, কখনো বিচলিত, কখনো বিমোহিত, কখনো ভাবিত—এইসব হওয়া যাচ্ছিল। মিলুক আর না-ই মিলুক—'অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ করবেন, শত্রুরা পরাভূত হবে, কর্মক্ষেত্রে যশোলাভ করবেন'—এইরকম কোনো মোক্ষম ঘোষণার জন্যে ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করে আছি—এমন সময় আর একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়ে গেল।

রবিবার সকালে এক ভাইপো দেখা করতে এসেছিল, তার হাতে ছিল সেদিনের কাগজ। যাওয়ার সময় ভুল করে ফেলে গেল। আমি এ কাগজটা রাখি না—খুলে, এর 'রাশিফল' দেখে তো আমার চক্ষুঃস্থির।

www.pathagar.com

ইতঃপূর্বে আমার কাগজটিতে মেষ সম্পর্কে জেনেছি : স্বাস্থ্য ভালো যাবে, আয়-ব্যয়ের সমতা থাকবে, ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটামুটি শুভ—কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে উল্টো গাইছে! 'ব্যয়বৃদ্ধিতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবেন, শরীর ভালো যাইবে না—কোনো নতুন প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—' একি ব্যাপার!

মনে একটা জটিল দুর্ভাবনার উদয় হল। প্রতিবেশীর কাছ থেকে তৃতীয় আর একটা কাগজ আনালুম। এবং যা দেখলুম—

যা দেখলুম, তা না বলাই ভালো। মোটের ওপর, সেখানেও ভাগ্যচার্য আর একটি তৃতীয় মত পোষণ করছেন। এঁরা সকলেই তো গুণী ব্যক্তি—কিন্তু আমি কোনদিকে যাই এখন?

কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থাকা গেল। তারপর পরশুরামের 'ভুশণ্ডীর মাঠে'র কারিয়া পিরেতের মতো দরাজ গলায় গেয়ে উঠতে উচ্ছে করল : "আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগলুকে বিটিয়া/কেকরাসে সাদিয়া হো কেকরাসে হো-ও-ও—"!

মানে—আমার 'সাদিয়া'—কোন্ কাগজের 'রাশিফলে'র সঙ্গে?

হঠাৎ একটা জিঘাংসা জাগল। চুলোয় যাক মেষ! আমি তো 'ফ্রী লানস'—যদি জুৎসই একটা ভালো গণনা পেয়ে যাই—যে-কোনো রাশি হতে আপত্তি। বৃষ-বৃশ্চিক-কর্কশ-কন্যা-মকর-মীন—এনিথিং। দেখা যাক—এঁরা তিনজন কোন্ রাশি সম্পর্কে একমত। সেইটেই আমার রাশি—ন্যায়তঃ ধর্মতঃ হতে বাধ্য।

এক ঘণ্টা স্ক্রুটিনী বৃথাই গেল। মতৈক্য মিলল না। আলাদা কাগজের পাঠকের আলাদা রাশিফল হয় কিনা কে জানে!

ঠিক আছে, আমি মরিয়া। প্রত্যেক সপ্তাহে রাশি বদলাব এরপর থেকে। যে-কোনো রাশিতে বিহার করে বেড়াব চন্দ্র-টন্দ্রের মতো আর যেটা সবচাইতে খারাপ—সেইটেই বেছে নেব। নিজের জন্যে এসপার ওসপার হয়ে যাক একটা!

৫/৪/১৯৬৯

যুগকণ্ঠ নজরুল

নজরুলের জন্মদিনে আবার দুই বাংলার শ্রদ্ধা-ভালোবাসা উতরোল হয়ে উঠবে কবির জন্যে। কিন্তু একদার বজ্রকণ্ঠ কবি আজ আর কোনো সম্ভাষণে সাড়া দেবেন না। সব মুখরতা থামিয়ে দিয়ে আজ নিজের গভীরে হৃদয়-বাঁশির কোন সুর শুনতে পাচ্ছেন—সে-কথা একমাত্র তিনিই জানেন। 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' কোন মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে গেছেন, তাঁকে ঘিরে বলয়িত হয়ে আছে তাঁরই সেই বিষণ্ন গানটি : 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।'

নজরুল প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সেদিন আমার এক সঙ্গীতবিদ্ বন্ধু বলেছিলেন, 'বাংলা গানের ক্ষেত্রে নজরুল প্রায় নিঃশব্দে আত্মদান করেছেন।'

www.pathagar.com

'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

'রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদকে দেখুন। বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করে নিয়েছেন তাঁরা—এঁকে দিয়েছেন ব্যক্তিত্বের ছাপ। নজরুলের পক্ষে—তাঁর মতো প্রতিভার হাতেও তা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না, তাঁর গজল তো শুনেছেন। অথচ খাঁটি রাগ-রাগিণীর ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েছেন, বিশুদ্ধ সুরকেই অনুসরণ করেছেন। কোনো নজরুলী নিজস্বতায় তাদের আলাদা করে নেননি।'

গান আমি জানি না, এ যুক্তি কতটা পাকা, তা-ও আমার বিচারের বাইরে। গানের ওপর আমার বন্ধুটির বৃহৎ একখানি বই যন্ত্রস্থ, সেটি প্রকাশিত হলে পণ্ডিতেরা তা নিয়ে তর্ক করবেন।

কিন্তু আমি ভাবছি, এই আত্মদানই তো নজরুলের চরিত্র। জীবনে, সাহিত্যে। 'পরোয়া করি না বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।' গান তাঁর নিজের আনন্দে উচ্ছলিত, কবিতা তাঁর যুগকণ্ঠ। রাজনৈতিক কবিতা লিখে নজরুল কতখানি 'ধ্রুব মূল্যে'র অধিকারী, এ নিয়ে আজ আমরা বিদগ্ধ বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকি। কিন্তু অ্যাকাডেমিক দুর্ভাবনার প্রকরণ হওয়ার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না নজরুলের—যেমন ছিল না মার্কিনী হুইট্‌ম্যানের, যেমন ছিল না ফরাসী পিয়্যার-জ্যঁা দ্য বের‍াঁজের, যেমন ছিল না রুশ মায়াকোভ্‌স্কির। মানবতার উদ্বোধন, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিশ্বশান্তি আর কল্যাণ, বঞ্চিতের মুক্তি অভিযান। বিশুদ্ধ সাহিত্যেকের স্বীকৃতি এঁদের কেউ পেয়েছে, কেউ পাননি। কিন্তু এঁদের মতোই নজরুল ঘোষণা করেছিলেন, 'অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে।'

নজরুলের কবিতা সেদিন ঝড়। এই ঝড় উঠেছিল ইতিহাসের অগ্নিকোণ থেকে। দেশবন্ধুর কালে এর মেঘ-সঞ্চার, কিন্তু আমরা সে-যুগের খবর জানি না। বারো-তেরো বছরে যখন আমরা চোখ মেলেছি, তখনো চট্টগ্রাম জ্বলন্ত। মেদিনীপুরে রিভলভারের গর্জন। ঢাকার বিনয় বসু—রাইটার্স বিল্‌ডিঙে সেই রুদ্র আবির্ভাব। কুমিল্লায় শান্তি-সুনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বীণা দাসের গুলি। লেবং শুটিঙের আসামী ভবানী ভট্টাচার্যের ঘোষণা : 'না, বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই। সুযোগ পেলে আবার চেষ্টা করব।' এমন অসংখ্য—অগণিত।

সেইদিনের—সেই মানসিকতার কবিতাই ছিল 'অগ্নিবীণা'য়, বাজেয়াপ্ত 'বিষের বাঁশি'তে, 'ভাঙার গানে'। 'কারার ওই লৌহকপাট/ভেঙে ফেল কর্ রে লোপাট/ রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণবেদী'—এই-ই সেদিনের অগ্নিমন্ত্র। 'মোরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই/বিষম চলার ঘায়—' এই-ই সেদিন ছাত্রদের গান।

সারাদেশে ঝড়ের অরণ্য। 'ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য/রসাতলে দোলা লাগে।' এই ঝড়ের পটভূমিকে যদি ভুলে যাই—নজরুলকে আমরা কখনো চিনতে পারব না। অগ্নিযুগের কাহিনী লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়, আর আজকের নিরাপদ চায়ের

www.pathagar.com

পেয়ালা নিয়ে, আর্টের কুটিল বিচার তুলে অগ্নিদ্রোহীকে উপেক্ষা করব—এই কৃতঘ্নতা আমি অন্তত ভাবতে পারি না।

সেই বালক-কালের একটি স্মৃতি ফিরে আসছে আমার।

রেলস্টেশন থেকে কুড়ি মাইল গরুর গাড়িতে যেতে হয় এমন জায়গা। পুরনো আমের বাগান আর ঘন বন-জঙ্গলের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা উত্তরবাংলার সুদূর অজ্ঞাত গ্রাম—সেখানে মাঝারি সাইজের জমিদারবাড়ি। জমিদার একবিন্দু জমিদারি বোঝেন না, শিকারে যান না, মদে ডুবে থাকেন না—সিগারেট পর্যন্ত খান না। একটিই তাঁর নেশা—পড়বার নেশা। উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী—সেই দূর পাড়াগাঁয়েও তাঁর প্রকাণ্ড লাইব্রেরী, রাতদিন ডুবে আছেন তারই ভেতরে।

তাঁর লাইব্রেরী থেকে আমি পেয়েছিলুম নতুন একটি কবিতার বই—'সঞ্চিতা'।

সেই ছেলেবেলায় সেখানে আমার নিঃসঙ্গ একান্ততা। নিবিড় গাছগাছালির ভেতর থেকে সারাটা দিন বাংলাদেশের সবরকম পাখির ডাক। নির্জন দুপুরকে উদাস করে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে—বাড়ির আনাচ-কানাচ থেকে পায়রার কলধ্বনি। রাত্রে হাওয়ার শব্দ, পাতার শব্দ, বাদুড়ের পাখার শব্দ, ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠা এক-একটা পাখির কুলুকুলু। জানালার বাইরে প্রকাণ্ড অন্ধকার বাগান 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল'। দেউড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা বেজে যায়, তখনো শুনি কে এক শৌখিন বাঙালী পাইক গ্রামোফোনে শোনা একটা গান গেয়ে চলেছে দরাজ গলায় : 'কাতর ঘুমে চাঁদিমা/রাকা, ভোর গগনের দর-দালানে।' নজরুলেরই গান।

আর ছায়া-ছায়া সকাল, ঝিমঝিম দুপুর, রাত ভরে শব্দের বাজনা, জানালার বাইরে জোনাকিরা—তার মধ্যে আমি 'সঞ্চিতা' পড়ি। পড়ি সকালে দুপুরে, পড়ি ভারী মেহগনি-টেবিলের ওপরে রাখা শাদা গোল বাতিটার রাত্রির আলোয়। 'সিন্ধু' বুঝি না, 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' তখনো আবছা, 'সাম্যবাদী'র সব তাৎপর্য তখনো আমার আয়ত্তের বাইরে। তবু ছায়া, রোদ, দুপুর, পাতা-ফুল-মাটির গন্ধ, জোনাকির রঙ আর ঘুমন্ত পাখিদের স্বপ্ন-ছোঁয়ানো রাত্রি—সেই ঠাণ্ডা ছোট্ট নদীটি, সাঁতার দেবার আগেই যার এপার-ওপার ফুরিয়ে যেত—'সঞ্চিতা'র কবিতাগুলো মিশে যায় তাদের সঙ্গে। একটাই সুর হয়ে যায়।

সেদিন এসবের মানে আমি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এতদিন পরে একটা কথা মনে হয়। যা নিছক কালের কবিতা, তা চিরকালের কবিতার সঙ্গে মিশে যেত কী করে? কী করে এক সুরে মিলে যেত পাখি—দুপুর-রাত্রি-ছায়ার সঙ্গে?

আমার অধ্যাপক বন্ধু থাকলে বলত : 'তুমি কবিতার কিছুই বোঝো না। তোমার সেই অপরিণত ভালোলাগার সঙ্গে সাহিত্য-বিচারের কোনো সম্পর্ক নেই।'

সম্ভব। আমি তর্ক তুলব না।

কিন্তু তত্ত্ব দিয়ে কে কবে কবিতাকে ভালোবেসেছে? ছবি, কবিতা, কোনো বিশেষ সুর—এসবই তো ব্যক্তি-সাপেক্ষ। এই নজরুলকে আমি কী করে ভুলি যাঁর

www.pathagar.com

রৌদ্রী-রাগিণীতে সেই উপপ্লবের লগ্নে আমাদের হৃদয় জেগেছিল—আমার দিন-রাত্রি-পাখি-জোনাকি মিশে গিয়েছিল যাঁর কবিতার সঙ্গে?
২৪/৫/১৯৬৯

বেশি লেখা

অনেককাল পরে অধ্যাপক এসেছিল। আর এসেই সে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে বাণী দিতে লাগল।

আমি আপত্তি করবার কিছু দেখতে পেলুম না। এসব ব্যাপারে একটা সুনিশ্চিত থিয়োরি আছে আমার। বাংলা লেখক এবং বাঙালী লেখকরা ক্লাবঘরের বাঁয়া-তবলার মতো নিরঙ্কুশ আর সর্বজনীন সম্পত্তি, যে কেউ—যখন খুশি, বাজাতে না-জানলেও পরমানন্দে চাঁটিয়ে যেতে পারেন। আর অধ্যাপক, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র পাওয়া জ্ঞানী ব্যক্তি—সেহেতু বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে শেষকথা বলবার মৌখিক অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। আমি নির্বিবাদে তার বক্তৃতা শুনতে লাগলুম।

শেষ পর্যন্ত বললে, 'বাঙালী লেখকেরা বড্ড বেশি লেখেন।'

'ওদেশেও সবাই খুব কম যান নাকি? বালজাক কী পরিমাণে লিখেছেন? আধুনিককালের সবচাইতে বেশি অক্ষর তলস্তয়ের কলম দিয়েই কি বেরোয়নি?'

'কিন্তু অতিরিক্ত লিখে দু'জনেই মাটি হয়ে গেছেন। তা ছাড়া ওসব বড়ো প্রতিভার কথা ছাড়ো। রবীন্দ্রনাথের অনেক পঙ্গু রচনাকেও ক্ষমা করতে রাজী আছি, বিকজ় হি ইজ় টু গ্রেট। অল্প পুঁজির যে-কোনো লেখকই যখন অনেক বেশি লিখতে চেষ্টা করে, তখনই আধপেয়ালা দুধে লিটার লিটার জল মিশতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্রেফ জল ছাড়া কিছুই থাকে না। এখনকার বাংলাসাহিত্যের দিকেই তাকাও।'

আজকের বাংলাসাহিত্য বিশুদ্ধ জলীয়, এই জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত আমি মানতে পারলুম না। কিন্তু অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্ক করা যায় না—পেশাদারী বক্তৃতার বন্যায় লজিককে ভাসিয়ে দেয় তারা। কথা না বাড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, 'তোমার মতে লেখকের কী আদর্শ হওয়া উচিত?'

'কাফ্‌কা। ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কা।'

'কিন্তু কাফ্‌কার আদর্শ মানতে হলে তো দুটো-একটা গল্প ছাড়া সবই আগুনে দিতে হয়। ভাগ্যিস মাক্‌স্ ব্রড অন্তিম ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করেননি, নইলে—'

'থামো, বেশি বোকো না।'—অধ্যাপক আমায় থামিয়ে দিলে : 'আসল কথা—একটি দুটি বই লেখো—সলিড্। বছরের পর বছর সাধনা করো বই লেখার জন্যে, রিভাইজ করো, আবার লেখো, তারপরে যা দাঁড়াবে তা খাঁটি জিনিস।'

আরো খানিকক্ষণ বকবক করে, আর এক পেয়ালা কফি খেয়ে অধ্যাপক উঠল।

কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে দিয়ে গেল। মাত্র একটি দুটি বই—সারাজীবনের সাধনা! ঠিক কথা—এরকম বই নিশ্চয়ই খুব ভালো হতে পারে, বিশেষ করে বিষয়টা যদি

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞানের হয়। কিন্তু একথা জোর করে বলা যায় সাহিত্য সম্পর্কে? পরিশ্রম করে—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর খেটে দুটি-একটি উপন্যাস দাঁড় করালেই তা উতরে যাবে? যদি না যায়? যদি মানুষের চিন্তায় অনুভূতিতে তা আলোড়ন না তোলে, তা হলে? এমনও তো হতে পারে, অনেক লিখতে লিখতে চিন্তা আরো স্বচ্ছ হবে, কলমে আরো শান পড়বে, আরো সহজ হবে নিজেকে প্রকাশ করা? কাহিনী থেকে কাহিনীতে, বিষয় থেকে বিষয়ে পরিক্রমা করতে করতে ক্রমশ আত্মদর্শন ঘটতে থাকবে লেখকের? এক পরীক্ষা থেকে আর এক পরীক্ষায় এগিয়ে যেতে যেতে শেষপর্যন্ত একদিন সে বলবে : এইভাবে আমাকে আমি পেয়েছি? এমন হওয়াও তো অসম্ভব নয় যে, পাঠক আর সমালোচকের দর্পণে সেই নিজেকে পাওয়া অনেক সহজ হবে তার পক্ষে?

কিছুদিন আগে ফরাসী ঔপন্যাসিক জর্জ স্যাম্‌নোর একটি উপন্যাস পড়েছিলুম : 'লা প্রিজ'—অর্থাৎ 'কারাগার'। আধুনিক ফ্রাস্ট্রেশনের গল্প, একটি হত্যাকাণ্ড দিয়ে শুরু, একটি অপঘাত মৃত্যু দিয়ে শেষ। স্যাম্‌নো খুব কুলীন লেখক কিনা জানি না, কিন্তু একেবারে হেঁজিপেঁজি নন—আঁদ্রে জীদের মতো দিকপালও তাঁকে বনেদীয়ানার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। উপন্যাস ছাড়া গোয়েন্দা গল্পেও তিনি খ্যাতিমান, আর দারুণ জনপ্রিয়। নিছক 'গ্রাব স্ট্রীট রাইটার' নন—নামী এবং মানী গ্রন্থকার—'লা প্রির্জ'-ও বেশ শক্ত মুঠোয় লেখা।

বইটি বেরিয়েছে বছরখানেকের কাছাকাছি সময়ে এবং উল্লেখযোগ্য হল এটি তাঁর দ্বিশততম উপন্যাস। স্যাম্‌নোর বয়স এখন ষাটের ঘরে, নতুন করে গোঁফ রেখেছেন, আশা করা যাচ্ছে অতঃপর আরো অনেক বই তিনি লিখবেন। 'লা প্রির্জ'র পরে হয়তো এর মধ্যেই তাঁর আরো বই বেরিয়ে থাকবে, সাধারণ বাঙালী পাঠক সুনন্দর হাতে অবশ্য তা এসে পৌঁছোয়নি।

কিন্তু কথা হল, দুশো উপন্যাস লেখবার জন্যে সাম্‌নোকে কেউ ধিক্কার দেননি—বরং তাঁকে অভিনন্দিতই করা হয়েছে।

সব লেখক তো এক জাতের নন। কেউ দ্রুত বেগে, একমুহূর্ত না থেমে, পাতার পর পাতা লিখতে পারেন, আবার কাউকে হয়তো স্বনামধন্য ফ্লোব্যারের মতো একটি মানানসই শব্দের জন্যে সারারাত পায়চারি করতে হয়। কারুর ভাবনা উদ্ভাসিত হয় বিদ্যুতের মতো, কণায় কণায় আহরণ করে কেউবা গড়েন তাঁর বিন্দু-সরোবর। অর্থাৎ লেখা এবং লেখকেরও জাতিভেদ আছে। সামান্য লিখলেই মহৎ সাহিত্য আর প্রচুর লিখতে পারলেই জোলো—একথা আমার মন মানতে চায় না।

খুব স্বাভাবিক যে অল্পশক্তি লেখকের একটানা একধরনের ঘ্যানঘ্যানিতে অরুচি ধরে যায়। কিন্তু যদি এমন কেউ থাকেন যিনি অফুরন্ত প্রাণ নিয়ে অজস্র ফসল ফলাতে পারেন, তাঁকে আমরা ঠেকাতে যাব কেন? রেসের ঘোড়াকে মরাল-গমনে চলতে বলা বিড়ম্বনা মাত্র। মন্থর লেখকের পাঠক আছে, দ্রুত লেখকেরও আছে। আর কোনটা সাহিত্য, কোনটাই বা অসাহিত্য—এ বিচারও তো এত সহজ নয়।

বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছিল। হুড়মুড় করে ফিরে এল অধ্যাপক।

www.pathagar.com

'নাহ্, বৃষ্টি না-থামা পর্যন্ত আরো কিছুক্ষণ তোমাকে জ্বালাতে হল। এই ফাঁকে তোমার ফেভারেই আরো কয়েকটা পয়েন্টস্ দিচ্ছি। এ যুগে সাহিত্যের পাঠক ধাপে ধাপে বাড়ছে। সুতরাং তাদের খিদের জোগান দিতে অনেক লেখা দরকার। দু-নম্বর, যত রদ্দিই লেখো না কেন, গাদা গাদা বই লিখে গেলে লোকে একদিন তোমাকে বড়ো লেখক বলে ভাবতে থাকবে—যেমন করে বাজে টনিকও বিজ্ঞাপনের জোরে পপুলার হয়। তিন নম্বর, দু বছর লেখা বন্ধ করলেই বাঙালী পাঠক ভাবে লেখক মৃত, অতএব—'

থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'ধন্যবাদ, খুব হয়েছে।'

১২/৭/১৯৬৯

বেকেট প্রসঙ্গে আত্মচিন্তা

নাট্যকার হিসেবে কৃতিত্বের জন্যে 'গোদো'র স্রষ্টা ('গোদো'ই তাঁকে বেশি খ্যাতি আর সাফল্য এনে দিয়েছে) স্যামুয়েল বেকেট এবারে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যদিও বেকেট মাত্র নাট্যকারই নন, কবি-ঔপন্যাসিক-সমালোচকও বটেন—কিন্তু নাটকেই প্রধানত তাঁর পরিচিতি, নাটকের মাধ্যমেই তাঁর বিতর্কিত জীবন-জিজ্ঞাসা।

আমি কমনম্যান সুনন্দ, বাংলাদেশের আরো অসংখ্য পাঠকের মতো সামান্য কিছু পড়তে চেষ্টা করি, রসিক কিংবা বোদ্ধা হওয়ার কোনো দাবি রাখি না। বেকেটের অগণিত মুগ্ধ ভক্তের কাছে মার্জনা চেয়ে আমি লজ্জিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য যে আমি তাঁর একান্ত অনুরাগী হতে পারিনি। তাতে বিশ্বসংসারের কোথাও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, একমাত্র আমিই অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকব।

নোবেল পুরস্কার সমিতি বেকেটকে নির্বাচিত করে কাল-চেতনাকে স্বীকৃতি দিলেন কিনা এসব জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মধ্যে আমি নেই। ওর জন্যে পণ্ডিতেরা এরই মধ্যে কলম শানিয়ে বসে রয়েছেন। 'ডক্‌টর জিভাগো পড়ে আমার খুব খারাপ লাগল'—বেফাঁস এই কথাটা বলে ফেলবার পরে একজন বিদ্বান বয়স্ক ব্যক্তি আমাকে এমন এক কড়া ধমক লাগিয়েছিলেন যে, এত বছর পরেও আমার বুকের কাঁপুনি থামেনি। না—বেকেট সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করব না—অতি সাধারণ একজন পাঠকের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা তার নিজের জন্যেই থাকুক।

কিন্তু রসবোধের ব্যাপারে সুইডেন প্রাচীনপন্থী, এমন অপবাদ কে দেয়! যারা সুইডিশ চলচ্চিত্র দেখছেন, তাঁরাই জানেন যে, কতগুলো বিশেষ ব্যাপারে ওদেশ কী পরিমাণে অগ্রসর—একমাত্র জাপান ছাড়া প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী! যে ফরাসীরা পৃথিবীতে নিজেদের সর্বাধুনিক বলে দাবি করে থাকে, সুইডিশ বিদ্যালয়গুলোতে বালক-বালিকাদের একটি পাঠ্যবস্তুর উন্মুক্ত উদারতায় তাদেরও যে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসতে চায়—এবংবিধ তথ্য ফরাসী পত্রিকা থেকেই আমি আহরণ করেছি।

www.pathagar.com

সুতরাং স্যামুয়েল বেকেট যদি এযুগের জীবনশিল্পী হয়ে থাকেন, তা হলে তার স্বীকৃতি সর্বাগ্রে সুইডেনেই হওয়া উচিত এবং তা-ই হয়েছে।

এসব খুব ভালো কথা, কিন্তু আমি ভাবছি, ১৯০০ সালে অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের মৃত্যু এবং সেই বছরেই স্যামুয়েল বেকেটের জন্ম। নাকি ১৯০৬-এ বেকেটের জন্ম? দু-রকমই দেখেছি। যাই হোক, এই দুই আইরীশের মাঝখানকার সেতুটি বোধ হয় জেম্‌স্ জয়েস। আর একটা সাদৃশ্য এই : দু'জনেই দ্বৈভাষিক লেখক। 'সালোম' লেখা হয়েছিল ফরাসীতে, বেকেট বোধ হয় ইংরেজির চাইতে এখন ফরাসী ভাষাতেই বেশি খ্যাতিমান।

প্রুস্‌তের লেখা থেকেই বেকেট ফরাসীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আইরীশরা দেখছি ফরাসীতে লিখতেই বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে নাকি? ইংরেজের সুশাসনে একসময় তো আয়ারল্যান্ডের হাড়-চামড়া ছাড়া কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। সেই অবচেতন বিরূপতাই হয়তো আইরীশ লেখকদের ফরাসীর দিকে টানে, দাস-মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি দেয়।

কিন্তু নোবেল-প্রাইজের ব্যাপারে বেকেটের ভেতরে আইরীশ আর ফরাসী মেজাজের একটা সমন্বয় দেখা যাচ্ছে। হয়তো বার্নার্ড শ'র মতো তিনিও ভাবছেন—এসব তুচ্ছ পুরস্কার তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল; কিংবা ফরাসী ঝাঁ পোল সার্ত্রের মতো তাঁর মনে হচ্ছে এসব পুরস্কারের কোনো মানেই হয় না। কারণ, সংবাদে প্রকাশ নোবেল পুরস্কার নেবেন কিনা, এ নিয়ে স্যামুয়েল বেকেট এখনো চিন্তা করে দেখছেন।

চিন্তা তিনি করুন, পাস্তেরনাক কিংবা সার্ত্রের মতো যা-খুশি সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। ওসব উচ্চ ভাবনা ওঁদেরই পোষায়। কারণ ওঁরা বাঙালী লেখক নন—বইয়ের আয়তনের ওপর ওঁদের অর্থাগম নির্ভর করে না, পুজো সংখ্যায় অন্তত খানচারেক উপন্যাস লিখতে না পারলে ওঁদের বছরের বাজেট আপসেট হয়ে যায় না। নোবেল প্রাইজের টাকা না হলেও ওঁদের চলে।

কিন্তু আমরা? এইসব আদিখ্যেতা দেখলে আমাদের গা জ্বালা করে। আমাদের বাঙালী রবীন্দ্রনাথও নোবেল-পুরস্কার পাওয়ার পরে কী বলেছিলেন? মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল তাঁর : শান্তিনিকেতনের ড্রেনগুলো পাকা করবার একটা ব্যবস্থা হল এতদিনে।

পুরস্কার পাওয়া-টাওয়া আমাদের নেসেসিটি—একেবারে স্থূল বাস্তব প্রয়োজনেই আমরা পাঁচ-হাজারী থেকে পাঁচ-শতকী—যে-কোনো পুরস্কারের জন্যে আসমুদ্রহিমাচল আলোড়িত করতে পারি। লক্ষ টাকার একটি দূর-নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রতিদিন দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

নোবেল-কমিটি কেন যে সচ্ছল সৌভাগ্যবান লেখকদের পুরস্কার দিয়ে নিউ ক্যাস্‌লে কয়লার গাড়ি টেনে নিয়ে যান কিংবা পাস্তেরনাক-সার্ত্রে-বেকেট কোম্পানীকে তোয়াজ করতে গিয়ে অপমানিত হন, এসবের কোনো অর্থই খুঁজে

www.pathagar.com

পাওয়া যায় না। আমাদের পাঁচ-হাজারী থেকে পাঁচ-শতকীর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা যদি তাঁরা জানতে পারতেন, তা হলে বছর বছর বাঙালী লেখককে পুরস্কৃত করে তাঁরাও চরিতার্থ হতেন, আমরাও বোধ হয় আপত্তি করতুম না। এমনকি—আমি সুনন্দ—সপ্তাহে সপ্তাহে এই যে 'অনবদ্য' জার্নাল লিখে থাকি, আমাকেও যদি এর জন্যে তাঁরা নোবেল প্রাইজ অপার করেন (দোহাই, চটবেন না—স্বপ্ন দেখবার মৌলিক অধিকার আমারও আছে—সেদিনও, টিকিট না কিনেই স্বপ্নে আমি লটারীতে পাঁচ লাখ টাকা পেয়েছি), তা হলে আমিও তাঁদের অবলাইজ করব—এমন প্রতিশ্রুতি এই—এই মুহূর্তেই দিতে পারি। এবং—একটু উৎসাহ পেলেই কোনো ফরাসী-বিদের হাতে-পায়ে ধরে অনুবাদ করিয়ে—মহাভারত-সদৃশ একটি 'ঝুর্নাল' তাঁদের কাছে উপস্থিত করতে আমি সদা প্রস্তুত।

আমার কথা থাক—পৃথিবীতে আমি (এবং 'দেশ'-এর সর্বংসহ সম্পাদক) ছাড়া আমার গুণগ্রাহী আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমাদের কোনো চান্স নেই। কিন্তু নোবেল-কমিটির ধারেকাছে কি এমন কেউ নেই যে, বাংলাদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মতামত এবং প্রজ্ঞাবান সমালোচকদের বক্তব্য তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে? সেইসব অভিমত আর আলোচনা থেকে তাঁরা জানতে পারতেন—বাংলাদেশের কত লেখক বিদেশী লেখকদের ম্লান করে দিয়ে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে। বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস। নিতান্তই একটা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয় বলে আমাদের মহান স্রষ্টারা কল্‌কে পাচ্ছে না এবং একচক্ষু হরিণের মতো নোবেল-কমিটির দৃষ্টি একান্তভাবে পশ্চিমের দিকে নিহিত বলেই তারা টের পান না যে, আমাদের কোনো-কোনো লেখকের একবার কেন—তিন-তিনবার নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।

আমরা বেকেটদের মতো নাক উঁচু করব না—প্রাইজ পেলেই নিয়ে ফেলব। পশ্চিমী লেখকদের মতো আমরা ছোটলোক নাই। বিদেশের এমব্যাসিগুলোতে যেসব দেশপ্রেমিক বাঙালী আছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কিঞ্চিৎ সক্রিয় হতে অনুরোধ করছি।

৬/৯/১৯৬৯

অযাচিত উপদেশ

কেবল কলম ধরে লিখতে-শুরু করেছি : শিলাই নদী ওপর বিদ্যাসাগর সেতু তো হল, কিন্তু কলকাতা-মেদিনীপুরের বড়ো রাস্তাটা থেকে বীরসিংহ যাওয়ার পথটার কী হবে? সেটা আমি যা দেখেছিলুম—

এই পর্যন্ত লিখতেই কে যেন কানের কাছে চাঁছা গলায় বলে, 'খুব হয়েছে, তোমাকে আর পণ্ডিতী করতে হবে না। তুমি কে হে বাপু?'

www.pathagar.com

বেয়াড়া ধমকটা যে দিলে, গলার স্বরেই আমি চিনতে পারলুম তাকে। সে লোকটা আমার ভেতরেই থাকে, প্রায়ই অকারণে মুরুব্বিয়ানা করতে চায়—যদিও তাকে বিশেষ পাত্তা দিই না আমি। সে আমার শ্রীমান বিবেক।

উত্তরে বললুম, 'আমি একজন কমনম্যান। সব ব্যাপারেই আমার মতামত দেবার মৌলিক অধিকার রয়েছে। আর সে অধিকার ভারতীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত।'

'চুপ করো—বেশি বোকো না। তোমার মতামতের কী মূল্য হে? একটা ভোট দিতে পারো, মিছিলের সঙ্গে একটা গলা মিলিয়ে দিতে পারো। আলাদা করে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই—কেউ তোমার কথা শুনতে যাচ্ছে না। আসলে বাঙালী চরিত্রই ভেতর থেকে রাতদিন কটুর-কটুর করে কামড়াচ্ছে তোমাকে! অযাচিত উপদেশ না দিলে তোমার পেটের ভাত—আই মীন পেটের রুটি—সেটাই তুমি বেশি খাও—হজম হচ্ছে না। এই তো সেদিন কোন্ একটা ইংরেজি কাগজে চিঠি লেখবার জন্যে মুসাবিদা করেছিলে—এখনো পাঠাওনি, কাজের চাপে ভুলে গিয়েছিলে, কিন্তু তার পেছনে কী মতলব ছিল তোমার? উপদেশ দিতে যাচ্ছিলে কিনা?'

'উপদেশ মানে? একটা নিউজে কী ছাপা হয়েছে জানো?'—আমি চটে বললুম, 'লিখেছে, লখনউয়ের কোন এক দৌড়বাজ ছেচল্লিশ মিনিট ক'সেকেন্ডে এক হাজার ছ'শো কিলোমিটার দৌড়ে স্থানীয় রেকর্ড ভেঙেছেন। এক হাজার ছ'শো কিলোমিটার ছেচল্লিশ মিনিট দৌড়ে! সুপারসোনিক স্পীড কোথায় লাগে এর কাছে। ক'টা প্লেন যেতে পারে ছেচল্লিশ মিনিটে কলকাতা থেকে দিল্লীতে? ইয়ার্কি পেয়েছে? এ সব যা-তা ছেপে—'

'দ্যাখো সুনন্দ, সব ব্যাপারে নেংটি ইঁদুরের মতো তুমিই বা নাক গলাতে যাও কেন? কয়েক লাখ লোক ওই কাগজটা পড়ে। তারা জানে, মিটারের বদলে কিলোমিটার ছাপা হয়েছে, কেউ কিছু মাইন্ড করেনি, কোনো প্রতিবাদ করেনি। তুমি কে হে বাপু নিউজ এডিটরকে উপদেশ দেবার? ব্যাংকে চাকরি করছ তাই করো—স্রেফ জীবনটাকে দেখে যাও এবং মেনে যাও। একালে কে কার উপদেশ শুনতে চায় হে? এই তো ঘটা করে গান্ধীজীর শতবার্ষিকী হচ্ছে, তাঁকে তোমরা বলো 'জাতির জনক', কিন্তু তাঁর কোন উপদেশটাকে কাজে লাগালে? রবীন্দ্রনাথের স্বর এখনো তোমাদের জীবন ঘিরে সমুদ্রের মতো বাজছে, কান পেতে কোনোদিন তা শোনো? তুমি কোন একটা কাঁটা-ঝাড়ের ঝিঁঝি পোকা—শুধু ঝাঁ ঝাঁ করে লোকের মাথা ধরিয়ে দিলে। ভালো চাও তো চুপ করে যাও নইলে একদিন ঠ্যাঙানি খেয়ে—'

ধমকে বললুম, 'থামো—' সে লোকটা মুচকি হেসে থেমে গেল। কিন্তু যা লিখতে যাচ্ছিলুম বেমালুম গুলিয়ে দিলে তাকে। হুঁ অযাচিত উপদেশ। কে চায়, কেনই বা চাইবে? একালে প্রত্যেকেই আত্মসচেতন, স্বয়ং উপবিষ্ট? কে কার কড়ি ধারে?

এই তো দিন পনেরো আগে। আমার খামারবাড়ি থেকে কিঞ্চিৎ দূরেই থাকেন এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক। লোকটিকে চিনি, নিতান্ত নির্বিবোধ, পড়া আর পড়ানোর

www.pathagar.com

বাইরে কিছুই জানেন না। তাঁর সামনের বাড়িতে একটি রোয়াক আছে—সেখানে ঘনীভূত আড্ডা চলে।

গানে, তর্কে, রসিকতায় এবং চিৎকারে ভদ্রলোকের পড়াশুনোয় যে কেবল অসুবিধে হয় তা নয়, আরো কিছু আপত্তিকর ব্যাপারও ঘটে—যেগুলি এই প্রাচীনপন্থী অধ্যাপকের সহ্যের সীমা প্রায় ছাড়িয়ে যেতে থাকে। অতএব একদিন তিনি কিছু উপদেশ দিতে গেলেন।

পাল্টা প্রশ্ন এল : 'আপনি কে মশাই এসব বলবার? এটি কি আপনার 'পৈতৃক' (শব্দটি অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল) রক?'

অধ্যাপক তাঁর পুরনো মর‍্যাল নিয়ে একটু চটেই গেলেন। আরো কিঞ্চিৎ সদুপদেশের প্রয়াস করতেই তাঁর কান ধরে ঠাস ঠাস চড়। বরাবর ভালো ছেলে অধ্যাপক জীবনে বোধ হয় চড়-চাপড় খাননি, তাই আটান্ন বছর বয়সে অভিজ্ঞতাটা তাঁকে লাভ করতে হল। চড়ের চোটে চোখে অন্ধকার দেখলেন, চশমাজোড়াও গেল।

অকারণ উপদেশের নীট রেজাল্ট। কী দরকার ছিল ছেলেদের ওপর গুরুগিরি করবার?

কে একজন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁর দোকানে দু'জন কেরানি চাই। সাক্ষাৎ করুন। দুর্দিন আর বেকারির বাজার—স্বাভাবিকভাবেই দু হাজার যুবকের লাইন। অবস্থা দেখে বিজ্ঞাপনদাতা উধাও।

তিনি তো উধাও, তখন ক্ষিপ্ত জনতার নজর পড়ল পাশের বন্ধ-দোকানটির দিকে। বেশ বড়ো দোকান। তারা পরমোৎসাহে সে দোকানের দরজা ভাঙতে লেগে গেল।

ছুটে এলেন আঞ্চলিক জনপ্রিয় এবং জননেতা কাউন্সিলর। বললেন, 'একি অন্যায়! যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তিনি পালিয়ে গেছেন। আপনারা অন্যের দোকান ভাঙবেন কী বলে?'

'প্রতিবাদে।'

'এ কীরকম প্রতিবাদ? না—এসব আপনারা করতে পারেন না।'

'তা হলে পার হেড আমাদের দু টাকা করে দিয়ে দিন। অনেক দূর দূর থেকে আমরা এসেছি, আমাদের ট্রাম-বাস-ট্রেনের খরচা। আপনিই দিন তাহলে।'

'আমি দেব কেন?'

'আপনিই দেবেন। ওকালতি করতে এসেছেন যখন—'

এর পরের অংশ না-বলাই ভালো। একটা দোকান বেশ স্পোর্টিভ আনন্দে ভাঙা হচ্ছিল, ভাঙা হত। এমন অনেক ভাঙে। কিন্তু উপদেশ দিতে গিয়েই—

আর সেই ভদ্রলোক মুখচেনা।

'আরে, সুনন্দবাবু না? হঠাৎ এ পাড়ায় কী মনে করে? কাজে এসেছিলেন? বেশ বেশ। তা এই তো আমার বাড়ি, আসুন না—একটু চা খেয়ে যান।'

বসলুম তাঁর বাইরের ঘরে। বেলা সাড়ে এগারোটা তখন।

বললুম, 'আপনিও বুঝি আজ আমারই মতো ছুটি নিয়েছেন?'

www.pathagar.com

'না না, ছুটি নেব কেন? যাব এখন অফিসে। ধীরে-সুস্থে।'

'সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, যাবেন কখন?'

'সে হবে মশাই পরে। এখন আর অফিসার ব্যাটাদের কে গ্রাহ্য করে? সে যুগ ওদের চলে গেছে।'

বললুম, 'সে তো সুখের কথা। ওদের যুগ চলে গেল বলেই তো আপনাদের দায়িত্ব বেড়েছে। এখন তো আপনাদেরই প্রমাণ করতে হবে যে—'

মুখ কালো হল, চোখে ফুটল তীক্ষ্ণ অবিশ্বাস। শুকনো গলায় বললেন, 'নমস্কার সুনন্দবাবু আজ আসুন।'

অযাচিত উপদেশ নিতে গিয়ে গেল চা-টা। নাহ্, শ্রীমান বিবেকের কথাই একটু অবধান করতে হচ্ছে এর পরে।

১৮/১০/১৯৬৯

ফচক্রুজ্ঞ জ্রুজ্ঞক্রফ

ঘাবড়াবেন না, আমি কোনো মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করছি না। 'ফচক্রুজ্ঞ জ্রুজ্ঞক্রফ'—এই দুটি শব্দ পড়ে আপনারা যা বুঝতে পারছেন, আমিও যে তার বেশি বুঝেছি তা নয়।

তাই বলে শব্দদুটো আপনাদের যে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাও মনে করবেন না। ঠিক 'ফচক্রুজ্ঞ' নাই হোক—এই জাতের কোনো আকস্মিক শব্দ—কোনো 'ফ্রফ্রচচ' খামোকা—সম্পূর্ণ অকারণেই কি আপনাকে চমকে দেয়নি?

বাংলা খবরের কাগজ পড়েন? যেমন 'সংবাদে প্রকাশ, গত ১লা ডিসেম্বর সোমবার বসিরহাট মহকুমার ফচক্রুজ্ঞ জ্রুজ্ঞক্রফ—'

এইবারে বুঝেছেন আশা করি। কাগজ ছাপা হওয়ার সময় দুটো শব্দ লাইন থেকে খসে পড়েছে। কিন্তু ঝড়ের বেগে মেশিনের তখন ছোটবার পালা, কপি মিলিয়ে ও দুটো ঠিক করবার সময় কোথায়? অতএব হাতের কাছে যা পাওয়া যায়—

'ফচক্রুজ্ঞ—জ্রুজ্ঞ—'

আপাতত বিশুদ্ধ ননসেন্স। কিন্তু একটু গম্ভীরভাবে তলিয়ে দেখুন। যা নিতান্তই বসিরহাট মহকুমার একটা স্থূল সংবাদে পরিণত হতে যাচ্ছিল, ওই দুটি শব্দের সহযোগে তা কী বিপুল ব্যঞ্জনা লাভ করল। একটু কাব্য করে বলা যায়—সীমা থেকে একেবারে অসীমের দিকে লাফিয়ে উঠল।

আপনি যদি নাছোড়বান্দা হন, ক্রসওয়ার্ড-কুইজ-ধাঁধা সম্পর্কে আপনার যদি খুব দারুণ রকমের জেদ থাকে, তাহলে আপনি ভাবতে বসে যাবেন—এই শব্দদুটো কী ছিল, কী হতে পারে, কী হলে বসিরহাট মহকুমা-সংক্রান্ত ব্যাপারটার সম্পূর্ণ রহস্য আপনার বোধগম্য হবে; আপনি যদি লঘুচেতা পাঠক হন, তাহলে 'মরুক গে' বলে কাগজ ফেলে বাজারে দৌড়াবেন—কারণ সাড়ে দশটায় অফিস আছে আপনার; আর আপনি যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসি হন—তাহলে হয়তো আপনার মনে হবে : আমাদের জীবনই

www.pathagar.com

তো এইরকম—খবর সহজ আর স্বাভাবিকভাবে চলতে চলতে হঠাৎ এক দুর্বোধ্য অপরিচয়ের ঝলক—এক রহস্যের আবির্ভাব—এক অলৌকিক বীজমন্ত্রের শিহরণ।

'প্রিন্‌টার্স ডেভিল' বলে ইংরেজিতে একটি নিন্দাত্মক উক্তি রয়েছে—বাংলা মতে যাকে বলে, 'ছাপাখানার ভূত'। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে 'ডেভিল' অথবা 'ভূত'কে সীরিয়সলি নেবার রেওয়াজ নেই। আপনি যদি তত্ত্বপিপাসু হন, তাহলে আপনার মনে হতে পারে : 'জ্ঞজ্ঞক্রফ' কি হাতের কাছে যা অক্ষর পাওয়া গেল, কেবল তাই-ই? শব্দটা প্রেসের লোকদের স্বাধীন ইচ্ছা থেকেই এসেছে? অথবা সেই মুহূর্তে কোনও অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল—যে ওই 'ফচক্রজ্ঞ জ্ঞজ্ঞক্রফ'-এর ভেতর নিহিত রেখে গেল কোনো অতীন্দ্রিয় ইশারা—কোনও অবোধ্য-সংকেত—সীমা থেকে কোনও অসীমের আভাস? কারণ ছাড়া কার্য ঘটতে পারে না—'ফচক্রজ্ঞ'ও অবশ্যই কারণসঞ্জাত—কিন্তু সে কারণ স্থূল অথবা লৌকিক নয়—কোনও এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে—

এই পর্যন্ত লিখে সন্দেহ হল, আপনারা আমাকে পাগল ভাবছেন নাকি? কিন্তু 'ফচক্রজ্ঞ' কোথায় নেই? চারপাশেও কি দেখতে পাচ্ছেন না?

কাগজে পড়লুম, দোরগোড়ায় দাঁড়ানো একটি কিশোরের গলায় আচমকা একটি কালী বোমার টুকরো এসে বিধল। শুরু হল রক্তপাত—তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। সুদীর্ঘ সময় তাকে অ্যাটেন্ড করা হল না—হাজার অনুনয়েও কোনো ডাক্তার তাকে দেখলেন না; তারপর জানানো হল, যেহেতু এই হাসপাতালে কোনো এমার্জেন্সি ওয়ার্ড নেই, সুতরাং এখানে এর চিকিৎসা হবে না।

ব্যাপার আরো কিছু আছে। কিন্তু নীট রেজাল্ট হল এই যে ছেলেটি মারা গেল। অথচ সময়মতো একটুখানি চিকিৎসা হলেই বারো বছরের ছেলেটির বেঁচে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।

'ফচক্রজ্ঞ' ছাড়া কী বলব একে? হাসপাতালে যদি এমার্জেন্সিই নেই, তাহলে কেন ভর্তি করা হল ছেলেটিকে? আর যদি ভর্তিই করা হল, তাহলে কেন সম্পূর্ণ উপেক্ষায় তাকে ফেলে রাখা হল দীর্ঘকাল? এও বা কী করে সম্ভব—যে সহজেই হয়তো বেঁচে যেতে পারত—সে তিলে তিলে হেমোরেজ হয়ে মরে যাচ্ছে জেনেও একজন ডাক্তারও তার দিকে দৃকপাত করলেন না—এই দানবীয় হৃদয়হীনতা থাকতে পারে কারো? আর বিশেষ করে 'স্যাংটিটি অব লাইফ' যাঁদের মূলমন্ত্র?

এ হল সেই দুর্বোধ রহস্যের একটি চকিত বিদ্যুদ্বিকাশ। সেই 'জ্ঞজ্ঞক্রফ'। এগুলো ঘটে যাবে—অথচ সহজ বুদ্ধি দিয়ে এদের কোনো অর্থ—কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। কোনো আইনের বইতে এর জন্যে শাস্তির বিধান নেই—'ফচক্রজ্ঞ'ই এর অলক্ষ্য নিয়তি।

এবং যে বোমার টুকরোয় ছেলেটির প্রাণ গেল, তার রহস্যই বা কী? কালীপুজোয় বাজি পুড়ে আসছে এবং আরো অনেকদিনই হয়তো পুড়বে। কিন্তু সে বাজি কি কেবল শব্দব্রহ্ম—র‍্যাদার শব্দরুদ্র? ট্যাক্সি থামিয়ে—বাস আটকে চাঁদা

www.pathagar.com

আদায় কি এই মহান উদ্দেশ্যেই? এবং এক চমকে, ইয়ার-ড্রাম ফাটিয়ে, জানালার কাচ গুঁড়িয়ে—তিন-চার-পাঁচ দিন ধরে এইসব শব্দের নিদারুণ মহোৎসব—এ কোন আনন্দের অভিব্যক্তি? দশদিন ধরে মণ্ডপে প্রতিমা বসিয়ে রাখা কি এই আনন্দেরই প্রলম্বিত অধ্যায়? কিন্তু হার্টের রোগীকে পরলোকে পাঠানো (আমার মনে পড়ে কবি অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এইরকম একটি শব্দ-সংঘাতেই মারা গিয়েছিলেন), দেশসুদ্ধ লোককে বধির করে দেওয়া আর বিস্ফোরণে আরো কিছু প্রাণান্ত—এই-ই কি এর উদ্দেশ্য? এই নিদারুণ আনন্দের কোনো সীমা কি টানা উচিত নয়?

না—উচিত নয়, টানা যায় না। কারণ 'জ্জজ্জক্রফ'। একজন ইউরোপীয় অধ্যাপক আর একজন মার্কিনী গবেষকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—কালীপুজোর দশ-বারো দিন পরেও তাঁদের চোখেমুখে আতঙ্ক। দু'জনেই তিনদিন দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে বসেছিলেন।

এই দুর্বোধ্যতার মধ্যে বাস করি বলে—থেকে থেকে 'ফচক্রজ্জ' এইভাবে আমাদের শিহরিত করে বলে—আমরা ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত—সীমার মধ্যে অসীমের আভাস পাই—জীবনটা নিছক স্থূল আর প্রত্যক্ষ হয়ে যায় না—হঠাৎ 'বসিরহাট মহকুমা' ঝাঁ করে অনন্তের মধ্যে পা বাড়িয়ে দেয়।

আমিও পা বাড়িয়েই আছি। সামনের যে-কোনো পূজোয় একটা 'জ্জজ্জক্রফ' হয়তো ঘোর শব্দে আমাকে অনন্তের রহস্যে উত্তরে দেবে।

১৩/১২/১৯৬৯

আমার বয়স—১৯৭০ সালে

এই লেখাটা যখন আপনাদের কাছে পৌঁছুবে, তখন আর একটা নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে। তার মানে, আপনাদের সকলের সঙ্গে সুনন্দরও আর এক বছর বয়স বাড়তে চলল।

তা বাড়বে—ওটাকে ঠেকানো যাবে না। যেত—যদি এই মুহূর্তে আমি কোনো স্পেসশিপে অন্তত হাজারখানেক আলোকবর্ষ দূরে—মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে পারতুম। বৈজ্ঞানিকদের লেখায় পড়েছি সেখানে সময়ের হিসেব আলাদা—সূর্য-প্রদক্ষিণের নিয়মে সেখানে 'কৌমারং যৌবনং জরা' দেখা দেয় না; কিন্তু মানুষের সভ্যতাই এখনো সূর্যের গ্রহ-সাম্রাজ্যে—নিজের নিকটতম প্রতিবেশীর কানে গিয়ে পৌঁছুল না—এই সুনন্দকে নিয়ে তারায় তারায় পাড়ি জমাবে কে! সুতরাং ১৯৭০ সালে আমার—আপনাদের—সকলেরই বয়স বাড়বে, অনিবার্যভাবে বাড়বে।

সময়কে ফাঁকি দেবার একমাত্র উপায়, তাকে না-মানা। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'-র দুই বুড়ো বয়স বাড়লেই তাকে উল্‌টো দিকে ঘুরিয়ে দিত : 'নইলে বুড়ো হয়ে মরব নাকি শেষ পর্যন্ত?' কিন্তু আমাদের হাতে তো স্বপ্নলোকের সেই চাবিটি

www.pathagar.com

নেই যে সেই অপরূপ জগতে পৌঁছে গিয়ে সময়ের চাকাটাকে উল্টোমুখে পাক খাওয়াব। আমরা কেবল চোখ বুজে, জোর করে বলতে পারি : বছরের পর বছর এগিয়ে যাক—আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'র সেই নব-যৌবনের দল—আমাদের বয়স বাড়ে না—কখনো না।

মেয়েরা বয়স কমাতে ভালোবাসেন, এ নিয়ে একটা মোটা রসিকতা চালু আছে পুরুষমহলে। কিন্তু বড়দার হাতের চাঁটি খেয়ে যে শিশুটি গোঁজ হয়ে ভাবে, রাতারাতি বড়দার চাইতেই বড়ো হতে পালে এর জবাব দেওয়া যেত—কে আর বয়স বাড়াতে চায় সে ছাড়া? কিংবা 'এ'-মার্কা ফিল্‌ম দেখবার জন্যে কোনো-কোনো বালকের সাময়িকভাবে সাবালক হওয়ার বাসনা জাগে—এই মাত্র। আর হয়তো আদালতে কোনো মামলায় প্রাণের দায়ে নাবালিকার বয়স বাড়াতে হয়। নইলে—সেদিন ভারত-বিখ্যাত কোনো এক গুণী ব্যক্তিকে কথায় কথায় বলেছিলুম, 'শরীর এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? বয়স কত হল?'

তিনি বললেন, 'কম কী! এই তো—'

তারপর যে বয়সটার উল্লেখ করলেন, সেটা অন্তত বছর-ছয়েক কম। বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর উদয়লগ্ন থেকেই আমি তাঁকে চিনি—বয়সের হিসেবে আমরা প্রায় একই নৌকোর যাত্রী।

কিন্তু আশ্চর্য লাগল না। তিনি শিল্পী, তিনি গুণী—সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দোলা জাগিয়ে দেন। আসলে তিনি তো 'ফাল্গুনী'ই একজন—চিরকালের নবযৌবন, তিনি যদি বয়সটাকে আারো দু-দশক কমিয়ে দিতেন—কিছুমাত্র বিস্মিত হতাম না আমি। রবীন্দ্রনাথ যৌবনকে বয়সের সীমা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন—শিল্পীদের বয়স বাড়ে না, বাড়া উচিত নয়।

'বয়স চুরি'—না, কথাটা ঠিক হল না। আমরা বয়স চুরি করি না—তাকে অস্বীকার করি। আমরা দিন-রাত্রি, মাস-বছরের ডিক্‌টেটরশিপের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানাই। চুলের রঙ বদলায় তো বদলাক না—মনের রঙ যদি বদলাতে না দিই—আমাদের বয়স বাড়ায় সাধ্য কার?

আর যদি 'চুরি'ই বলা যায়—তা হলে এর চাইতে বৈধ এবং জীবনসম্মত চুরি কী আর থাকতে পারে?

লিখতে লিখতেই চোখে পড়ল। বাড়ির পাশে—একফালি পড়ো জমি। দূর বা অদূর ভবিষ্যতে সেখানে কারো প্রাসাদ উঠবে, আপাতত জায়গাটিতে পাড়ার লোকের আবর্জনা জড়ো করবার অবাধ অধিকার। আর রয়েছে ঝাঁকড়া একটি টোপাকুলের গাছ—ঝেঁকে ফল এসেছে তাতে।

এদিকে দুটি কুল আগেই বড়ো হয়েছিল—রং ধরেছে তাদের। একটিকে কাল থেকে দেখা যাচ্ছে না—আগেভাগেই চুরি করেছে কেউ । আর একটি—

চোরকে আবিষ্কার করলুম এক্ষুনি। ঝুঁটিবাঁধা এক বুলবুলি চলে এল কোত্থেকে, টুপ করে দ্বিতীয়টিকেও ছিঁড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালাল। বস্তির যে-

www.pathagar.com

বাচ্চাগুলো ফলদুটোর ওপর নজর রাখছিল, এখন তারা এ ওকে সন্দেহ করতে থাকবে।

এমন স্নিগ্ধ, এমন মনোহর চুরি বুঝি কখনো দেখিনি।

সেই একজনকে মনে পড়ল—যার হাতে থাকত ছোট্ট একটি নীল মলাটের খাতা। কতদিন ভেবেছি খাতাটা চুরি করব। না—আমি গাইয়ে নই, তারই খাতা বলে চুরি করে রেখে দিতে চেয়েছিলুম। সব ক'টা গান তো তার গলাতেই রয়েছে, খাতা আর তার কী কাজে লাগবে?

এই চুরিটা নিশ্চয় অন্যায় হত না, চোরও যে ধরা পড়লে খুব শাস্তি পেত তা নয়—তবু সাহসে কুলোল না। তারপর কতকাল বাদে—কত বছর পেরিয়ে, হঠাৎ দেখা গেল তার সঙ্গে।

'তোমার সেই বিশেষ রঙের শাড়ি কী হল?'

'এখনো ছেলেমানুষ নাকি? একটা ভারভাত্তিক গিন্নী, তা জানো?'

'বাজে কথা। তিরিশ পেরুল না—কিসের গিন্নী তুমি?'

'যাহ্, কী যে বলো! অত কম বয়েস নাকি এখনো?'

'আচ্ছা—আচ্ছা, তিরিশই হল। কিন্তু তাতেই—'

সে হাসল। প্রতিবাদ করল না।

আমি জানি। তার সেই বাইশ বছরের দিনগুলো অনেককাল আগে তিরিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তাকে বুড়ো হতে দিতে পারি না। গানের খাতাটা চুরি করতে পারিনি, কিন্তু তার কিছু বয়স অন্তত আমি চুরি করে নিলুম। সেদিন সে রাগ করত না—আজও করল না। আর বয়স বাড়লে আমাকেও যে বুড়িয়ে যেতে হয়।

নামকরা হাস্যরসিক তাঁর একটি বই উপহার দিলেন আমার ছেলেকে। তলায় লিখলেন, 'অমুক কাকা'।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কাকা কী রকম! আপনি তো আমার চেয়ে অনেক—'

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কাকা লিখব না তো জ্যাঠা লিখব নাকি! ওসব জ্যাঠামো আমার ভালো লাগে না।'

ঠিক কথা—কী হবে জ্যাঠামো করে! আসুক ১৯৭০-৭১-৭২—আমি কিছুমাত্র পরোয়া করি না। বয়সকে বাড়তে দেব না। চিরদিনের দুঃখযন্ত্রণার সঙ্গে তো আছেই, বয়সকে ঠেকে সরিয়ে দিয়ে, যৌবনকে জাগিয়ে রেখে—মোকাবিলা করে যাব জীবনের সঙ্গে।

চুলোয় যাক ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেট। ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারি সুনন্দর বয়স ঠিক পঁচিশ। একদিনও বেশি নয়।

১০/১/১৯৭০

www.pathagar.com

খাজুর গুড় কত কইর‍্যা?

ওঁরা নিশ্চয় কোনো চকচকে একটি মোটরগাড়ি থেকে নেমেছেন। ভদ্রলোকের পরনে সেইরকম কেতাদুরস্ত স্যুট—যার সচিত্র বিজ্ঞাপন মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখা যায়—অর্থাৎ কোনো এক যুবা একটি বিশিষ্ট স্যুটিংয়ের পোশাক পরে দিগ্বিজয়ীর মতো দাঁড়িয়ে এবং কটি তরুণী মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিকচ দন্তে এবং ফুল্লনেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছেন; আর ভদ্রমহিলা ঠিক বিজ্ঞাপনের মতোই সুবেশিনী, সুরূপা, প্রসাধিতা এবং মাথায় একটি কেজি দেড়েক ওজনের নকল খোঁপাধারিণী। নিখুঁত মেড ফর ইচ আদার!

এঁরা বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়তে, আমি চটি, চাদর, ধুতি এবং চটের থলেতে উদ্ধৃত পালংশাকের শীষসমেত সভয়ে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালুম। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি যে দোকান থেকে কিছু খেজুর-গুড় কেনবার চেষ্টা করছি, সেইখানেই থমকে গেলেন তাঁরা। তারপর জিজ্ঞাসু এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গুড়ের হাঁড়ি, পাটালী, মুচি ইত্যাকার ব্যাপারগুলোর দিকে তাকালেন।

মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, এঁরা কী বলবেন। নিশ্চয় ভদ্রমহিলা এরপরে আঙুল বাড়িয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করবেন : 'হোয়াট্‌স্‌ দ্য স্টাফ্‌ হি ইজ সেলিং?' আর ভদ্রলোক 'শ্রাগ' করে বলবেন, 'আই ড্যান্‌নো। অ্যা কাইন্‌ড্‌ অব ইন্ডিয়ান ক্যান্ডি, আই বিলিভ।'

কিন্তু—আমার কানদুটোকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে, আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে (একটু হলেই চটের থলিটা হাত থেকে পড়ে যেত), বেলা ন'টার সময় বাজারে দাঁড়িয়ে আমি স্বপ্ন দেখছি কি না এইরকম কূট-সংশয় আমার মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে, তীক্ষ্ণ মধুর স্বরে ভদ্রমহিলা বললেন, 'খাজুর গুড় কত কইর‍্যা?'

আমি আশা করেছিলুম, ভদ্রলোক চমকে একটা লাফ দেবেন, প্রশ্ন করবেন 'হোয়াট ল্যাংগুয়েজ আর ইয়ু স্পীকিং? ইজ্‌ দ্যাট গ্রীক?' তার বদলে ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে তিনি মৃদু হাস্য করলেন। আমাকে আবার স্তম্ভিত করে দিয়ে বললেন, 'হঃ, এইগুলিন্‌ আবার খাজুর গুর। ভেলির লগে মিশান দিয়া—'

এবার পূর্ববঙ্গীয় গুড়ওলার উত্তেজিত হওয়ার পালা।

'কী কইলেন, ভেলি মিশান! পায়াসের দুধ যদি এট্টুও কাটে—পয়সা ফিরৎ দিয়া—'

কোথায় দেড় কেজির খোঁপা—কোথায় বিজ্ঞাপনের স্যুট। পরবর্তী অংশটুকু বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষার সংলাপ—স্বামী-স্ত্রীর মুখ দিয়ে গোমুখীর মতো পদ্মার প্রবাহ নামতে লাগল। দেখলুম, এঁরা গুড়-বিশারদ, সহজে দোকানদারকে ছাড়বেন না। সুতরাং আমিই পাশের দোকানের দিকে পা বাড়ালুম।

বাজারের বাইরে এসে শীতের লাল রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ আশ্চর্য একটা ভালো-লাগার অনুভূতিতে মন ভরে গেল আমার। কতদিন মনে হয়েছে—আমরা সরে যাচ্ছি, বেশে-বাসে, ভাষায়, জীবনযাত্রার রুচিতে—পুরনো একটা বাংলাদেশের কাছ

www.pathagar.com

থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা। কিছু অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেই ছেলেমেয়েদের আর আমরা বাংলা-মাধ্যম স্কুলে পড়াই না, এখনকার ছেলেরা ধুতি পরতে ভুলে গেছে; একটা স্তরের মেয়েরা যেভাবে চিবিয়ে বাংলা বলেন, তাতে সন্দেহ হয়, তারা সদ্য কানাডা কিংবা হামবুর্গ থেকে ভারতে এসে এখানকার ভাষা শিখতে শুরু করেছেন। বিদেশী গানের শিস্ যাঁদের ঠোঁটের আগায়—বিদেশী নাচের স্টেপিং-এ যাঁরা এর মধ্যেই তালিম পেয়েছে, তাঁদের কালচারের চেহারা যেখানকারই হোক, এ দেশের নয়।

তা ছাড়া কালচারের রূপটাই তো এখন আন্তর্জাতিক। বাঙালী কৃষক এখনো পুরনো কাস্তে দিয়ে ধান কাটে, দূরের পথে লাল ধুলো উড়িয়ে তালগাছের পাশ দিয়ে এখনো গরুর গাড়ির চলে যাওয়া, এখনো টিয়ারঙের শাড়ি পরা মেয়েটি নাকে রুপোর ফুল নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাস-এ ওঠে, এখনো পুরনো মাঝি পুরনো নৌকোয় কাদায় ভরা খেয়াঘাটে পারাপার করে, এখনো মেহেদী আর আশ-শ্যাওড়ার মাঝখানে ফালি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কলুর ঘানি ঘোরবার শব্দ শুনি, কারা যেন মেথি ফোড়ন দিয়ে রান্না চাপিয়েছে—নাকে আসে তার গন্ধ। অথচ শহরে, মধ্যবিত্ত স্তরটা ছাড়ালেই—একটা আন্তর্জাতিক চেহারা। বাঙালীকে আর বাঙালী বলে চিনি না—পাঞ্জাবী, মারাঠী, সিন্ধী, দক্ষিণীর সঙ্গে এসে একাকার।

আজ মনে হল, কোথায় যেন থেকে যায় পিতৃপুরুষের একটা ধারা—ইচ্ছে করলেই নিজেদের আমরা বদলাতে পারি না। তখন দেড় কেজি নকল খোঁপাটা মায়া, মিস্টার টিপটপও তখন সেই পুরনো কাস্তে, সেই নদী, সেই গরুর গাড়ির পথ, মেথিফোড়নের সেই গন্ধ টের পান নিজের ভেতর। অতঃপর প্রশ্ন : 'খাজুর গুড় কত কইর‍্যা?'

আর রক্তের মধ্যে এই ধারাটা থাকে বলেই লন্ডনে দুর্গাপুজোর উৎসব, আমেরিকায় বিজয়া সম্মেলন, কানাডায় বাংলা নাটক। এ শুধু দূর বিদেশে থেকে স্বদেশকে স্মরণ করা নয়, এ আমাদের সেই উত্তরাধিকার, সেই মৌলিক চরিত্র। ওপরের স্তরে আমরা যত খুশি আন্তর্জাতিক হতে পারি, কিন্তু এই ভিত্তিটা কি সহজে বদলায়, বদলাতে পারে?

পূর্ববাংলার একটি মুসলিম তরুণ সরকারি চাকরির সূত্রে বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়। সোজা জিজ্ঞেস করল, 'দ্যাশে যান নাই কদ্দিন?'

জানালুম।

'ঈস—কতকাল খাওন নাই কীর্তনখোলার তাজা ইলিশ, চাঁদপাশার মুসুরির ডাইল। ভালো লাগে আপনের? এইখানে আসবার আগে আছিলাম রাওলপিণ্ডিতে। ধুর—না আছে খাইয়া সুখ, না আছে কথা কইয়া—বাংলাদেশে পা দিয়ে বাচলাম।' বাংলাদেশ এবং বাঙালী। পূর্ব আর পশ্চিম। দাগটা বাইরেই, ভেতরে পড়েনি।

আর একদিনের কথা মনে এল। কিছু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে অত্যন্ত বিদগ্ধ আলোচনা করছিলেন—হঠাৎ কথার ফাঁকে একজন বলে ফেললেন তাঁর দেশ করিমগঞ্জ থেকে কিছু ভালো শুটকি মাছ এসেছে।

www.pathagar.com

আর একজন শ্রীহট্টীয়—যিনি মার্কিনী একটি আধুনিক নন্দনগ্রন্থ সম্বন্ধে তোড়ে বক্তৃতা করছিলেন, চকিতে থেমে গেলেন। সোৎসাহে বললেন, 'তা হলে আজ আপনার বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন!'

কাল বদলাবে, রুচি বদলাবে—তবু বংশধরের কাছে আমরা রেখে যাব বাংলাদেশের এই স্বাদ—এই উত্তরাধিকার। যখন আমরা থাকব না, তখনো শোনা যাবে : 'খাজুর গুড় কত কইর‍্যা?'

৩১/১/১৯৭০

বার্ট্রান্ড রাসেল

আর্থার উইলিয়ম বার্ট্রান্ড রাসেলের মৃত্যু হল আটানব্বুই বছর বয়সে। আর দু বছর হলে তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হতে পারত।

সাম্প্রতিককালের কাছে বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন মানবতাবাদের অশ্রান্ত শান্তির সৈনিক। যুদ্ধ, পারমাণবিক মারণ-যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালিয়ে গেছেন। অধ্যাপক রাসেলের কর্মক্ষেত্রে পদচ্যুতি ঘটেছে, কারাবরণ করেছেন, পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষের কাছে উজ্জ্বল মহিমায় বিভাত হয়েছেন তিনি। এই শতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বুদ্ধিজীবী রাসেল প্রতিটি নতুন চিন্তাধারার শরিক হয়েছেন, তাঁর গাণিতিক বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করেছেন, দার্শনিক প্রজ্ঞায় ভাষ্য করেছেন। তাঁর বিচিত্র চিন্তার প্রকাশ রেখে গেছেন ছোট বড় অসংখ্য বইয়ের ভেতর। সমাজবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, অঙ্কশাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন, 'ম্যারেজ অ্যান্ড মর‍্যালস' রচনা করে চাঞ্চল্য এনেছেন, পাশ্চাত্য-দর্শনের ওপর মূল্যবান বিশাল ইতিহাস রচনা করেছেন, আত্মজীবনী লিখেছেন, সাম্প্রতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ করেছেন (একটি বই ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ হয়েছিল, সে নিষেধ এখনো আছে কিনা জানি না)। আর ধূসর জীবনের গোধূলিতে পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার—সে পুরস্কার অঙ্কবিদকে নয়, দার্শনিককে নয়, সমাজতাত্ত্বিককেও নয়—যতদূর মনে পড়েছে—সাহিত্যিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে।

আজ রাসেল শান্তি আর মানবতাবাদের প্রবক্তা। কিন্তু তা-ও হয়তো তাঁর সত্যিকারের পরিচয় নয়। সব মত, সব চিন্তা নিয়ে তিনি বিচার করেছেন—কোনো মতের আনুগত্য করেননি। চিন্তার জগতে তাঁর মতো "ফ্রীল্যান্‌স্‌" আর জন্মেছেন কিনা জানি না।

বার্ট্রান্ড রাসেলকে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা চিনেছিলেন অনেককাল আগেই। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ—মিড্‌লটন মারে—ডি. এইচ. লরেন্‌স্‌—অলডাস্‌ হাক্‌সলির সঙ্গে উচ্চারিত হত তাঁর নাম—বয়োজ্যেষ্ঠ, রাসেল নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা জোগাতেন তাঁদের, যেমন প্রি-রাফালাইটদের অনুপ্রাণিত করতেন রাস্‌কিন। দার্শনিকরা একভাবে রাসেলকে দেখবেন, গাণিতিকের আর এক দিক থেকে তাঁর পরিমাপ করবেন, আর

www.pathagar.com

এই শতাব্দীর অন্তত প্রথম তিন-দশকের ইংরেজি সাহিত্য এবং সমালোচনা নিয়ে যাঁরা একটু গভীরে যেতে চাইবেন, তাঁদের বার বার বার্ট্রান্ড রাসেলের প্রভাবের কথা ভাবতে হবে। আর এই কারণেই বাঙালী বুদ্ধিবাদীরা বোধ হয় একসময়ে ইংল্যান্ডের দুই প্রধান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করতেন একসঙ্গে—তাঁরা যথাক্রমে শ এবং রাসেল। 'ভ্রাম্যমাণ' দিলীপকুমার রায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে বার্ট্রান্ড এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী ডোরার যে অন্তরঙ্গ ছবিটি এঁকেছিলেন, তাতে সমগ্রভাবে সেকালের বাঙালীর প্রীতি আর অনুরাগই নিবেদিত হয়েছিল।

কমনম্যান সুনন্দর পক্ষে এসব তত্ত্বজিজ্ঞাসা নিছক অনধিকার-চর্চা—পণ্ডিতেরা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজবিদ, রাসেলের ওপরে ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখবেন। কিন্তু সুনন্দর মতো যাদের বয়েস, তাদের তারুণ্যে, ছাত্রজীবনে কী আকর্ষণ ছিল রাসেলের লেখার ওপর! হাতে হাতে ঘুরত 'রোড্স্ টু ফ্রীডম', 'ম্যারেজ অ্যান্ড্ মর‍্যাল্স্', 'হোয়াই আয়্যাম নট্ এ ক্রিশ্চিয়ান', 'ইকারুস'। আমি দর্শনের কেউ নই—অতি সাধারণ সাহিত্যের ছাত্র, তবু সাহিত্যের স্বাদে ভরা এই বইগুলি মুগ্ধ হয়ে পড়তুম, দেখতুম খরশান যুক্তি, বিদ্রূপের উজ্জ্বলতা, সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আঁরি ব্যর্গসঁ আর ঐতিহাসিক মমসেন ছাড়া এমন স্বাদ যেন সাহিত্যের বাইরে আর কখনো পাইনি।

মনে পড়ে কলেজে কোনো একটা জবরদস্ত ক্লাস চলছে, হয়তো ইংরেজির, হয়তো ইতিহাসের। আর আমি পেছনের বেঞ্চিতে—আমার যথাস্থানে বসে, অখণ্ড মনোযোগে পড়ে চলেছি রাসেলের 'ইকারুস'। স্মৃতি আজ আবছা হয়ে এসেছে, বইটি যেন তত্ত্বের দিক থেকে শ-র 'ডক্টর্স্ ডিমেলা'র সগোত্রীয়—বিজ্ঞানের কোনো একটি দিক নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন মনে হয়। কিন্তু তার ভরত-বাক্যটি ভুলিনি। গ্রীক পুরাণের সেই অবোধ বালক ইকারুসের মতো নবলব্ধ বিজ্ঞানের পাখায় মানুষ অনেকখানি উড়েছে, অনেক বেশি উড়েছে, কিন্তু আর বিলম্ব নেই—এইবার সূর্যের তাপে গলে যাবে তার পাখা, তারপরে মহামৃত্যুর অতল-সমুদ্র।

এই দৃষ্টি সেদিনও আমার মনঃপূত ছিল না—সভ্যতার এই পরিণাম আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। কিন্তু দার্শনিক রাসেল তো দর্শনের ইতিহাসে দুঃখবাদী বলেই চিহ্নিত থাকবেন। অঙ্কবিদের দৃষ্টিতে এই পৃথিবী চিরকালের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বিশাল শস্য-পেষাইয়ের যন্ত্র : মানুষ তার চক্রপাকে ক্ষণ-উত্থিত শস্য : চকিতের উদ্ভাসে তার ধারণা জন্মায়, তার অসাধ্য কিছুই নেই—তারপরেই জাঁতা তাকে টেনে নিয়ে গুঁড়িয়ে-পিষে একাকার করে দেয়। এই দুর্নিবার জগৎ-যন্ত্রের কাছে সভ্যতা-বিজ্ঞান-মানুষের এই-ই নিশ্চিত পরিণতি।

আমি জানি না, উত্তর-জীবনে এই মৌল-চিন্তার কতখানি পরিবর্তন ঘটেছিল বার্ট্রান্ড্ রাসেলের। কিন্তু বিশুদ্ধ এবং বিশুষ্ক বুদ্ধি যা-ই বলুক রাসেল তো মানুষকে এই সিদ্ধান্তের হাতেই ছেড়ে দেননি। অন্ধ জগৎ-যন্ত্রের হাতে সে যদি নিতান্তই নিরুপায়—তা হলে কী ক্ষতি যুদ্ধে, ভিয়েতনামী পাশবিকতায়,

www.pathagar.com

দস্তুর কু-ক্ল্যুক্স্-ক্ল্যানে, পারমাণবিক বোমার প্রতি স্পর্ধায়? আসলে, যুক্তি-তর্কে যেখানেই টেনে নিয়ে যাক—সবকিছুরই ঊর্ধ্বে মহৎ মানুষের একটি হৃদয় জেগে থাকেই—জীবনের প্রতি ভালোবাসায়, অন্যায়ের প্রতিবাদে, মানবতার সপক্ষে। চিরকালের সত্যসন্ধী বার্ট্রান্ড রাসেলেরও সেই হৃদয়ের উদ্বোধন ঘটেছিল, তাই শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন—সত্যের জন্যে দাঁড়িয়েছেন, দুঃখকে বরণ করেছেন। আত্মচরিতে ঘোষণা করেছেন মানবপ্রেম, জীবনপ্রেম আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা। ঠিক এইভাবেই তো আপাত নৈরাজ্যবাদী উইলিয়াম ফকনার তাঁর শেষপর্বে শান্তি এবং মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন।

বার্ট্রান্ড রাসেলের মৃত্যুর সঙ্গে ইতিহাসের একটা বিশাল যুগ শেষ হল। দুঃখবাদী দার্শনিককে জানি না, কিন্তু চিরকালের সত্যজিজ্ঞাসু এই মহান মনীষীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত রইল সুনন্দর প্রণাম।

১৪/২/১৯৭০

বার্ট্রান্ড রাসেলের জন্ম ইংরেজি ১৮৭২ সালের ১৮ই মে, তিরোধান ১৯৭০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি।

ভ্রম-সংশোধন

অনেকদিন পরে সেই দুর্মুখ অধ্যাপক এসে আমাকে বললে, 'তুমি কিস্‌সু জানো না'।

বললুম, 'শুনে আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হলুম না। কারণ ওটা আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানতুম।'

'জানতে নাকি? বাঁচা গেল। তা হলে পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো ইডিয়ট হওয়ার ডিসটিংশান তুমি পেলে না। সবচেয়ে নিরেট মূর্খই জানে না যে সে কিছুই জানে না।'

'এক ডিগ্রী ওপরে তুলে রেখেছ বলে ধন্যবাদ। কিন্তু প্রায় বছরখানেক বাদে দেখা দিলে কী বলে? এই কথাটা জানাবার জন্যেই নাকি।'

'আর একটা কারণ আছে। জার্নালে তুমি লিখছে যে শাহ তমাস্‌প্ হুমায়ুনকে লিখেছিলেন যে স্ফিংক্স এখন রাজার আশ্রয় চাইছেন। তা নয়। ঠিক উল্টো। বরং হুমায়ুনই কথাটা লিখেছিলেন, তার উত্তরে পারস্যের সম্রাট—

শুনে গা জ্বলে গেল। বললুম, 'লিখেছি, বেশ করেছি। এখন বর্ষার দিনে ল্যাংড়া আম ইলিশ মাছ কিনতে গিয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, মাথার ঠিক থাকে? আমি যদি হুমায়ুনের বদলে হায়দার আলী কিংবা হবিষ্ক লিখতুম তা হলেই বা তুমি কী করতে পারো?'

অধ্যাপক একটু ঘাবড়াল। বললে, 'আমি কিছুই করতে পারি না। তাই বলে তুমি ভুল করবে?'

www.pathagar.com

বললুম, 'আমরা তো মহামানব নই, কমনম্যান। আমরা ভুল করব, সেটা আমাদের বার্থ রাইট। কিন্তু তোমাদের মতো এই মাস্টারদের আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। ভুল ধরা ছাড়া কি আর কোনো কাজকর্ম খুঁজে পাও না?'

'ওটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।'

'বটে!'—আমি আঙুল বাড়িয়ে সামনের একটি বৃহৎ বাড়ির দেওয়ালের দিকে অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। সেখানে আলকাতরা দিয়ে কিছু উদ্দীপক বাণী লেখা ছিল।

বললুম, 'ওই লেখাগুলো দেখছ?'

'ও আর দেখব কী! গোটা বাংলাদেশই তো এখন ওই নামাবলী পরে বসে আছে।'

'ওতে কিছু বানান ভুল আছে। যাও—সংশোধন করে দিয়ে এসো।'

'ওরে বাবা!'

'ওরে বাবা কেন? শক্ত ঠাঁই বলে? অর্থাৎ দুর্বলের ভুলে তোমরা খড়গহস্ত, আর প্রবলের ভুল তোমাদের কাছে আর্ষপ্রয়োগ? তুমি তো এখন বড়ো চাকরির টানে বাংলাদেশ ছেড়েছ। মনে করো, কোনো মিটিঙে তোমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিছু ভুল ইংরেজি বললেন, শুধরে দেবার গাট্‌স্ আছে তোমার? সভায় দাঁড়িয়ে উঠে?'

অধ্যাপক চুপ।

'তুমি আমার ভুল শোধরাতে এসেছ, সেহেতু আমি কমনম্যান। কিন্তু নৈতিক কর্তব্য যদি এতই টনটনে হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে নেমে পড়ো না পৃথিবীর সব ভুল শোধরাবার কাজে। দেশের পলিটিশ্যান, দুনিয়ার সব রাষ্ট্রনেতা—তোমার মতে যার যেখানে ভুল আছে, সব সংশোধন করার মহৎ দায়িত্ব নাও। চিৎকার জুড়ে দাও, লেখো আন্দোলন করো—'

বিরক্ত হয়ে বাধা দিলে অধ্যাপক।

'এসবের জন্যে আলাদা লোক আছে। আমার গণ্ডী ছোট।'

'অধ্যাপক, এটা যুক্তির ফাঁকি। তুমি যদি ভুল শোধরাবার আদর্শই নিয়ে থাকো, তাহলে আদর্শের কোনো গণ্ডী নেই, থাকতেও পারে না, ইংরেজিতে যেমন বলে, আকাশই তার সীমানা। আমার মতো কমনম্যান কিংবা তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল ধরেই যদি তুমি খুশি হও, আমি আপত্তি করব না। আর যদি বলো নৈতিক দায়িত্ব—সে দায়িত্বের শেষ কোথাও নেই। সেখানে কোনো কমপ্রোমাইজ্ চলে না।

ভুরু কুঁচকে একটু চুপ করে রইল অধ্যাপক। হেসে ফেলল তারপরে।

'নিজের ভুল ঢাকবার জন্যে আচ্ছা কুতর্কের আমদানি করলে যা হোক!'

বললুম, 'কুতর্ক নয়। আসল কথা হল, দায়িত্ব-টায়িত্ব কথাগুলো আমাদের মুখে মানায় না। আমরা সেই পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠ, যে পর্যন্ত আমাদের গায়ের চামড়া নিরাপদ। আজ সারা বাংলাদেশে, সারা ভারতবর্ষে এই সুবিধাবাদী সত্যেরই সাধনা চলছে, আদর্শের জামাটাকে মাপসই করে ছেঁটে নেওয়া হচ্ছে সুবিধের প্রয়োজনে। কিন্তু কথা

www.pathagar.com

বাড়িয়ে আমি শহীদ হওয়ার দায়িত্ব নিতে চাই না—আমি ভুল করি, ভুল স্বীকার করি; আদর্শের বাণী শোনাই না—রাজনীতিকদের মতো অম্লান মুখে ভুলকে স্ট্র্যাটেজি চ্যানেলে চালান করে দিই না। ওসব থাক। কিন্তু তুমিই কি অনেকদিন বলোনি, বিয়ে করার মতো মূর্খতা আর নেই?'

'বলেছি।'

'তোমার গিন্নীকে বলতে পারো সে কথা এখন?'

অধ্যাপক চুপ।

'কিংবা আমার গিন্নীকে?'

'না—না, কী সর্বনাশ!'

'এই তো তোমার সত্যনিষ্ঠার নমুনা! তোমার দৌড় সুনন্দ কিংবা কয়েকটি অবোধ-বালিকা পর্যন্তই। দ্যাখো অধ্যাপক, তুমি যদি বাইবেলের জেনেসি্ মানো, তা হলে এও স্বীকার করো যে আদিম মাতাপিতার ভুল থেকেই আমাদের জন্ম। আর এই ভুলের আলো-ছায়াতেই জীবন এত বিচিত্র—মানুষ এমন অপরূপ। নইলে কী করে আসত সাহিত্য, দেখা দিত দার্শনিক তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিকেরা কী করে এগিয়ে যেতেন? 'সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ছন্দে নতুন রঙ লাগে।' আর আমাদের শাস্ত্র বলছে যে মায়াই হল—'

অধ্যাপক গর্জন করে উঠল : 'চুলোয় যাক মায়া—মাথা ধরিয়ে দিলে। এ স্রেফ ইয়ার্কি হচ্ছে সুনন্দ। নিজের ভুলের সাফাই গাইবার জন্যে বিশ্বতত্ত্ব টেনে আনছ। নন্‌সেন্‌স্!'

'আচ্ছা, আরো বাস্তবে আসি। অল্পবয়সে ইবসেনের 'বুনোহাঁস' নাটকটা পড়েছ নিশ্চয়। একজন ভুল নিয়ে বেশ সুখেই ছিল, খামোকা আর একজন ভুল শুধরে দিয়ে লোকটাকে শেষ করে দিলে। জানো, বিয়ের মরশুমে একবার ভুল বাড়িতে ঢুকে বেরিয়ে আসছিলুম, তারা ছাড়ল না, চিনে ফেলেছে, জোর করে প্রচুর খাইয়ে দিলে। ভালোই করেছিল, কারণ আসলে বাড়িতে পরে গিয়ে দেখি স্রেফ ডালমুট। কাজেই ভুলই জীবনের মাধুরী, আর জার্নালে ভুল না থাকলে আজ তুমিই কি আমার কাছে আসতে?'

অধ্যাপক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'সেইটেই ভুল হয়েছে আমার। কফি খাওয়াবে এখন?'

'খাওয়াব। এ সপ্তাহের জার্নাল লেখা মাটি করে দিয়েছ আমার। তোমাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমিও ভুল করেছি। এখন তোমার সঙ্গে কফি খাওয়া ছাড়া কী প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি তার?'

৪/৭/১৯৭০

www.pathagar.com

চিঠিলেখা এবং আমি

একটি চিঠি পেলুম। তার কটি লাইন এই রকম :

"আপনাকে পর পর তিনখানা চিঠি দিয়েছি, কোনো উত্তর পাইনি। এইটিই চতুর্থ এবং শেষ চিঠি। জানি, এরও জবাব দেবেন না। প্রত্যেক ভদ্রব্যক্তিই কিছু সাধারণ সৌজন্য মেনে চলেন, আপনাকেও আমার ভদ্রলোক বলে ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি—"

বাকীটা থাক। সেটুকু, কী বলে তেমন ফ্ল্যাটারিং নয়।

পড়ে, বলা অনাবশ্যক, আমার দারুণ একটা মর্মবেদনা বোধ হল। এরকম চিঠি পেলে কারই বা ভালো লাগে? আমি তৎক্ষণাৎ কাগজ টেনে লাইন দুই লিখে ফেললুম এবং তারপরে চিঠি—না-লেখবার সেই 'স্বভাব-দৌর্জন্যাৎ' আমার মনে একালের সমালোচনার ভাষায় অনীহা, বৈমনস্য, ভাবপ্রৌঢ়ি ইত্যাকার সব দেখা দিতে লাগল। তখন খুব প্রাকৃত রীতিতে আমি ভাবলুমঃ দুত্তোর, কী হবে লিখে? গালাগাল যা দেবার তো দিয়েইছেন, জবাব পাবেন না এ-ব্যাপারেও নিঃসন্দেহ হয়েছে ভদ্রলোক, আমি আর মিছিমিছি খেটে মরি কেন?

ছেলেবেলা থেকে আমার অজস্র দোষের মধ্যে এই আর একটি বাড়তি ঐশ্বর্য : চিঠি লেখবার নামেই আমার গায়ে জ্বর আসে। এক স্কুলে লেটাররাইটিং-এই আমার যা-কিছু উৎসাহ প্রকাশ পেত—মেধা এবং বয়সের উপযোগী অনবদ্য ইংরেজিতে বন্ধুকে দার্জিলিং ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখতুম—যদিও দার্জিলিং তখনো দেখিইনি। তাতে দার্জিলিঙের পথঘাট সর্বদাই তুষারে আচ্ছন্ন থাকত এবং সেখানে শ্বেতভল্লুক বিচরণ করত।

সেই শেষ। তারপর থেকে চিঠি লিখতে বসলেই আমার কান্না পায়। সম্ভবত একটা কারণও ছিল। অল্পবয়সে খুব সরু নিব দিয়ে পিঁপড়ের মতো খুদে খুদে অক্ষর-চর্চা করবার শখ ছিল আমার, সেইটেই কাল হল। ঠাকুরমা-পিসীমারা আবিষ্কার করলেন, আমাকে দিয়ে পোস্টকার্ডে এক ফর্মা ম্যাটার ঢোকানো যায়। আমাকে তাঁরা যখন-তখন পাকড়াও করে চিঠি লেখাতেন। তাতে 'গাছে বারোটি চালকুমড়ো হইয়াছে' থেকে 'অমুকের একটি কন্যা জন্মিয়াছে' এবং 'আসিবার সময় বড়ো একটি গামলা আনিবা'—কিছুই বাদ পড়ত না। আমি যতই আর্তনাদ করতুম, 'আর না'—পিসীমা ততই বলতেন : 'ল্যাখ্—ল্যাখ্—আরেট্টু ল্যাখ্'। নাড়ু-মোয়ার ব্যাপারে পিসীমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ছিল—'না' করা যেত না। কিন্তু সে যে কী যন্ত্রণা—কী করব!

মনস্তত্ত্বের কূট-সর্পটি বোধ হয় এইখানেই গুহাহিত, পত্রলেখনভীতির মূল এইটিই। তখন নাহয় নাড়ু-মোয়া-মোরব্বা-পাটালির প্রসপেক্ট ছিল, এখন চিঠি লেখা শুধুই শ্রম। সাধারণভাবে আমি ঠিক অলস চরিত্রের নই, কাজ না-থাকলেই আমার বিরক্তি লাগে, অথচ চিঠি লিখতে বসলেই—ভাবি, এখন থাক, কাল হবে।

www.pathagar.com

সে কাল আর আসে না। চিঠিগুলোকে গুছিয়ে রাখি, তারপরে নিপুণভাবে হারিয়ে ফেলি। শেষে একেবারে ভুলে যাই । ফলে আত্মীয়-বিচ্ছেদ হয়ে যায়, বন্ধুরা মুখ দর্শন করতে চান না। কেউ কেউ বাড়ি বয়ে এসে শুনিয়ে যান : 'হুঁ মুখে তুমি ভদ্রতার অবতার। আর চোখের বাইরে গেলেই ভোলো—রিপ্লাই কার্ডেরও জবাব দাও না। মানুষের চামড়া আছে তোমার গায়ে?'

কিসের চামড়া যে আমার গায়ে, তা আমি নিজেও জানি না—তা স্কিন না হাইড—আমার এস্তেকাল হলে সেটা ট্যানারিতে যাবে বলে অধ্যাপক বন্ধু আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু আত্মশ্লাঘার দরকার নেই—সারকথা হল, আমি চিঠি লিখতে পারি না।

জার্নাল লিখে লিখে আমার একটি ক্ষীণ আশা জাগছিল, এই পদ্ধতিতে আমি পুরো না হোক, হাফ কিংবা সিকি সাহিত্যিকও হয়ে উঠব কোনোদিন। অধ্যাপক বলে গেছে, এ জন্মে নয়। শুনে ব্যথা পেলুম বটে, কিন্তু ভেবে দেখলুম, বড়ো লেখক হতে গেলে, কিংবা লেখক হতে গেলেও চিঠি লিখতে হয়—রাশি রাশি চিঠি লিখতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি, কার বাক্স থেকে কখন যে তাঁর অপ্রকাশিত চিঠি বেরুবে জগদীশ্বরই জানেন, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সব মহান লেখক চিঠি লিখেছেন, লিখেই গেছেন। চেস্টারফিল্ডের পত্রোপদেশ দেখে অল্পবয়সে আমার আতঙ্ক জন্মাত—পরে দেখলুম, কেই বা কম? শিল্পতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নীতিকথা, প্রেম, কৌতুক, বেদনা, কুশল সংবাদ, 'ব্যাল ল্যাৎর'—মানে হোয়াট নট? ভেবেছিলুম, মনোযন্ত্রণায় আর শারীরিকভাবে কাতর কীটস্ নাহয় চিঠিই লিখুন, কিন্তু 'আঁফা তেরিবল্' র‍্যাঁবো আর কী পত্রচর্চা করেন। 'বিব্‌লিওতেকে'র সম্পূর্ণ গ্রন্থসম্ভার খুলে দেখি—কী সর্বনাশ! যে ক'টি কবিতা লিখেছেন, চিঠি লিখেছেন তার পাঁচগুণ—কিংবা আরো বেশি!

আমি কেন সাহিত্যিক হতে পারব না, তার কারণটা জানা গেল, অর্থাৎ আমি চিঠি লিখতে পারি না। বড়ো লেখকরা জানেন, তাঁদের প্রস্থানের পর চিঠি হাজার হাজার ডলারে বিকোবে, সমালোচকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়বেন, পাঠকেরা আলোকিত হবেন। তাই তাঁরা আদা-নুন খেয়ে গাদা গাদা চিঠি লেখেন। আর আমার সঞ্চয় বলতে পিসীমার জবানিতে লেখা অনন্য পত্রাবলী! সেই চাল-কুমড়ো এবং গামলা-সাহিত্য কেউ সঞ্চয় করে রেখেছেন—এমন দুরাশা আমি করতে পারছি না।

সাহিত্যিক আমি নাই হলুম, সেজন্যে অনেক গুণী ব্যক্তি আছেন। ওটা ভাবছি না। কিন্তু আমার যে ভদ্রসমাজে চলা দায় হল। কী করে চিঠি লেখবার প্রেরণা পাওয়া যায়? আগে বেশ ছিল, বটতলা থেকে 'সচিত্র প্রেমপত্র'-টত্র পাওয়া যেত—'প্রেমাধীনা বিনোদিনী'র জায়গায় 'বিনোদিনী' কেটে 'তরুবালা' কিংবা 'পিয়াসী চকোর', 'হরলাল'কে 'রামলাল' করে দিলেই চলত। আমার আর ওসব পত্রে দরকার নেই। যেসব স্থূল চিঠি লিখব, তার মডেলও বটতলা থেকে মিলতে পারে,

www.pathagar.com

কিন্তু অভিজ্ঞতায় বুঝেছি লিখতে গেলে যদি জ্বর আসে, চিঠি নকল করতে গেলে আমার জ্বর-বিকার দেখা দেবে!

ভাবছি, কিছু চিঠি ছেপে রাখলে কেমন হয়? নানা জায়গা ফাঁকা রেখে, যেমন—একটি হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর—নাই।—অবস্থা কেমন?' এর গ্যাপ এইভাবে ফিল্ আপ করা যায় : 'খুকুর অথবা রমার একটি পুত্র অথবা কন্যা হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর এখন ভালো অথবা মন্দ নাই। (এখানে 'শরীর'টাকেও গ্যাপ দিয়ে আমার হাতে টাকা নাই—এও চালিয়ে দিতে পারি।) আপনার বা তোমার বাতের অথবা দাঁতের অবস্থা কেমন?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এতেও কি খুব সুবিধে হবে? 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি' যাঁরা মার্জনা করবেন না—বাড়ি বয়ে বলে আসতে হয়, এই ফিলাপ দ্য গ্যাপ চিঠি পেলে তাঁরা জীবিতকালে দূরস্থান, মরে গেলেও কিনি শ্মশানে আসবেন?

২৫/৭/১৯৭০

কেকা এবং অন্যান্য

লন্ডনের একটি পার্কের ধারেকাছের যাঁরা বাসিন্দা, তাঁরা ঘোরতর অশান্তিতে কাল কাটাচ্ছেন—'সংবাদে প্রকাশ'। অশান্তির কারণ কয়েকটি ময়ূর-ময়ূরী, তাদের প্রবল কেকাধ্বনিতে কান পাতা যাচ্ছে না—না আছে ঘুমোনোর উপায়, না আছে বিশ্রামের জো। কেউ কেউ বলছেন, তাঁরা আইনের আশ্রয় নেবেন।

ময়ূর-ময়ূরীর এই উদ্দীপনা কেন? জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে এখন তাদের মধুলগ্ন চলছে, এবছর গরম কিছু বেশি পড়ায় একটু প্রলম্বিত লয়েই চলছে। ফলে জেট-বিমানের অনুক্ষণ ঘর্ঘরধ্বনিতেও যাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, উতলা কলাপী এবং কলাপিনীদের (ভুল হল, ময়ূরী আর কলাপ পাবে কোথায়।) কেকা কলরবে তাঁরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। অথচ পার্কের কর্তৃপক্ষ বলছেন, ওদের সরালেই বা কী করে চলবে, ওরা যে অত্যন্ত 'জনপ্রিয়'।

আমার পাপ-মনে প্রথমে সন্দেহ জেগেছিল ময়ূরগুলো সম্ভবত ভারতীয়; আর 'ভারতের জাতীয় পক্ষী' এখন যে ওদের খুব অরুচিকর ঠেকবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে—বিশেষ করে কালোচামড়া দেখলেই যখন ওদের চোখ রাঙা হয়ে ওঠে—এমনকি অসুখের জন্যে রঙ ময়লা হয়ে গেলে আদি অকৃত্রিম ইংরেজেরও চাকরি জোটে না যখন! এডিনবরার কমনওয়েলথ গেমসে সাদা-কালোর তিক্ততা কীভাবে হিংসার ছুরি শানিয়েছে, সেই বীভৎস খবরও তো পড়েছি। সুতরাং হীরে-জহরতেও যেমন ভারত-পাকিস্তানের রাজা-নবাবের কালো রঙ ঢাকা পড়ে না, তেমনি পেখমের চটক সত্ত্বেও কি ভোলা যায় যে, ময়ূরগুলো 'নিগার'!

www.pathagar.com

তারপরে ভেবে দেখলুম, ময়ূর সম্পর্কে আমার স্মৃতিই কি খুব সুখকর? একদা একটি ময়ূর আমার প্রতিবেশীর প্রাচীরে বিরাজ করত, মধ্যে মধ্যে নয়নলোভন পেখমও মেলত, কিন্তু তার চিৎকার! কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকত কিছুক্ষণ পরে। বিশ্বাস করুন, তখন না মনে পড়ত কালিদাস, না বৈষ্ণব কবিতা, না রবীন্দ্রনাথ, না কাজ্‌রী গান। 'এপারে মুখর হোলো কেকা ওই—' এমন অপরূপ গানটিতেও অরুচি ধরে যেত—মনে হত বসন্ত এলে যদি ওটা থামে, তা হলে বাঁচি, আমিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতুম : 'ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে!' না—আমি অন্তত এক্ষেত্রে ইংরেজের ওপর রাগ করতে পারছি না।

বাস্তবিক, আমাদের কাব্যে কবিত্বে তাদেরই কি সবচেয়ে বেশি আদর—যারা—আমার ব্যক্তিগত মতামত মার্জনা করবেন—যারা সবচেয়ে অসহ্য? মরাল—মানে রাজহংস—মানে কবিতা। নিশ্চয়—সন্দেহ কী। কিন্তু কিছুকাল একটি পল্লীভবনে নিশি যাপন করবার সময়—ওহ্!

বাড়িটি মনোহর। চারদিকে ঘন সবুজ। অদূরে একটি বিশাল বিলের জল দেখা যায়। বাড়ির পাশে আমলকীর একটি ছোট বন, তার পাতার ঝিরিঝিরি। আর আমার শয়নকক্ষটির নীচেই কানায় কানায় ভরা একটি শরতের পুকুর।

সব ভালো, সবই চমৎকার, কিন্তু মধ্যে মধ্যে একপাল রাজহাঁস, কী কারণে জানি না, বাড়িতে না ফিরে সেই পুকুরেই রাত কাটাত। এবং সমস্ত রাত—হে ঈশ্বর কার সাধ্য চোখের পাতা এক করে! একটি ডাকই যথেষ্ট, তাতে গুটিদশেক একসঙ্গে। করিতকর্মা শেয়ালও যে দুটি-একটি কমিয়ে দেবে সে আশা নেই, ঠিক পুকুরের মাঝখানে একটি বৃত্ত রচনা করে সদালাপ চালিয়ে যেত তারা। আমার কবিতা মনে পড়ত না, জাগত জিঘাংসা, বাড়িতে বন্দুকও ছিল, ইচ্ছে করত দু-একটা নিপাত করি, তারপরে শোনা যাক মৃত্যুকালে 'সোয়ান সং'-এর কী মাধুরী তারা বিস্তার করে দেয়।

বাড়ির টিয়া—মানে 'গৃহশুক'কে আপনারা কতটা পছন্দ করেন জানি না, দু-একটা বুলি ফুটলে নিশ্চয় খুশি হওয়ার কথা—কিন্তু সে যতটা বাগবিস্তার করে, চ্যাঁচায় তার কুড়ি গুণ। আমি তো ভাবি দিই খাঁচার দরজা খুলে, তুমি বাপু দিগন্তেই উধাও হও, আমার হাড়ে বাতাস লাগে। এবং আমার ধনী বন্ধুটির সেই ম্যাকাও! দুঃসময়ে বন্ধুটির কাছে ধার-টার পাওয়ার আশা ছিল, গেলে খাওয়াত টাওয়াতও ভালো, কিন্তু পাখিটার সেই প্রচণ্ড চিৎকার! সেই আতঙ্কেই তার বাড়িতে যাওয়া আমাকে বন্ধ করতে হল।

বুঝতে পারছি, 'লাভলি পেটস'দের ব্যাপারে আমার এই যে বিরাগ, এতে আপনারা আমাকে বর্বর ভাবছেন, আমি—যাকে বলে 'অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্ট'—এরকম সন্দেহও করছেন কেউ কেউ। কিন্তু 'পেটস'! এমন যে বিখ্যাত হরিণ, চোখের চাউনিতেই যে আমাদের হৃদয় গলিয়েছে, তারই একটি, কশ্চিৎ গৃহমৃগ—ছেলেবেলায় আমাকে এমন গুঁতিয়ে দিয়েছিল যে আমি হাত তিনেক ছিটকে পড়েছিলুম। নাহ্, এইসব স্বনামধন্য পশুপাখি বরং চিড়িয়াখানাতেই বিরাজ করুন,

www.pathagar.com

আমি ছুটির দিনে ডালমুট কিংবা বাদাম-টাদাম খেতে খেতে হৃষ্টচিত্তে পর্যবেক্ষণ করব, আমার বাড়ি ত্রিসীমানায় এঁরা না-ঘেঁষলেই তা সবচেয়ে সুখকর হবে।

আমি ঠাউরে উঠতে পারি না—যাঁদের বিশুদ্ধ 'আর্যরক্ত' আমার ধমনীতে বইছে (নৃতাত্ত্বিকদের কুবাক্যে আমি কান দিই না)—আমার সেই মহান পূর্বপুরুষগণ এবং পূর্বনারীরা (ব্যাকরণ চলবে?) বেছে বেছে এসব হাড়জ্বালানো জন্তু-জানোয়ারকেই এত পছন্দ করতেন কেন? কী ক্ষতি ছিল গণ্ডার কিংবা জলহস্তী কিংবা ভালুক কিংবা শকুনকে নিয়ে কাব্যবিস্তার করলে? হংসদূত কিংবা ভ্রমরদূত না পাঠিয়ে (ভ্রমরের হুল বোধহয় টের পাননি কখনো) অশ্বদূত কিংবা শিকারী চিতাদূত পাঠালে বরং বেশি সুবিধে হত, ওদের মতো দৌড়বাজ কে আছে আর? আমার যদি কিছু পুষতেই হয়, তাহলে আমি একটি জিরাফই পুষব, কণ্ঠস্বরের দিকে থেকে সে-ই সবচেয়ে বিবেচক।

কিংবা কে জানে কালটাই বদলেছে। তখন ছিল ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ পুরুষদের যুগ, তাঁদের প্রেমকাকলী তো আর পঞ্চমস্বরে বেরুত না, ময়ূরের ঘোররবে তাঁরা বলতেন 'অয়ি প্রিয়!' নায়িকারাই বা ছেড়ে কথা কইবেন কেন, তাঁরা সমানতালে রাজহাঁসের মতো গলায় জবাব দিতেন : 'ভো অজ্জউত্ত!' হরিণ রাখতেন বোধ হয় বাস্তব প্রয়োজনেই, দরকার হলে দু'জন নায়ককে তারা কষে গুঁতিয়ে দিতে পারত (ভাইড পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবা'); আর ভ্রমরদূত পাঠালে—কেবল গুঞ্জনে নয়, অন্যভাবেও বিরহকে সে আরো জ্বালাময় করে তুলতে পারত—সে জ্বালা সহজে কে ভুলতে পারে!

কিন্তু এসব বিপজ্জনক স্পেক্যুলেশ্যন বরং থাক। আপাতত ময়ূর-পার্কের প্রতিবেশীদের জন্য আমি গভীর সমবেদনাই বোধ করছি।

৮/৮/১৯৭০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

'মানসী ও মর্মবাণী'র একটি পুরনো সংখ্যার একখানা চিঠি পড়েছিলুম। পত্রলেখক সকৌতুকে জানাতে চেয়েছিলেন, তাঁর একটি কবিতা তখনকার স্বনামধন্য 'প্রবাসী' থেকে অমনোনীত হয়ে ফিরে আসে; পরে সেটি 'মানসী ও মর্মবাণী'তে ছাপা হলে 'প্রবাসী'রই মাসিক সাহিত্যসমালোচনায় তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। এই অসঙ্গতির কারণ কী—রসবোধের কোন মানদণ্ডে যে কবিতা একবার অমনোনীত হয়—পত্রান্তরে প্রকাশিত হলে তা পরক্ষণেই শিল্পোৎকর্ষ লাভ করে?

চিঠিটা পড়ে আমারও একই জিজ্ঞাসা জেগেছিল। আর সেই পত্রলেখক কবির নামটিও মনের মধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছিল : শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলেবেলার স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে থাকে, তা হলে কবিতাটি বোধ হয় সনেট কিংবা চতুর্দশপদী জাতীয় রচনা—নাম 'রজনীগন্ধা'।

www.pathagar.com

চিঠির কথা আবছাভাবে হয়তো মনে থাকত, কিন্তু লেখকের নামটা নিশ্চয় ভুলে যেতুম—যদি শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে দিনের পর দিন নিজেকে উজ্জ্বল করে না তুলতেন। অন্য পত্রিকার কথা ভালো করে বলতে পারি না, কিন্তু কবি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পলেখক এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রধানভাবে অভ্যুদয় ঘটেছিল বোধহয় 'মাসিক বসুমতী'র মাধ্যমেই। বাড়িতে অন্যান্য পত্রপত্রিকার সঙ্গে 'মাসিক বসুমতী'ও আসত এবং একটি অকালপক্ব বালকরূপে আমি তাঁর লেখা রুদ্ধশ্বাসে পড়তুম। 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে—তাঁর যা-কিছু লেখা, সব।

ধীরে ধীরে নানা কাগজে তিনি ছড়িয়ে পড়েছিলেন, এবং এ দাবি করতে পারি—আমি বাংলাদেশের সেই পাঠকদের একজন যে তাঁর লেখাকে সাহিত্য-পাঠের প্রথম পর্ব থেকে যথাসাধ্য অনুসরণ করে এসেছি। সোজা, সরল বাংলায় বলা যায়, জাদুমন্ত্র ছিল তাঁর কলমে। তিনি দুর্নিবার, তাঁকে ঠেকানো যেত না।

যেমন শরতের প্রথম আলোর মতো প্রসন্নতার দীপ্তি, তেমনি স্মিত, মিত হাসি; কখনো ক্লাসিক গাম্ভীর্যে গড়া জন্ম-জন্মান্তর, ইতিহাসের সুদূর কল্পপ্রায় জগৎ; কখনো অলৌকিক জগতের রোমাঞ্চ—বরদার 'এক্টোপ্লাজম' তত্ত্ব; কখনো শার্লক হোমস আর ফাদার ব্রাউনকে মনে করিয়ে দেওয়া সাহিত্য-নির্ভর গোয়েন্দাগল্প (বাংলাদেশে একমাত্র তাঁরই লেখায় সাহিত্য আর ক্রাইম ডিটেকশনের মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে)। সবসময় নতুন স্বাদ, সবসময় বিস্ময়ের চমক।

কোনটি ছেড়ে কার কথা ভাবব? 'জাতিস্মর', 'মৃৎপ্রদীপ'? বাংলাদেশের সেরা গল্পগুলো যদি আমাকে বাছাই করতে হয়—'চুয়া-চন্দনে'র নাম বাদ দেব কী করে যেখানে কী অপরূপ সৌন্দর্যে আর স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে অতীতের নবদ্বীপ। যে গল্পের নায়ক নিমাই পণ্ডিত, ছিলেন জগাই-মাধাই—আর চন্দন আর চুয়ার সেই প্রেম?

হাসির গল্প? 'তন্দ্রাহরণ', 'ব্যুমেরাং', 'সেমসাইড'? সেই ছোট্ট—অতি মিষ্টি গল্পটি : 'গোপন কথা'—যা রবীন্দ্রনাথের 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটির আর এক মেজাজ মনে করিয়ে দেয়?

আর বরদার গল্প?

হাতের কাছে কোনো বই নিয়ে বসিনি, তবু চকিতে মনে পড়ে গেল : 'যাহারা মুঙ্গের পিঁপরপাঁতি পথটির সহিত পরিচিত আছেন—'

ছেলেবেলায় পড়া—তবু বহুকাল—বহুবছর পরে মুঙ্গেরের সেই পিঁপরপাঁতির পথে হাঁটবার সময়—আমার শরীর ছমছম করে উঠেছিল : দিনের বেলা—ন'টা সাড়ে ন'টা হবে, শরদিন্দু বর্ণিত সেই নির্জন অলৌকিকতার পরিবেশও আর নেই, তবু মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল হাতের সিগারেটটা যদি এই মুহূর্তে ছুড়ে ফেলে দিই—তা হলে তার আগুনটা মাটি থেকে উঠে এসে আমাকে অন্ধকারে অনুসরণ করতে থাকবে—ক্রমে দুটো হয়ে গিয়ে একজোড়া চোখের মতো—

বাস্তবিক, আশ্চর্য লেখক ছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যের কোনো বাঁধা খাতে চলতেন না—অতিলৌকিক গল্প, গোয়েন্দা গল্প, ঐতিহাসিক কাহিনী,

www.pathagar.com

জন্ম-জন্মান্তর, হাসির গল্প—যেদিকে যেতেন মনে হত, সেদিকেই তিনি সিদ্ধকাম। যেমন পরিবেশ রচনা, তেমনি গল্প গড়বার কৌশল আর সেইসঙ্গে তাঁর সাবলীল অনায়াস ভাষা।

মনে আছে কবে কোন ছুটির দুপুরে পড়েছি সেই গল্প : 'সত্যান্বেষী'। কোনো বই কাছে নিয়ে বসিনি, তবু স্মৃতিতে জাগছে সেই অবিস্মরণীয় চমক : ডাক্তার, তোমার সুগার অব মিলকের শিশিতে কী আছে?

সেই প্রথম ব্যোমকেশ বক্সীর আবির্ভাব।

অপেক্ষা করতে হয়নি বেশিদিন। অচিরাৎ দ্বিতীয় উদ্ভাস : খবরের কাগজে এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন : 'যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান—'

এবং দুটি কৌতুক নাটক? 'বন্ধু' আর 'ডিটেকটিভ?' দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়দীপ্ত সেই মঞ্চ-সফলতা? আমার দুঃখ হয়, এই নাটকদুটি প্রায় বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে, অথচ আমি কি ভুলতে পারি সেই প্রোফেসর জ্ঞানাঞ্জনকে, যিনি মানুষের করোটি থেকে তার জাত-নির্ণয় করেন, চেঁচিয়ে ওঠেন : 'তুমি একটি শুয়োর—বুঝেছ, তুমি একটি শুয়োর!'

কিংবা 'ডিটেকটিভে'র সেই বলাই? 'আজ্ঞে বোঁ-বোঁ শব্দে এক কাবুলীওলা!'

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিকারের পরিচয় কিসে? শুধুই ব্যোমকেশ? অনেক সংকীর্ণ করে ফেলা হয়। অহি দত্ত পত্তিনায়ক? গাক্কা? বরদা? হালকা মেজাজের হাসির গল্প—'কানু কহে রাই', 'বাঙাল যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য : 'ইসে, তোমাগো ওই কচুর ভাষা ভুইল্যা যাইতে পারবা না?' 'গৌড়-মল্লার', 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'র ক্লাসিকধর্মী রচনা? দুটি প্রথমশ্রেণীর কৌতুক-নাটক? বাংলাদেশে প্রথম চিত্রনাট্য পদ্ধতিতে লেখা অতি উপাদেয় সেই মনোহর উপন্যাস 'বিজয়লক্ষ্মী?' ছোটদের জন্যে সেই অপূর্ব বইটি : 'টিকিমেধ?'

একাত্তর বছর বয়সে চলে গেলেন, হয়তো অকালপ্রয়াণ নয়। কিন্তু তাঁর মতো চিরসজীব এমন ক'জন লেখক আছেন, যাঁর সর্বশেষ রচনাতেও পাঠকের অসামান্য কৌতূহল? স্রষ্টা হিসেবে তিনি কত বড় জানি না—কিন্তু সব মানুষের এত ভালোবাসা ক'জন পান?

এবং—তার চেয়েও বড় কথা—এমন অজাতশত্রু ভাগ্যবান মানুষ আর কাউকে দেখেছি কি? বিশাল দীর্ঘ শরীরটির মতোই বিশাল হৃদয়ের স্পর্শ যাঁরা পেয়েছেন—শরদিন্দুর চলে যাওয়া তাঁদের ব্যক্তিগত শোক।

বছরখানেকের কিছু আগে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। সেই ড্রেসিংগাউন পরা ঋজু উজ্জ্বল শরীর, সেই হৃদয়ের স্পর্শ। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন, কে কল্পনা করেছিল তখন!

৩/১০/১৯৭০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ উপলক্ষে লিখিত। প্রয়াণ দিবস—১৯৭০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর।

www.pathagar.com

অসুস্থ শরীরের ভাবনা

অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে আছি। উঠে বসতে গেলেই মাথা ঘুরছে। এরকম অবস্থায় আশঙ্কার চেহারাটা খুব ছোট—'ধন নয়, মান নয়'—কিছুই নয়—কেবল নিজের বিছানায় খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকতে পারা।

কিন্তু যো কী। কাল সারাদিন কেটেছে অ্যাম্‌প্লিফায়ার অর 'পটকা'র (সবগুলোকে পটকা বলা যায় কিনা জানি না—এক-একটার আওয়াজে তো গোটা পাড়ার ভিত নড়ে উঠছিল) দানবিক দ্বৈত তানে—রাত দেড়টা নাগাদ সাময়িক বিরতি, ভোর চারটে থেকে আনন্দ-রঙ্গ আবার শুরু। অ্যামপ্লিফায়ার সম্পর্কে একটা আইন-টাইন যেন আছে বলে শুনেছিলুম, হাড়ে হাড়ে বুঝছি ও-সব গুজব মাত্র। আজও সারাদিন—বিরতিহীন সঙ্গীত-তরঙ্গ বয়ে চলেছে, হিন্দী আর বাংলা গানের সে কী প্রেততাণ্ডব! হয়তো আরো কিছুকাল পৃথিবীর অন্ন-জলের বরাদ্দ আছে, তাই দুর্বল শরীরেও আমার হার্টফেল ঘটছে না। এত অদ্ভুত ধরনের অশ্রাব্য গান লেখা যেতে পারে, সেইসব গানের এতরকম জান্তব আওয়াজ করা যায়, আর উৎকট সে-সমস্ত রেকর্ডগুলোকে এতবার করে যে বাজানো যায়—আমার তা কল্পনারও বাইরে ছিল।

এই একঘণ্টার মধ্যে বার আষ্টেক শুনছি : 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না ফুরিল।' অকালমৃত, পান্নালাল ভট্টাচার্যের দুর্ভাগ্য (না-না, আমারই) এমন দরদ দিয়ে গাওয়া গানটিও আমার যম-যন্ত্রণা হয়ে উঠেছে। যতদূর খবর পেয়েছি, শ্যামাপুজোয় পরম উৎসাহী যুবকবৃন্দের দু'দিন এই আনন্দের বন্যায় সাধও মেটেনি, আশাও পোরেনি, তাঁরা আরো দিনতিনেক প্রতিমা প্যান্ডেলে রেখে দেবেন এবং এই সঙ্গীতের মহোৎসব সমানে চালিয়ে যাবেন। তার ফল কী হবে জানি না, আপাতত এই মুহূর্তে বুকভাঙা-আর্তনাদে আমার গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে : 'আমি জনমের শোধ ডাকি মা তোমারে'—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পরের সংখ্যা 'দেশ'-এ যদি 'সুনন্দর জার্নালে'র পাতা অদৃশ্য হয়—আশা করি তা হলে আপনারা কেউই বিস্মিত হবেন না।

আসলে আমাদের মতো কোনো কোনো কমনম্যান এখনো একটা মধ্যযুগীয় মনোভাবের মধ্যে বাস করছি। চারদিকে পৃথিবীর মানুষ এবং মেজাজ যে-রকম বৈদ্যুতিক গতিতে বদলে যাচ্ছে—সেটা আমরা ভালো করে ধরতেই পারছি না। চাঁদার সঙ্গে সঙ্গে যখন থেকে ছোরা বেরুতে আরম্ভ করছে, তখন থেকেই আমাদের উৎসবেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন সবটাই প্রবল, বলিষ্ঠ, প্রায় প্রলয়ঙ্কর। কালীপুজোর বাজি-পট্‌কা বরাবরই ছিল, পকেটভর্তি আছাড়ে-পট্‌কা যে আমাদেরও থাকত না, তা নয়—কিন্তু আজকের এই গগনবিদারী বোম-পট্‌কা? এমন শব্দব্রহ্মের কথা আমরা ভেবেছি নাকি তখন? এবং এই অ্যামপ্লিফ্যায়ার?

আজকের সারা ভারতবর্ষে লাল ত্রিকোণের প্রবলতম ঘোষণা। হিমালয়ে নির্জন পাহাড়ীপথের বাঁকেও চোখের সামনে ধক্ করে ওঠে : 'দো ঔর—!' তা ভালো,

www.pathagar.com

জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যদি বিজ্ঞানসম্মত অভিযান চলে তো চলুক। কিন্তু আমার ধারণা, এইসঙ্গে আর একটি আন্দোলনও জুড়ে দেওয়া যাক : 'আরো বেশি অ্যামপ্লিফায়ার চালান, প্যান্ডালে অন্তত একমাস করে প্রতিমা রেখে দিন, উৎসবের দিনে আরো বেশি শব্দময় বোম-পট্‌কা ফাটাতে থাকুন।' ত্রিকোণ-ট্রিকোণে কাজ যাই হোক, এই অব্যর্থ ফল অচিরাৎ পাওয়া যাবে। লোকক্ষয় ঘটাবার জন্য এমন অমোঘ উপায় আর নেই।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে এল : বিভক্ত বাংলাদেশে বাঙালীর সংখ্যা কত এখন? তিন কোটি? চার কোটি? ঠিক জানি না—আমার কেবল অবিভক্ত বাংলাকেই মনে আসে। সংখ্যাটি আপনারাই ঠিক করে নিন। কিন্তু চার কোটি-তিন কোটি যাই হোক, এই বিশাল লোকসংখ্যা যদি আর না থাকে, অর্থাৎ এই বাঙালীরা যদি আর না থাকে, অর্থাৎ এই বাঙালীরা যদি লুপ্ত হয়—তা হলে ভারতের খাদ্য-সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয় কি না, জনগণের সমৃদ্ধি অনেকটা এগিয়ে যায় কিনা?

নিশ্চয়ই যায়। এবং "মহামতি গোখলে (অথবা গোখেল) যেরূপ বলিয়াছিলেন"—ভারতে 'অগ্রগামী' বাঙালী আত্মধ্বংসের পথে আজো পায়োনীয়র হয়েছে।

সবিনয়ে আবার বলি, রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে আমি নেই। আশৈশব কুশিক্ষার ফলে নিতান্তই বিমূঢ়ের মতো নিজের দেশটাকে কিঞ্চিৎ ভালোবেসে ফেলেছি—ত্যাগে, দুঃখে, সাধনায়, মনীষায় যাঁরা আমাদের পরিচয় আর ইতিহাস গড়ে তুলেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আমার কিছু শ্রদ্ধা আছে। আজ নির্বিচারে তাঁদের ছবি আর মূর্তির কল্পনাতীত অবমাননা দেখে ধারণা জন্মেছিল—এ সমস্ত ডাহা পাগলের কাণ্ড, কোনো রাজনৈতিক দল—যত বিপ্লবীই তাঁরা হোন না কেন, যে-ডালে বসে আছেন, সেই ডালের গোড়ায় কুড়ুল বসাবেন—এমন কাঁঠালে বুদ্ধি তাদের থাকতেই পারে না। কোনো দেশে, কোনো কালে এমন পরমাশ্চর্য বৈপ্লবিক কর্মনীতির উদাহরণ পাওয়া যাবে না।

এখন বুঝতে পারছি, আমিই নির্বোধ। এ হল আমাদের উজ্জ্বলতম আত্মত্যাগের সূচনা—আত্মলুপ্তির 'অয়মারম্ভ'। প্রথমে ইতিহাস এবং পরিচয়ের নিপাতন—তারপরে পরমানন্দে পারস্পরিক বিঘাতন। শেষে শ্মশানের শান্তিতে বাঙালী চিরনিদ্রিত, ভারতবর্ষ তিন কোটি বা চার কোটির একটা 'বিরক্তিকর বাড়তি বোঝা' থেকে মুক্ত—আগামীদিনের ইতিহাসে আমাদের এই মহান "আত্মত্যাগ"—যাকে বলে "স্বর্ণাক্ষরে" লেখা থাকবে।

একদিনের পূজোয় পাঁচদিন ধরে হৃৎস্পন্দনরোধকারী এই পৈশাচিকপ্রায় উৎসব, এই সঙ্গীতের বিভীষিকা, এই পাড়া-কাঁপানো কান-ফাটানো হার্ট-অ্যাটাক জাগানো বোম-পট্‌কা, এই মূর্তি ভাঙার বিপ্লব—একটু তলিয়ে দেখলে সব একটিই কর্মনীতির অংশ—সমস্তই একসূত্রে গাঁথা—বাঙালীর নাভিশ্বাস ঘনিয়ে আসছে। কিংবা আরো স্পষ্ট ভাষায়, ঘনিয়ে আনা হচ্ছে। এরা সবই লাল ত্রিকোণের পরিপূরক।

www.pathagar.com

আমাদের গৃহের অদূরে যে সঙ্গীতসুধা এবং বোমাধ্বনি উৎসারিত হচ্ছে, তা নাকি আরো তিনদিন চলবে। সুতরাং অসুস্থ শরীরে জার্নাল লিখতে লিখতে ভাবছি, পরের সংখ্যায় 'সুনন্দের পাতা'টি যদি না থাকে তাহলে জানবেন, আর একটি কমনম্যান বাঙালীর অবলুপ্তি বা আত্মবিসর্জন ঘটল।

৭/১১/১৯৭০

আমি খ্যাতির রাস্তায়
[সুনন্দর শেষ লেখা]

এই সংখ্যার জন্যে যে জার্নালটি লেখা হয়েছিল, সেটি সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছায়নি, পথেই চুরি হয়ে গেছে।

চুরি হয়ে গেছে অবশ্যই নিজগুণে নয়। পৃথিবীতে এমন দুর্মেধস চোর নিশ্চয় এখনো জন্ম নেয়নি যে, সুনন্দর জার্নাল, তার কাছে বিন্দুমাত্র লোভনীয় বোধ হবে। চুরি হয়েছে কিছু অর্থকরী জিনিসের সঙ্গে, আশা করা যায় এতক্ষণে সেটি টুকরো টুকরো হয়ে কোথাও আঁস্তাকুড়ে জায়গা পেয়েছে।

আপনারা কেউ যে সেই অকালবিলুপ্ত অমূল্য সাহিত্যটির জন্য এতটুকুও শোকার্ত হবেন, এমন আশঙ্কা করি না। কিন্তু আমাকে যে আর একবার লিখতে বসতে হল, সেটাও খুব সুখকর ঠেকছে না। তবু নিজের পাতাটার মায়া কাটানো শক্ত, তার সঙ্গে সাপ্তাহিক বকুনির বদঅভ্যেসটাও সুড়সুড়ি দিচ্ছে। 'যে নিয়েছে দেখার বাহিরে', তার পরাগতি লাভ হোক, তাঁর উদ্দেশ্যে চেয়ে থেকে লাভ নেই : 'ফিরবে না তা জানি জানি।' চেষ্টা করে দেখি, স্মৃতি থেকে সেই লুপ্ত রত্নটিকে উদ্ধার করতে পারি কি না।

একটা ক্ষীণ আশা মনের ভেতরে উঁকি দিচ্ছে এখনো। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে এক-আধজন অতীব বিবেকবান কাগজে এক-আধজন অতীব বিবেকবান পকেটমার 'রিপলি'-মার্কা বিবরণ পাঠ করি। তাঁদের কেউ কেউ লুণ্ঠিত-পকেট ব্যক্তিটির লেটার-বক্সে তাঁর ট্রামের মান্থলিখানা রেখে আসেন, পৌঁছে দেন অফিসের চাবি, কেউবা পোস্ট-অফিস মারফত রেজিস্ট্রি করে দরকারি কাগজপত্রও পাঠিয়ে দেন। যদিও তাঁরা অন্যের পকেট থেকে নিজেদের খরচপত্র নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁরা বিবেচক, প্রয়োজনের বাইরে অন্যকে বিব্রত করাটা তাঁরা পছন্দ করেন না।

আশা করতে দোষ কী, আমার হারানো জার্নালটি এইরকম কোনো সদাশয়ের হস্তগত হয়েছে, তিনি ভাবছেন, এই অপূর্ব বস্তুটি থেকে 'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের বঞ্চিত করে কী লাভ—অতএব যথাস্থানেই এটি ফেরত পাঠানো যাক। সেই শুভযোগ হয়তো এসেও যেতে পারে, এখনো ভরসা রাখা যাক, কিন্তু তার আগে আর একটি জার্নাল অনিবার্যভাবেই আমাকে লিখতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

লেখাটাকে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করতে চাইলুম, মন সায় দিল না। আরো একটি নিবিড় চিন্তার দ্বারা আমি আবিষ্ট হলুম। অধ্যাপক সেই দুর্মুখ বন্ধুটি আমার জার্নাল সম্পর্কে যাই বলুন, একটি অস্ফূট প্রত্যাশা মধ্যে মধ্যে আমাকে বলে, এতদিন ধরে এই যে লেখনী-প্রলাপ চালিয়ে চলেছি, তাতে করে—বোপদেবের সেই কলসীটির মতো—আমিও কি 'প্রায়-সাহিত্যিক' হয়ে উঠিনি? লেখকদের তো কত ভক্ত-টক্ত থাকে, আমার কি 'প্রায়-ভক্ত'ও বাংলাদেশে তৈরি হয়নি দু-একজন? 'সুনন্দবাবু একজন লেখক'—কেউ কি এরকম কমপ্লিমেন্ট আমাকে কখনও দেন না?

তা হলে ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। এই আত্মতোষণের ধৃষ্টতা আপনারা ক্ষমা করবেন, আমি কল্পনাটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে ভাবতে পারি : অর্ধপথে আমার জার্নালের এই যে অপঘাত—এ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এর নেপথ্যে আমার কোনো 'বিমুগ্ধ ভক্তের' (নাকি হাফ-ভক্তের?) কিঞ্চিৎ পরিকল্পনা আছে, আমার অপ্রকাশিত জার্নালটিকে অতি মূল্যবান 'সুভনির' হিসেবে সে আত্মসাৎ করেছে। এর পরে ওটিকে সে পরম যত্নে সাজিয়ে রাখবে, মধ্যে মধ্যে মাথায় ঠেকিয়ে কৃতার্থ হবে কিনা কে জানে! তারপর অনেক বছর পার হয়ে যাবে, আমি ভবলীলা সাঙ্গ করব, আমার এই জার্নালীয় কৃতিত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে 'সোনার অক্ষরে' (ব্রোন্‌জের অক্ষরে হতেও আপত্তির কারণ দেখছি না) লিখিত হবে, আর তখন—আমার সেই 'ঘোর ভক্ত' কিংবা 'প্রায়-ভক্তে'র কোনো উত্তরাধিকারী সেটি বিক্রী করে দিয়ে—বিদেশে যেমন ঘটে থাকে—পাঁচ-দশ-বিশ হাজার টাকার ব্যবসা করে নেবে।

দোহাই, আমার এই আল-নশকরী স্বপ্নের চেহারা দেখে আপনারা চটে উঠবেন না। আপনারা নাহয় আমার লেখাকে পাত্তা দিতে চান না—কেন দেবেন তাও জানি না, কিন্তু আমি যদি এই ফাঁকে—জার্নাল চুরির এই ব্যাপারটাকে একটুখানি আত্মপ্রেমে রঙীন করে তুলি, আশা করি, সেটাকে অসহ্য ধৃষ্টতা গণ্য করবেন না।

কিছুদিন আগে কোনো সভাগৃহে বাংলাদেশের একজন প্রবীণ এবং প্রধান লেখক তাঁর নতুন জুতোজোড়া খোয়ালেন। তাঁর ব্যথাতুর মুখ দেখে আমার সমবেদনা জাগল, তাঁকে বললুম, 'দুঃখ করবেন না—কোনও ভক্ত নিয়ে গেছে, ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করবে—মানে সেই রামের পাদুকার ব্যাপার আর কি!' তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি দিয়ো না, একেবারে নতুন জুতো!'

তাঁর পুজোর আর নতুন করে দরকার নেই, তিনি তো অলরেডি নিজগুণে 'জনানাং হৃদয়ে' সন্নিবিষ্ট হয়েছেন, সুতরাং চটবারই কথা কিন্তু আমি তো তাঁর মতো দিগ্বিজয়ী লেখক নই, জার্নাল লিখে বরং মধ্যে মধ্যে লোক চটিয়ে থাকি বলেই আমার সুনিশ্চিত ধারণা, নতুন জুতো চুরি গেলে আমি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কাতর হতুম তাও ঠিক—তবু, তবু—আমার জার্নালটির এই আকস্মিক অপঘাত—হঠাৎ আমাকে শিহরিত করছে। বড়োলোকের বাড়িতেই চোরের আনাগোনা চলে,

www.pathagar.com

বিখ্যাত শিল্পীর ছবিই চুরি যায়, দিকপাল লেখকের একটি মরণোত্তর পাণ্ডুলিপি কি একটা দুর্লভ সঞ্চয়ের সামগ্রী এবং—এবং আমি কি তাহলে বিখ্যাত হচ্ছি?

আমি জানি, আপনারা কী ভাবছেন।

আচ্ছা—আচ্ছা, আমার লেখা নাহয় টুকরো টুকরো হয়ে আঁস্তাকুড়েই পৌঁছবে কিংবা মুদির দোকানের ঠোঙা হয়ে দিব্যগতি লাভ করবে, সেটা আমিই জানি না! কিন্তু মিথ্যে করে আমাকে একটু বিখ্যাত হতে দিন না—আপনাদের তো কানা-কড়িও খরচ হচ্ছে না!

১৪/১১/১৯৭০

পারিবারিক ক্রিকেট

ছেলেবেলায় আমরা ক্রিকেটকে 'ব্যাটবল' বলে জানতুম। পাকিং বাক্সের যে-কোনো একখানা কাঠের একদিকে হাতলের মতো তৈরি করে নিয়ে, দু'ধারে থান ইটের উইকেট বানিয়ে পুরনো টেনিস বল কিংবা অভাবে সদ্যোবিকশিত বাতাবি নেবু সংগ্রহ করে (নেবুর বিকল্পে ইটের টুকরোতেও আপত্তি ছিল না) আমাদের ব্যাটবল খেলা চলত। আসল ক্রিকেট খেলা দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য যে ঘটত না তা নয়, আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখতুম, শহরের খেলার মাঠে বড়রাও মধ্যে মধ্যে ক্রিকেট নামিয়েছেন; শার্ট গায়ে, ধুতি মালকোঁচা করে পরে, খালি পায়ে এবং কেউ কেউ এক-একটা শোলা হ্যাট মাথায় দিয়ে (এইটেতেই চমক লাগত বেশি) ফটাফট শব্দে বল পিটছেন তাঁরা।

কলেজে উঠে অবশ্য জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল। কিন্তু তখন আর আমরা খেলোয়াড় নই—সচিৎকার সমর্থক, বাউন্ডারি-পেরুনো বল কুড়িয়ে দিতে অক্লান্ত উৎসাহী। এই ক্রমবিকাশ থেকে বোঝা যাবে—যদিও আমরা ক্রিকেটার হতে পারিনি, তা সত্ত্বেও ক্রিকেটের একটা ট্রাডিশন আমাদের ছিল। কিন্তু আমরা দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই ভজুদাকে আমরা কখনো বাতাবি লেবু পেটানোতেও অনুপ্রাণিত করতে পারিনি। সে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ম্যালেরিয়ায় নিয়মিত ভুগত, পাইরেক্স ডি গুপ্ত খেত, জ্বর না থাকলে চিৎকার করে ভূগোল পড়ত : 'কেপ অব গুড্ হোপ্-কেপ্ অব গুড্—সিচুয়েটেড অন দি নর্থ অব—' আর আমাদের ব্যাট-বল খেলার মাঠের পাশ দিয়ে ডি-গুপ্ত খাওয়া বিকট মুখ নিয়ে—এক দার্শনিক অনীহায় উদাস হয়ে, পাড়ার ডাক্তার রাজেনদার কাছে পিলে দেখাতে যেত।

না, ডাণ্ডাগুলি থেকে বিলিতি পাঁকুড়ের বাঁকা ডালের হকি, তিন নম্বর ফুটবল, নষ্টচন্দ্রের বৃক্ষারোহণ, এ-সব কোনো শারীরিক ব্যাপারেই ভজুদাকে কখনো পাওয়া যায়নি। অন্তত তার এম.এস.সি. পাশ করা পর্যন্ত খবর রাখি—আমরা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে চ্যাঁচাতে থাকলে সে তার রেডিয়ো-ফিজিক্সের বই বগলদাবা করে ছাতের দিকে রওনা হত। কিন্তু "বাঁচো এবং জানো"—এই পরম সত্যটি আবিষ্কার করা গেল এই সেদিন—তার কলকাতার ফ্ল্যাটে গিয়ে।

www.pathagar.com

ভজুদা ডিভানে অর্ধশায়িত অর্থাৎ দরকার পড়লেই লাফিয়ে উঠতে পারে, এই অবস্থা। ভজু বউদি সামনের সোফায় বসে কার্ডিগান জাতীয় কিছু বুনছে, কিন্তু তার চোখ জ্বলন্ত—একটা গভীর আবেগ ভেতরে ফুঁসে উঠছে বোঝা যায়। পেছনের একটা উঁচু টেবিলে ক্রিকেট-রিলে মন্দ্রিত রেডিয়ো—ক্যালকাটা বী—সেই টেবিলের কোণা ধরে ভজুদার বারো বছরের ছেলে ঘণ্টু একেবারে অবলোকিতেশ্বরের মতো দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ সমস্ত ঘরটাই যেন 'সারচার্জড্'—যাকে বলে বজ্রসচকিত।

আমি কেবল বলেছি : 'কী ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এমন ঘনীভূত হয়ে'—সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার-ভরা চোখে ভজুদা আমার দিকে তাকাল। মেঘরবে বললে, 'চুপ করে বোস্ সুনন্দ, রোহন কানাই খেলছে।'

কীর্তন শুনতে শুনতে যখন সকলের চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়ছে, তখন যদি কোনো অরসিক আর অভক্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে : 'তোমাদের হাটে হুঁকো কত করে হে'—তা হলে তার যে দশা হয় আমারও তাই হল। আমি বোকার মতো বসে পড়লুম। ইতিমধ্যে কানাই ধাঁই করে একখানা চার মারলেন এবং ভজুদা বললে, "দেখ্‌লি একখানা মার। কানাইয়ের হাতে তো ব্যাট নয়—যেন বাঁশি, কানাইয়ের বাঁশি। দেখ্‌লি?'

কানাইয়ের বাঁশি—সন্দেহ হল, ওটা ভজুদার মৌলিক নয়, যেন শঙ্করীপ্রসাদ বোসের লেখার ওইরকম কিছু পড়েছিলুম। কিন্তু কপিরাইট যখন আমার নয়, তখন কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বললুম, 'দেখলুম আর কোথায়—শুনছি।'

ভিস্যুয়ালাইজ করতে পারছেন না? কার্ডিগান থেকে চোখ তুলে আমার দিকে মেশিনগানের মতো তাকালেন বউদি : 'কী ফাইন স্কোয়ার লেগের মধ্যে দিয়ে—'

রেডিয়োতে একটা বিকট কলরব উঠল, ভজু বউদির বাকিটুকু তাতেই তলিয়ে গেল। কিন্তু যেটুকু শুনলুম, তাতেই আমার বিষম লাগল। "এত্ তু ক্রুতে।" বেসুরো রবীন্দ্রসঙ্গীতেই ভজু বউদির পারদর্শিতা আমি জ্ঞাত ছিলুম, কিন্তু ক্রিকেটে তিনি যে এতদূর এগিয়ে গেছেন, সেটা এর পূর্বে অনুমান করতে পারিনি।

নিরীহের মতো প্রশ্ন করলুম, 'স্কোয়ার লেগ কাকে বলে বউদি? ক্রিকেটের মাঠে কি কারুর চতুষ্কোণ পা গজায়?'

কীর্তনের আসরে এবার হুঁকো নয়, একেবারে টিকে-কল্‌কে এসে পড়ল! ভজুদা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মেশিনগান গর্জন করবার উপক্রম করল, আর হঠাৎ অবলোকিতেশ্বরের মতো ধ্যানস্থ ঘণ্টু হাতে তালি দিয়ে নেচে উঠল : 'সুনন্দ কাকু কিছু জানে না!'

ভজুদা আবার মেঘরবে বললেন, "সাইলেন্স! খেলা শুনতে দে!'

পরাভূত চিত্তে আমি মিনিট তিনেক বসে রইলুম। রেডিয়োর কলরব চলতে লাগল আর হঠাৎ একটা কথা কানে এল : 'এ গুগ্‌লি বল'—

চকিত হয়ে আমি বললুম, "গুগ্‌লি? আচ্ছা ভজুদা, গুগ্‌লির তো ঝোল খায় বলেই শুনেছি, তা দিয়ে আবার বলও করে নাকি, আশ্চর্য?'

www.pathagar.com

আবার বজ্রাঘাত। ভজুদা বোধহয় সিংহনাদে বলতে যাচ্ছিল, 'তুই একটা ইডি'—কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রায় নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল ঘণ্টুর পনেরো বছরের দিদি ডিব্রু (ডিব্রুগড়ে জন্মসূত্রে)—যার ভালো নাম মহাশ্বেতা। রেডিয়োর রোল ছাপিয়ে ডিব্রুর কাকলি বেজে উঠল : 'জানো বাবা, আমাদের ক্লাসের বীণার সঙ্গে বাজি রেখেছি যে, ফার্স্ট-টেস্ট যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ্ হারে—'

পাদপূরণ আমিই করে দিলুম : 'তা হলে তোর একটা ল্যাজ এবং বীণার দুটো শিং গজাবে!'

এর পরে আর বসা চলে না, এক লাফে বেরিয়ে আসতে হল। ক্রিকেট সীজ্‌ন শেষ না হলে ভজুদার ফ্ল্যাটে আর পা দেওয়া যাবে না—সেটা বুঝতেই পারছি।

জানি রহস্যের খাসমহলটি কোথায়। ওই ক্রিকেট রীলে। তার পরে সপরিবারে ভজুদাও ক্রিকেট রসিক। "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্!" জানি, ক্রিকেটের ভাষ্যকারেরা কী অসাধ্যসাধন করতে পারেন। পর-পর মেডেন-ওভারের যে জঘন্য খেলা মাথা ধরিয়ে দেয়, বেতারের মাধ্যমে তাতে তাঁরা নরহত্যার শিহরণ জাগাতে পারেন।

পারিবারিক ক্রিকেটের এই মহান স্রষ্টাদের একটা করে 'পদ্মভূষণ' দেওয়া যায় না?

১৫ই পৌষ ১৩৭৩

www.pathagar.com

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি '**চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা**'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com